১৫ আগস্টের ১০০ মিনিট

শেখ সাদী



KATHAPROKASH
কথাপ্রকাশ
www.kathaprokashbd.com
9 847012 004746

Pathak Shamabesh
Since
1987
15 Auguster 100 Minu
4387102
Tk. 250.00

১৫ আগস্টের ১০০ মিনিট = শেখ সাদী

Northern University
NUB
Library
Bangladesh

১৫ আগস্টের ১০০ মিনিট

শেখ সাদী

কথাপ্রকাশ

88-02-9669555
Dhaka Bangladesh
Establish 2014
cathakathoi-online.com

NUB LIBRARY
ACCESSION NO. ৭৪৭৬৫
ACCESSION DATE
PROGRAM, CAMPUS

১৫ আগস্টের ১০০ মিনিট
উপন্যাস

তৃতীয় মুদ্রণ : আগস্ট ২০১৬
প্রথম প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি ২০১৬
স্বত্ব : শেখ ইশতিয়াক সুদীপ্ত
প্রকাশক : জসিম উদ্দিন
কথাপ্রকাশ
Email : jashimuddin1969@gmail.com
ফোন ০১৭৬৬৫৯০৪০৪

প্রধান কার্যালয়
৩৮/৩ কম্পিউটার কমপ্লেক্স (৩য় তলা), বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
ফোন ৯৫৮৪৪৩৬, ৯৫৮৯৮৫২

প্রাপ্তিস্থান
কথাপ্রকাশ, ৩৭/১ বাংলাবাজার, পি. কে. রায় রোড, ঢাকা ১১০০
ফোন ৯৫৮১৯৪২, ০১৭১৪৬৬৬৯৪৬
এবং
কথাপ্রকাশ, ৮৭ আজিজ সুপার মার্কেট (৩য় তলা)
শাহবাগ, ঢাকা ১০০০, ফোন ৯৬৩৫০৮৭

মুদ্রক
সুবর্ণ প্রিন্টার্স, ৩/ক-খ পাটুয়াটুলী লেন, ঢাকা ১১০০
ফোন ৯৫৩৩০২৯, ০১৭২৬৪৬২৫৩৩

মূল্য : ২৫০.০০

প্রচ্ছদ : সব্যসাচী হাজরা

15 AUGUSTER 100 MINUTE by Sheikh Shadi
Published by Jashim Uddin
Kathaprokash, 37/1 Banglabazar, Dhaka 1100, Ph. 9581942, 01766590404
Third Print : August 2016, First Published : February 2016
Price : Tk. 250.00
Email : kathaprokash@gmail.com, Web : www.kathaprokashbd.com

ISBN : 984 70120 0474 6

উৎসর্গ
শেখ রাসেল

কৈফিয়ত

সুমন সত্যান্বেষী। খাঁটি গোয়েন্দা বলতে যা বোঝায় সে তা-ই। তার জীবনের ব্রত ইট-পাথরে চাপাপড়া ইতিহাস টেনে বের করা। অনেক বছর ধরে সে সন্ধান করছে ১৫ আগস্ট হত্যাকাণ্ডের পেছনের সত্য।

হত্যাকাণ্ডে সেনা কর্মকর্তা ছাড়াও ছিল ৩০০ সাধারণ সেনা। তাদের বিষয়ে কেউ কোনোদিন প্রশ্ন তোলেনি। ষড়যন্ত্রের সঙ্গে তারা ছিল না, তবে এরাই বেশি গুলি চালিয়েছে। নাম-না-জানা সেসব সিপাহি, নায়েক, হাবিলদাররা এখন কে কোথায়? সুমন খোঁজে।

লেখালেখির সুবাদে সুমনের সঙ্গে আমার পরিচয় এবং খানিকটা বন্ধুত্ব। ২০ বছরের বেশি সময় ধরে ওর নোটবইয়ের পাতায় জমানো তথ্য আর অনেক ধরনের ডকুমেন্টের ওপর দাঁড়িয়ে আছে এই বই।

১৫ আগস্টের সকালে নামে ঘোর অন্ধকার। জাতির জনককে সপরিবারে খুন করা হয়। মানবতার ছাল ওঠা এদিনের কথা লিখতে চাইনি। পরে বন্ধু রাকিব এবং জন খানের আগ্রহের কারণে ইচ্ছার বদল ঘটে।

অনেক বছর ধরে বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে লিখছি। ২০১৩ এবং পরের বছরে একুশের বইমেলায় দুটি বই বের হয়েছে কথাপ্রকাশ থেকে। 'বঙ্গবন্ধু ভাষা ও মন' এবং 'বঙ্গবন্ধু পূর্ণ জীবন'।

এই বইয়ের নাম প্রস্তাব করায় কথাপ্রকাশের কর্ণধার জসিম উদ্দিনকে ধন্যবাদ।

শেখ সাদী
কসবে মালঞ্চী, বাগাতিপাড়া
নাটোর।

আসসালাতো খায়রুম মিনন নওম—

ভোরের আজান শোনা যাচ্ছে। ঠিক এই সময় মুখোশ পরা একদল সেনা অস্ত্র হাতে এগিয়ে আসছে। কেউ জিপে। কেউ ট্রাকে। গন্তব্য ধানমন্ডি ৩২ নম্বর সড়কের ৬৭৭ নম্বর বাড়ি।

হাই আলাসসালা, হাই আলাল ফালা।

ঘুম ভেঙে যাওয়া ফজিলাতুন্নেছা বিশ্বাস করেন, আল্লাহর কোনো শরিক নেই। আজানের ধ্বনি ভোরের বাতাস কেটে কেটে ছড়িয়ে পড়ছে চারদিকে। একই সঙ্গে হালকা ঠান্ডা বাতাস বইছে।

বিছানায় উঠে বসলেন ফজিলাতুন্নেছা। চোখ গেল জানালার বাইরে। দেখলেন, রাতের শেষ অন্ধকার চলে যাচ্ছে দিনের পেটে। প্রতিদিন এই সময় নামাজ পড়ে আবার একটু শুয়ে থাকেন।

ঘরে সেগুনকাঠের একটা বড় খাট। এতে বাবার বুকের ওপর ডান হাত তুলে ছোট ছেলে রাসেল ঘুমাচ্ছে। খাট ছাড়া ঘরে একটা মাঝারি আকারের আলমারি। কাপড়চোপড়, দরকারি কাগজপত্র, টাকাপয়সা, গয়নার বাক্স, সবই এর ভেতরে। একটা সাইড টেবিল। এর ওপরে চারটা পাইপ, দুইটা এরিনমোর তামাকের হলুদ কৌটা, আর তিনটা ফোন। মাঝেরটা লাল ফোন। একটা কালো। একটা ক্রিম কালারের। কালো ফোনটা বেজে উঠল।

নিশ্চয়ই কোনো খারাপ খবর। বুকের ভেতর ছ্যাঁৎ করে ওঠে। চোখের দুই পাশের চামড়া ভাঁজ হয়ে যায়। কাঁপা কাঁপা হাতে ফোনের রিসিভার তুলে কানের কাছে ধরলেন। সেরনিয়াবাতের জড়ানো কথা কানে এল, 'কারা যেন বাড়িতে আক্রমণ করেছে, গুলি করছে, কিছু একটা...কথা শেষ না হতেই গুলির শব্দ কানে আসে। আর কোনো কথা শুনতে পেলেন না। ফজিলাতুন্নেছা হ্যালো হ্যালো বলেই যাচ্ছেন।

কথার শব্দে ঘুম ভেঙে যায় বঙ্গবন্ধুর। বললেন, কী হয়েছে হাসুর মা?

হাসনাতের আব্বা ফোন করেছিল, কারা যেন ওনার বাসায় আক্রমণ করেছে।

বিছানা ছেড়ে উঠে বসলেন। বাবা উঠে যাওয়ায় ঘুমের মধ্যেই পাশবালিশটা টেনে বুকের কাছে নিল রাসেল।

ব্যক্তিগত সহকারী মহিতুল ঘুমিয়ে আছেন।

বাড়ির নিচের এক ঘরে মহিতুলের সঙ্গে আরো দুজন শুয়ে আছে। পিএবিএক্সে ফোন করলেন বঙ্গবন্ধু। ফোন ধরলেন টেলিফোন মিস্ত্রি মতিন।

মহিতুলকে দে।

মহিতুলকে ধাক্কা দিলেন মতিন, 'প্রেসিডেন্ট সাহেব ডাকছেন।'

লাফিয়ে উঠে ফোন ধরলেন মহিতুল, 'সেরনিয়াবাতের বাড়িতে কারা যেন আক্রমণ করেছে। পুলিশ কন্ট্রোল রুমে জলদি ফোন লাগা।'

রিসেপশন রুমে তিনটা ফোন।

একটা ফোন সেটের নম্বর ঘুরিয়েই যাচ্ছেন মহিতুল। কেউ ফোন ধরছে না। এরই মধ্যে বঙ্গবন্ধু রিসেপশন রুমে চলে আসেন। চেয়ার থেকে লাফিয়ে ওঠেন মহিতুল। এখন দাঁড়িয়ে নম্বর ঘোরাচ্ছেন। বঙ্গবন্ধু বললেন, কী হলো? এখনো লাগাতে পারলি না?

চেষ্টা করছি, কেউ ফোন ধরছে না। এ কথা বলে মহিতুল গণভবন এক্সচেঞ্জে ফোন করেন। একজন ফোন রিসিভ করলেন। মহিতুল হ্যালো, হ্যালো বলেই যাচ্ছেন। কারো গলা শোনা যাচ্ছে না। এবার ফোনের রিসিভার বঙ্গবন্ধু হাতে নিয়ে বললেন, হ্যালো, হ্যালো।

এমন সময় বাড়ির প্রাঙ্গণে বিউগলে সুর বেজে ওঠে।

রাষ্ট্রপতির বাসভবনে জাতীয় পতাকা তোলা হচ্ছে। পুব আকাশে লাল আভা দেখার সময় পতাকা তোলা হয়। নামানো হয় সন্ধ্যায়। মিলিটারি ভাষায় এই সময়টাকে বলে ফার্স্ট লাইট। বিউগলে সুর বাজানো শেষ। হাবিলদার কুদ্দুসের দল ফলইন করে জাতীয় পতাকা তুলতে থাকে। পতাকা তোলার পর স্যালুট দেয়ার নিয়ম। ছয় জন সেনা স্যালুট দেয়ার জন্য ডান পা তুলেছে তখনই বাড়ির দক্ষিণ দিক থেকে গুলি শুরু হয়।

ঘড়িতে এখন চারটা ২৫ মিনিট। বৃষ্টির মতো গুলি এসে লাগল দেয়ালে, জানালায়, কার্নিশে এবং বাড়ির পেছনের গাছে। মহিতুল ভয়ে টেবিলের নিচে বসেন। কিছুক্ষণ পর গুলি বন্ধ হয়। দোতলা থেকে পাঞ্জাবি আর চশমা নিয়ে এসেছে গৃহপরিচারক সেলিম। এতক্ষণ স্যান্ডো গেঞ্জি পরা ছিলেন বঙ্গবন্ধু।

বারান্দায় এসে বললেন, আর্মি, সেন্ট্রি থাকতে এতক্ষণ গুলি হলো কেন? কী করো তোমরা? কারা এরা? এসব বলতে বলতে দোতলায় উঠে গেলেন।

সিঁড়িতে দেখা হলো বড় ছেলে কামালের সঙ্গে।

কোনো কথা হলো না। স্ত্রী রোজীসহ কামাল এতক্ষণ ছাদের চিলেকোঠায় ঘুমাচ্ছিলেন। কয়েকটা গুলি এসে লাগে তার জানালায়। তখনই বিছানা ছেড়ে ঘর থেকে বেরিয়ে আসেন। বাড়ির পাহারাদারদের কাছে এখন কোনো গুলি নেই। দেড় ঘণ্টা আগে সব গুলি নিয়ে গেছে সুবেদার মেজর ওয়াহাব জোয়ার্দার। আবার শুরু হলো গুলি।

বাড়িতে থাকা পাঁচটা সেন্ট্রি পোস্টে সিকিউরিটির লোকজন এখন আধমরা কলাগাছের মতো দাঁড়িয়ে আছে। কয়েকটা গুলি লাগল দোতলার বেডরুমের জানালায়।

একদল সেনা 'হ্যান্ডস আপ' বলতে বলতে বাড়ির ভেতরে চলে আসে।

দলের সামনে নূর, হুদা ও মহিউদ্দিন।

গেট পার হয়ে দেখা হয় হাবিলদার গনির সঙ্গে। শেষ রাতে হাবিলদার কুদ্দুস আসার আগে গার্ড কমান্ডারের দায়িত্বে ছিল গনি। কুদ্দুস দায়িত্ব বুঝে নেয়ার পর তার ঘুমাতে যাওয়ার কথা। আজ যায়নি। মধ্যরাত থেকে বাড়ির আঙিনায় অস্থির পায়চারি করছিল। তখন কুদ্দুস প্রশ্ন করেন, গনি ভাই কি খুব টেনশনে আছেন?

জবাব দেয় না গনি।

সেনারা বাড়ির ভেতর প্রবেশ করে বিনা বাধায়। গনি তাদের স্যালুট দেয়। কয়েকজন জোয়ান পাশে দাঁড়িয়ে ছিল তারাও স্যালুট দেয়। হুদা বললেন, গনি ভাই কী খবর?

ভালো, এবার হাসিমুখে উত্তর দেয়।

সেনাদলের সঙ্গে আগে থেকেই গনির যোগাযোগ ছিল, বুঝতে পারলেন কুদ্দুস। আঁটসাঁট শরীর গনির। সেনা ট্রেনিং করেছে পাকিস্তানের ক্যাম্পেলপুর। সময় অসময়ে ভাব ধরে বলেন, 'পাকিস্তানের মোজাফ্ফরবাদ আর পিন্ডিতে এই গনি ডিউটি করেছে। আমি জানি একজন সোলজারের ডিউটিতে কোনো ফাঁকি চলে না। আমাদের স্যার শিখিয়েছেন, ডিউটি ইজ ডিউটি। এ দেশে এসব শেখানো হয় না।'

গনির সঙ্গে কথা বলে নিচতলায় দাঁড়ায় সেনাদল।

এরই মধ্যে নিচতলার রিসেপশন ঘরে চলে এসেছেন শেখ কামাল। সেনাদের দেখে চমকে যান। এরা কারা? কেন এসেছে এখানে? মুখোশ পরা কয়েকজন সেনা স্টেনগান তাক করে। হুদার হাতে লোড করা পিস্তল। ভয়ে চিৎকার করে বললেন, আমি শেখ মুজিবের বড় ছেলে কামাল, আপনারা...

কথা শেষ হলো না।

হুদা পিস্তল দিয়ে গুলি করে। প্রথম গুলি লাগে পায়ে। কামাল মেঝেতে পড়ে যান। এরপর কাছে থেকে একজন সেনা স্টেনগান দিয়ে বুকে গুলি করে। গোঙানির সাথে একবার 'মা' বলে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়লেন। দোতলায় ওঠার সময় গোঙানি শুনতে পান বঙ্গবন্ধু। ছেলের গোঙানির শব্দে বুক কেঁপে ওঠে। দোতলায় শোবার ঘরে যেতেই ফজিলাতুন্নেছা জাপটে ধরে বললেন, 'আমার কামালের কী হলো, হাসুর বাবা?'

১৫ আগস্টের হত্যাকাণ্ড মাত্র ১০০ মিনিটের ঘটনা।

তবে আয়োজন হয়েছে কয়েক বছর ধরে। ষড়যন্ত্রের শুরু ১৯৭১ সালের আগস্ট মাসে। ওই সময় চক্রান্তের বেলুন ফুটো করে দেয় কাউবয়েরা।

ক্লান্ত বিকেল।

দিল্লি অফিসের লম্বা বারান্দায় 'র'-প্রধান কাউ বসে আছেন। হাতে চায়ের মগ। দার্জিলিংয়ের চা, দুধ চিনি ছাড়া। ভেতরে তিনটা তুলসীপাতা ভাসছে। চায়ের মগে চুমুক দিতে দিতে শিশুগাছটার ওপারে সূর্যাস্ত দেখছেন। পশ্চিম আকাশে এখন লাল আভা ছড়ানো। মনটা আজ বেশ ফুরফুরে। কারণ, শেষ পর্যন্ত চক্রান্তের বেলুনটা ফুটো করতে পেরেছে দলের ছেলেরা।

বিয়ে কিংবা জন্মদিনের বেলুন না। কালো রঙের চক্রান্তের বেলুন। যে-কোনো বেলুন ফুটো করার সময় ফটাস শব্দ করে হাওয়া বের হয়ে যায়। তবে এই বেলুন ফুটো করার সময় শব্দ হলো না। ভেতর থেকে বেরিয়ে এল দুর্গন্ধ আর কিছু সাপ। এই সাপগুলো বিষধর। ছোবল মারলে বাঁচার আশা থাকে না।

মুক্তিযুদ্ধের গায়ে বিষ ঢেলে মেরে ফেলার কাজ শুরু হয়েছিল কয়েক মাস আগে। অত্যন্ত গোপনে চক্রান্তের বেলুনে ফুঁ দিলেন খন্দকার মোশতাক আহমদ। তাও রক্ষা করতে পারলেন না। বেলুন থেকে সব সাপ বেরিয়ে আসে। তা দেখে সবাই আঁতকে উঠলেন। গোখরো সাপের ডিম ফেটে বেরোনো অনেকগুলো বাচ্চা যে রকম কিলবিল করে, চক্রান্তের সাপেরা এখন সে রকম করছে।

বেলুন ফুটো করার কাজ সহজ ছিল না। গরমে তেতে, পুড়ে, সেঁকে, ভাজা ভাজা হয়ে যান 'র'-প্রধান রমেশ্বর নাথ কাউ এবং তার দলের ছেলেরা।

ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থার সংক্ষেপ নাম 'র'।

ইংরেজি বর্ণমালায় RAW শব্দের মানে রিসার্চ অ্যান্ড অ্যানালাইসিস উইং। বয়স মাত্র আড়াই বছর। ১৯৬৮ সালে প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী ইন্টেলিজেন্স ব্যুরোকে ভাগ করে 'র' গঠন করেন। দলপতির নাম রমেশ্বর নাথ কাউ। এই দলের সবাইকে ভালোবেসে 'কাউবয়' ডাকতেন ইন্দিরা।

সারা দুনিয়ার গোয়েন্দা জগতে কাউবয় নামটা ছড়িয়ে পড়ে। আমাদের মুক্তিযুদ্ধের বিজয় এবং পাকিস্তানে বঙ্গবন্ধুর ফাঁসি আটকাতে 'র'-এর ভূমিকা ইতিহাস মনে রাখবে।

কলকাতায় খোশ মেজাজে খন্দকার মোশতাক।

মাঝেমধ্যে চারপাশের মানুষকে গ্যাস খাওয়াতে মানে মুরগি বানাতে পছন্দ করেন। এখন সেই প্রস্তুতি চলছে।

পড়ন্ত বিকেল। জানালা দিয়ে দিনের শেষ আলো এসে মেঝের ওপর পড়ে আছে। বড় আকারের এই ঘরে দুই ধরনের সোফা পাতা। বারো জনের একসঙ্গে বসার আয়োজন।

ঘরের উত্তর-পশ্চিম কোনায় একটা কাঠের চেয়ার। দেখতে অনেকটা সিংহাসনের মতো। সোফায় বসে আছেন আওয়ামী লীগ নেতা নুরুল ইসলামসহ আট জন। সবাইকে চেনা যাচ্ছে না। সিংহাসন মার্কা চেয়ারে 'থ' মেরে বসে আছেন মোশতাক। কপালে ভাঁজ। বিষণ্ন চেহারা। চোখের ভাষা কেউ বুঝতে পারছেন না।

হঠাৎ ডুকরে কেঁদে উঠলেন।

সবাই হতবাক।

কেউ বুঝতে পারলেন না, কী কারণে হঠাৎ কান্না? কয়েকজন থামানোর চেষ্টা করছেন। কিন্তু কাজ হচ্ছে না। কান্নার ভলিউম বেড়েই যাচ্ছে। কিছুক্ষণ পর একটু থেমে বললেন, 'আমি বেঁচে থাকব, আর পাকিস্তানে মুজিব মারা যাবে? এ তো আমি সহ্য করতে পারব না। এ হয় না, হয় না। তোরা আমাকে মক্কা পাঠিয়ে দে। বাকি জীবন ওখানেই থাকব।'

আট জোড়া চোখ মোশতাকের দিকে তাকিয়ে আছে। কান্না পুরোপুরি থেমে যাওয়ার আগে দুই জন ব্যাঙের মতো থপ থপ করে লাফিয়ে ঘরের বাইরে চলে আসে।

সার্কাস! সার্কাস!

আচ্ছা উনি কি ছোটবেলায় সার্কাসে ছিলেন? দড়ির খেলা খেলতেন?

দড়ির খেলা কোনো খেলাই না।

এসব তাহলে কোন খেলা?

আগুনের খেলা।

ও ও ও।

জীবনের শুরু থেকে আগুন খেলা ভালোবাসেন মোশতাক।

এই কথার মধ্যে সাহিত্য নেই। নেই বাক্যালংকারের সৌন্দর্য। তাহলে? কী আছে এতে?

এতে আছে চক্রান্তের রেণু।

এগুলো সূক্ষ্ম এবং অতিচঞ্চল। খালি চোখে দেখা যায় না। এই রেণুতে মারাত্মক বিষ লাগানো। বিষবৃক্ষে এই রেণু একদিন ফুল ফোটায়। তিন বছর সাড়ে এগারো মাস পর পাকে বিষফল। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্টের প্রথম প্রহরে। এদিন তলায় নেমে যায় বিশ্বাস। সত্য-মিথ্যা একাকার হয়ে যায়। ইতিহাসের ছায়াপথে আটকে পড়ে হাঁপাতে থাকে হাজারো জল্পনাকল্পনা।

সে যা-ই হোক হত্যাকাণ্ডের পেছনের সত্য কি এড়িয়ে যেতে পারে ইতিহাস? আমরা জানি, সত্যের মৃত্যু নেই। তাই এই গল্পের প্রবেশদ্বার দুই হাত বাড়িয়ে ধরতে চায় সত্যের অণু-পরমাণু। কারণ, সব সময় তথ্য বদলের অপেক্ষায় বসে থাকে ইতিহাস।

ওই দিন বিশ্বাসঘাতকদের মিছিলে কারা হেঁটেছিলেন?

কাদের উত্তোলনে সত্য পরাজয় মেনেছিল? কেঁদেছিল বিচারের বাণী, ফেটেছিল ধরিত্রীর বুক।

যদি টাইমমেশিনে বসাই সফিউল্লাহ্, জিয়া, মওলানা ভাসানী এবং জাসদসহ চীনাপন্থি বামদের? তাহলে কি ভুলের কপালে বিজয় তিলক পড়বে? নাকি ঘন কালো মেঘে মুখ লুকাবে সত্য? এসব প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে আমরা এখন প্রবেশ করব চক্রান্তের অন্দরে।

১৯৭১ সাল।

পুরোদমে মুক্তিযুদ্ধ চলছে। বাংলাদেশ নামের একটি রাষ্ট্র ভূমিষ্ঠ হতে এখন কেবল সময়ের অপেক্ষা। প্রসববেদনা চরমে। সবকিছু চলছে অস্থায়ী সরকারের নেতৃত্বে। প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব হাতে নিয়েছেন তাজউদ্দীন আহমদ। কলকাতায় অফিস। মন্ত্রিসভার অন্যতম চরিত্র খন্দকার মোশতাক আহমদ। তার হাতে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।

২৫ মার্চ রাতে পাকিস্তানি সেনারা আক্রমণ করার পর হাজার হাজার মানুষ দেশ ছেড়ে ভারতে আশ্রয় নেয়।

৩০ মার্চ কুষ্টিয়া সীমান্ত দিয়ে ভারতে প্রবেশ করেন তাজউদ্দীন আহমদ। সঙ্গে ব্যারিস্টার আমীর-উল ইসলাম। সীমান্ত এলাকায় বিএসএফ ইন্সপেক্টর জেনারেল গোলক মজুমদারের দেখা হয়। তার সাহায্য চাইলেন তাজউদ্দীন।

গোলক বাবু একটা সামরিক কার্গো বিমানের ব্যবস্থা করে দিলে পহেলা এপ্রিল দিল্লি রওনা দেন। তিন দিন পর প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে দেখা করেন। এই সময়ের মধ্যে ফজলুল হক মনি, সিরাজুল আলম খান, আবদুর রাজ্জাক এবং তোফায়েল আহমেদ কলকাতায় হাজির হন। তারা উঠেছেন ভবানীপুরে চিত্তরঞ্জন সুতারের বাড়িতে।

এদিকে দিল্লি থেকে কলকাতায় ফিরে আমীর-উল ইসলাম একটি ভাষণ লিখে ফেললেন এবং আকাশবাণী রেডিওতে তাজউদ্দীনের কণ্ঠে তা রেকর্ড করা হয়।

এখনো আওয়ামী লীগের সিনিয়র নেতাদের সঙ্গে তাজউদ্দীনের যোগাযোগ হয়নি। কয়েক দিন পর ১০ এপ্রিলে মনি, তোফায়েল এবং মনসুর আলীকে নিয়ে আগরতলায় রওনা দেন তাজউদ্দীন। পথে যাত্রাবিরতি করলেন শিলিগুড়ি। উঠলেন পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারের গেস্টহাউসে। এদিন থেকে শুরু হয় তাজউদ্দীন বনাম মনির বিরোধ।

কৌশলে বিরোধিতার আগুনে ফুঁ দিলেন মোশতাক। মনির নেতৃত্বে একদল দাবি তোলেন, ২৬ মার্চ আটকের আগে মুক্তিযুদ্ধের নেতৃত্ব তাদের হাতে দিয়েছেন বঙ্গবন্ধু। শুধু তা-ই নয় তিনি স্পষ্ট করে বলেছেন, স্বাধীনতা আন্দোলন চলবে কমান্ড কাউন্সিলের নেতৃত্বে। সাতই মার্চের ভাষণেও তিনি একই কথা বলেছেন, 'গ্রামে গ্রামে, মহল্লায় মহল্লায় সংগ্রাম পরিষদ গঠন করো।' তাই অস্থায়ী সরকার গঠনের প্রশ্নই আসে না।

এই বিরোধিতার ফলে ১৭ এপ্রিলে মেহেরপুরে অস্থায়ী সরকার গঠনের দিন মনি, সিরাজ, রাজ্জাক এবং তোফায়েল ভারতীয় মেজর জেনারেল সুজন সিং উবানের সঙ্গে বৈঠক করলেন। গঠন করলেন বাংলাদেশ লিবারেশন ফোর্স। সংক্ষেপে 'বিএলএফ'। কয়েক দিন পর বিএলএফের নাম পাল্টে রাখা হয় মুজিববাহিনী। মুক্তিবাহিনীর সঙ্গে মুজিববাহিনীর দ্বন্দ্ব বড় হতে থাকে।

ডেপুটি হাইকমিশনার হোসেন আলীর অফিস কলকাতায়।

বেশ লম্বা-চওড়া। পেটানো শরীর। ক্লিন শেভ। চকচকে চেহারা। নাক লম্বা। চোখে মায়া নেই। কড়া সুগন্ধি কোনো সময় গা ছাড়ে না। টালিগঞ্জের সিনেমা জগতের কয়েকজন অভিনেত্রীর সঙ্গে তার মধুময় সম্পর্ক। সামনের পেশা কূটনীতিক। আসল কাজ পাকিস্তান গোয়েন্দা সংস্থার দায়িত্ব পালন করা। হঠাৎ হোসেন আলীর বদলির হুকুম পাঠায় ইয়াহিয়া সরকার।

এখন কী করব? সিদ্ধান্ত নিতে খন্দকার মোশতাকের সঙ্গে রাতে দেখা করলেন। সবার চোখ এড়িয়ে গেলেও কাউবয়দের এড়াতে পারলেন না হোসেন

আলী। গুরুভাই মোশতাক পরামর্শ দিলেন, 'কাল সকালে অফিসের সামনে বাংলাদেশের পতাকা ওড়াও। সবার সঙ্গে মিশে যাও। অল্পদিনের ভেতর সব ঠিক হয়ে যাবে।'

পরদিন হোসেন আলী তা-ই করলেন।

সবাই বললেন, বাহ্। সংবাদপত্রে বড় বড় অক্ষরে ছাপা হলো এই খবর। তবে মুক্তিযুদ্ধবিরোধী হোসেন আলীর আসল খবর কেউ জানল না। অফিসের সামনে বাংলাদেশের পতাকা উড়ছে আর ভেতরে নব উদ্যমে শুরু হয় মুক্তিযুদ্ধকে গলা টিপে মেরে ফেলার কাজ।

হোসেন আলীর অফিসে প্রতিদিন বিকেলে বৈঠক বসে, চলে মধ্যরাত পর্যন্ত। কোনো কোনো দিন সারা রাত।

এখানে জড়ো হন তাহেরউদ্দির ঠাকুর, ওবায়দুর রহমান, শাহ মোয়াজ্জেম হোসেন, কাজী জহিরুল ইসলাম, চট্টগ্রামের সংবাদপত্র দৈনিক আজাদীর সম্পাদক মোহাম্মদ খালেদসহ কয়েকজন। মাঝেমধ্যে যোগ দেন মাহবুবুল আলম চাষী এবং কলকাতায় কাজ করা মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থা সিআইএর কয়েকজন অফিসার।

চক্রান্তের বেলুনটা বড় করা হয়েছে। এখন তা ফাটাতে আমেরিকা যাচ্ছেন মোশতাক। লোকে জানবে জাতিসংঘের সাধারণ অধিবেশনে যোগ দিতে নিউ ইয়র্ক গেছেন। সঙ্গে থাকবে কয়েকজন। সবাই তার ডান হাত। তার কোনো বাম হাত নেই। বাম শব্দটাই অপছন্দের। আমেরিকা গিয়ে চূড়ান্ত করবেন মুজিবনগর সরকারের বিরুদ্ধে আরেকটি সরকার।

জুলাই মাসে সব চূড়ান্ত করেছেন কুমিল্লার সংসদ সদস্য কাজী জহিরুল ইসলাম। মুক্তিযুদ্ধের সময় গঠন করা জাতীয় পরিষদের পূর্বাঞ্চলীয় জোনের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা জহিরুল। পরিকল্পনা ছিল, নিউ ইয়র্ক থেকে মোশতাক ঢাকায় ফিরে এসে পূর্ব পাকিস্তান কনফেডারেশন গঠনের ঘোষণা দেবেন।

এই ষড়যন্ত্র সুনামির মতো দু-তিনতলা ঢেউ তুলল।

সাধারণ মানুষ এসব ঢেউয়ের কিছু জানল না। গোয়েন্দাদের চোখ এখন ছানাবড়া। 'র' অফিস গরম হয়ে আছে। কারণ, চক্রান্ত বাস্তবায়িত হলে এক ধাক্কায় উল্টে যেত মুক্তিযুদ্ধ।

মোশতাকের শেরওয়ানির পকেটে ভাঁজ করা প্লেনের টিকিট।

দলবল নিয়ে কাল উড়াল দেবেন। দমদম বিমানবন্দরে বিকেল সাড়ে চারটায় পৌঁছতে হবে। ঘড়ির কাঁটা এগোচ্ছে।

মাহবুবুল আলম চাষী গোয়েন্দা নজরদারিতে থাকলেও কাজী জহিরুল ছিলেন মুক্ত। আমেরিকা যাওয়ার নামে তিনি কোন বুদ্ধি পাকাচ্ছেন? তা স্পষ্ট হচ্ছিল না। হঠাৎ হাতে পাওয়া একটা চিরকুট কথা বলে। সব জেনে যায় কাউবয়েরা। চিরকুটে লেখা ছিল 'ফাইনালি এন-ই ওকে'।

জরুরি আলোচনায় প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ ডেকে পাঠালে চিরকুটের কথা ভুলে যান মোশতাক। অফিসের পিয়ন রাধানাথ এই চিরকুট 'র' অফিসে পৌঁছে দেয়।

রাধানাথ 'র'-এর লোক।

ছদ্মবেশে পিয়ন সেজে কাজ করে মোশতাকের অফিসে। কাউবয়দের খুঁজে বের করতে কষ্ট হয় না, এন-ই অক্ষরের মানে 'নিক্সন-ইয়াহিয়া ওকে'। বেশ কিছুদিন থেকে গোয়েন্দারা খ্যাপার মতো চক্রান্তের গন্ধ খুঁজে বেড়াচ্ছিল কিন্তু সূত্র মিলছিল না। চিরকুটের সূত্র ধরে আগস্টের শেষ সময়ে এলোমেলো সুতাগুলো জোড়া লাগায় কাউবয়েরা। মিলে যায় অঙ্ক। গোয়েন্দা দফতরে সিদ্ধান্ত হয়, এই খবর দ্রুত তাজউদ্দীনকে জানাতে হবে।

রাজা হওয়ার আনন্দে রাতে আরামের ঘুম হয়নি মোশতাকের।

বেশি আনন্দে তার ঘুম হয় না। এমনিতে রাত দুইটা থেকে সকাল দশটা পর্যন্ত ঘুমানোর অভ্যাস। এবার অনেকদিনের স্বপ্ন পূরণ হতে চলেছে। এটা কোনো সাদামাটা স্বপ্ন নয়। রাজা হওয়ার স্বপ্ন। রাতে রাজা হওয়ার স্বপ্ন পাশবালিশের মতো জড়িয়ে ঘুমানোর চেষ্টা করেছেন। ঘুম আসেনি।

সকালের আলো ফোটার আগে বিছানা ছাড়লেন। গোসল করে ফজরের নামাজ পড়ে বসলেন বারান্দার চেয়ারে। একটু পর ঘরে এসে ড্রয়ার থেকে একটা ধাতব মুদ্রা বের করে বিছানার ওপর বসে টস করলেন।

একবার পক্ষে, একবার বিপক্ষে। তৃতীয়বার টস করতে মন সায় দিল না। যদি বিপক্ষে যায়? মন খারাপ হবে। চাকরকে ডেকে বললেন, কড়া করে এক মগ চা দে।

কলকাতার সকাল।

আনাচে কানাচে এখনো অন্ধকারের জটলা।

কুমোরটুলির জীর্ণ বাসা থেকে বের হলেন একজন। এই এলাকা গাছগাছালিতে ভরা। আজকের মতো তখন গায়ে গায়ে বাড়ি ছিল না। বাড়ির আশপাশে বেশ কয়েকটা ছোট-বড় পুকুর। পাশে গুরুগম্ভীর মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে একটা পুরুষালি পৌর ট্যাংক।

কয়েক মাস ধরে এলাকায় একজন অচেনা লোক ঘোরাফেরা করছেন। কেউ জানে না লোকটা কী কাজ করেন? কেউ সালাম জানালে শুধু মাথা নাড়ান। মুখে হাসি নেই। গম্ভীর প্রকৃতির। খোঁচা খোঁচা দাড়ি। পনের দিন পর পর শেভ করেন। পুরু গোঁফ। মাথায় কাঁচা-পাকা চুল। গায়ে কেরানি মার্কা পোশাক।

গতকালের ঘামে শক্ত হওয়া শার্টটা গায়ে চড়ালেন। কিছু দূর এগিয়ে রাস্তার মোড়ে মানুষটানা ঠেলা পাওয়া গেল। চালক ঠেলার ওপর এতক্ষণ ঘুমাচ্ছিল। এই মাত্র আড়মোড়া ভাঙছে। চোখের কোনায় এখনো ঘুম। যাই-যাই করেও যাচ্ছে না। মানুষটানা ঠেলায় উঠতে ভালো লাগে না, কিন্তু এখন কোনো বিকল্প নেই। তাড়াতাড়ি যেতে হবে, দেরি করলে বিপদ বাড়বে। তাই বাধ্য হয়ে ঠেলায় উঠতে হলো।

ঠেলা চালক জানতে চাইলেন, কোথায় যাবেন?

চলুন, আমি বলে দেব।

একবার ডানে, একবার বাঁয়ে বলতে বলতে এগিয়ে চললেন। রাস্তার পাশে কয়েকজন ভাসমান নারী ঘুমিয়ে আছে। রাতের ক্লান্তি জড়ানো শরীর। পাশে নগরের সাপ্লাই পানিতে দুজন গোসল সারছে। দাঁড়ানো একজনের হাতে টুথপাউডার। ডান হাতের অনামিকা দাঁতের ভেতর আসছে আর যাচ্ছে। কয়েকটা ছানা নিয়ে দেয়াল ঘেঁষে শুয়ে আছে একটি মা-কুকুর।

প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীনের সঙ্গে আগে থেকে লোকটার পরিচয়।

খবর দেয়া-নেয়া ছিল।

ভোরে ঘুম থেকে ওঠা তাজউদ্দীনের পুরোনো অভ্যাস। কয়েকটা খবরের কাগজ নিয়ে বারান্দায় বসে আছেন। সামনে রাখা ছোট আকারের গোলটেবিলে চায়ের পেয়ালা। পেয়ালায় ঠোঁট লাগাবেন, এমন সময় গেটের সামনে লোকটাকে দেখে চমকে যান।

সাতসকালে এই লোক কেন? পেয়ালায় চুমুক দেয়া হলো না।

গেটের সামনে ভাড়া মিটিয়ে ঠেলা ছেড়ে ভেতরে প্রবেশ করল লোকটা। সিকিউরিটির লোকজন আটকাল না। সবাই জানে সাদামাটা চেহারার লোকটা সাধারণ কেউ নন। মাসে দু-চারবার আসেন। প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে অনেক সময় ধরে কথা বলেন। তখন ভেতর থেকে দরজা বন্ধ থাকে।

টেবিলের সামনে এসে লোকটা বসলেন। পিয়ন আরেক পেয়ালা চা দিয়ে যায়। না ডাকলে এসো না, বললেন তাজউদ্দীন। পিয়নের নাম সন্তোষ কুণ্ডু। লোকটা সন্তোষের চেনা, তার বস। দুজনই কাউবয় দলের সদস্য। মোশতাকের চক্রান্তের

কথা শুনে চেয়ার থেকে লাফিয়ে উঠলেন তাজউদ্দীন। চোয়াল শক্ত হতে থাকল। গালে লালের আভা ফুটে উঠছে। রাগে শরীর কাঁপছে।

মন্ত্রিত্ব থেকে সরিয়ে দেন, লোকটা বলল।

এই মুহূর্তে সেটা করা ঠিক হবে না।

অদ্ভুতভাবে তাকিয়ে লোকটা বলল, এখনই আমেরিকা যাওয়া বন্ধ করুন।

আমি করলে অন্য ঝামেলা হবে। আপনারাই সেটা করুন।

আমরা?

মাথা নেড়ে সায় দিলেন তাজউদ্দীন।

লোকটা হনহন করে বেরিয়ে যান। বারান্দা থেকে শোবার ঘরে এসে বিছানায় শুয়ে পড়লেন তাজউদ্দীন।

সকাল নয়টা পাঁচ মিনিটে 'র' কেন্দ্রীয় অফিস থেকে ফোন এল।

মোশতাক ধরলেন, 'আপনার আমেরিকা যাওয়া হচ্ছে না, সরি।' কোনো কথা বলার সুযোগ না দিয়ে ফোনটা রেখে দিলেন 'র' কর্তা।

এই খবরটা মাথায় বাজ হয়ে পড়ল।

আমার ভাগ্য কি জ্যৈষ্ঠের আকাশ? বারবার গুড়ে বালি হচ্ছে কেন? বিড়বিড় করে বললেন মোশতাক। চোখের পাতা ভিজে উঠল। এই কষ্ট কাউকে বুঝতে দিলেন না। রুমাল দিয়ে চোখ মুছলেন।

অন্তরের আগুন চেপে রাখলেন শেরওয়ানির তলায়।

এরপর কি ফণা নামিয়ে রাখলেন?

লেজ গুটিয়ে রাখলেন?

না, তা করেননি।

বরং আরো বড় ফণা তুললেন তাজউদ্দীন ইস্যুতে। আবদুর রব সেরনিয়াবাতকে সামনে রেখে প্রধানমন্ত্রীকে সরানোর কাজ জোরেশোরে শুরু করলেন। ৪০ জন সাংসদ স্বাক্ষর করা একটা আবেদনপত্র তুলে ধরলেন মন্ত্রিপরিষদের বৈঠকে। আবেদনপত্রে সবাই লিখিত মত দিয়েছেন, 'তাজউদ্দীন অযোগ্য'।

চক্রান্ত আর ঘুঁটিবাজি ছাড়া মুক্তিযুদ্ধের সময় খন্দকার মোশতাকের অন্য কাজ ছিল না। আমেরিকা যাওয়ার ষড়যন্ত্র ফাঁস হওয়ার পর দাফতরিক কাজ থেকে সরে এসে, সময় বাড়ালেন ধর্মের কাজে। পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ ছাড়াও দিনে আরো কয়েকবার নামাজ পড়তেন।

চক্রান্ত ফাঁসের পর প্রেসনোট জারি করে পররাষ্ট্রসচিবের পদ থেকে মাহবুবুল আলম চাষীকে সরিয়ে দিলেন তাজউদ্দীন।

এদিন থেকে বাতাসে ভেসে বেড়াত চক্রান্তের গল্প। মুখে মুখে ছড়ানো কথার ছানাপোনা জন্ম হতে থাকে। এসব নিয়ে দিল্লিতে জরুরি সভা বসল। প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী বাংলাদেশের অস্থায়ী সরকারকে আমন্ত্রণ করেছেন। সবাই গেছেন, মোশতাক বাদে। অনেকের মনে প্রশ্ন জাগল, তিনি কি ইচ্ছা করে যাননি? নাকি আমন্ত্রণ পাননি?

চক্রান্ত ফাঁসের পর তাজউদ্দীনসহ অন্যদের মাথায় একই প্রশ্ন ঘুরেফিরে আসছে। মোশতাক কি মানুষ? নাকি মানুষের বদলে অন্য কিছু?

তাহলে সেটা কী?

প্রশ্নের খোঁচায় বেরিয়ে আসে উত্তর।

সম্ভবত সাপ।

মুক্তিযুদ্ধকে ব্যাঙ ভেবে কি গিলে ফেলতে চান?

আগুন খেলার শুরু মুক্তিযুদ্ধের প্রথম থেকে। অস্থায়ী সরকারের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব পেয়ে খুশি ছিলেন না। চেয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী বা রাষ্ট্রপতির পদ। তখন থেকে বাড়তে থাকে গায়ের জ্বালা। তবে মাহবুবুল আলম চাষীকে নিজ মন্ত্রণালয়ের সচিব করতে পেরে কিছুটা স্বস্তি ফিরে আসে। দুজন মিলে চক্রান্তের বেলুনে ফুঁ দিতে থাকেন।

মাহবুবুল আলম চাষী ঝানু লোক।

নামের সঙ্গে 'চাষী' শব্দটা আগে ছিল না, নতুন লাগানো। আইয়ুব জামানায় ছিলেন জুলফিকার আলী ভুট্টোর সচিব। পূর্ব বাংলার মানুষ তাকে পাকিস্তানের দালাল বলে জানতেন। ১৯৬৯ সালের গণ-আন্দোলনে সারা দেশ টালমাটাল হয়ে উঠলে চাকরি ছেড়ে রাঙামাটি এলাকায় কৃষি কাজ শুরু করেন। তখন নামের সঙ্গে জুড়ে দিলেন 'চাষী'।

লোকজনকে বোঝালেন, আমি একজন সাধারণ মানুষ। এটা তার বাইরের চেহারা। ভেতরে জিলাপির প্যাঁচ। হাঁটা, চলা, তাকানো, কথা বলা এমনকি চশমার ফ্রেম, সবকিছুই সন্দেহজনক। রাঙামাটি থেকে গোপনে ঢাকায় আসা-যাওয়া করতেন। ১৯৬৯ সাল থেকে দুই বছর আড়ালে থাকলেন। হঠাৎ মুজিবনগর সরকারের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বে কী করে বসলেন? এ কথা অনেকেই ভাবলেন।

এদিকে আমেরিকা না যেতে পারার কষ্টে পুড়ে যাচ্ছেন মোশতাক। একই ভাবনা মনের মধ্যে বারবার উঁকি মারছে। কীভাবে ধরা খেলাম? ভেবে তল পাচ্ছেন না। সারা জীবন চক্রান্তের বেলুনে ফুঁ দিয়ে মোশতাক কীভাবে নিজের চোরাবালিতে ডুবলেন? উত্তর খোঁজে সুমন।

কে এই সুমন?

এবার তার পরিচয় জানা যাক। বঙ্গবন্ধুর ছোট ছেলে শেখ রাসেলের সহপাঠী। একেক জায়গায় তার একেক নাম। আমি সুমন নামে চিনি। ট্র্যাডিশনাল মধ্যবিত্ত। বেয়াড়া গোছের মূল্যবোধ। এককথায় যাকে বলে টনটনে সেনসেটিভ। বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি।

বাঙালি গোয়েন্দা ফেলুদার মতো চিরকুমার।

একবার ব্যোমকেশের মতো বিয়ে করে সংসারী হওয়ার ইচ্ছা জেগেছিল। পরে কি এক অজানা কারণে বিয়ে করেনি। অনেকবার বলেছি, বিয়ে না করলেও প্রেম তো করতেই পারো। সুমন বলে, প্রেমের কোনো দরকার নেই। যদিও শরীরটা মাঝেমধ্যে জ্বালায়, তবু ভালোই তো আছি। একজন নারীকে জীবনে ঢোকানো বড়ই অশান্তির কাজ।

মাথার ওপর দু-চারটা রুপালি চুল উঁকি দিতে শুরু করেছে। শুনেছি, এনজিওতে কাজ করে। চাকরির পাশাপাশি কয়েকটা বিদেশি প্রতিষ্ঠানে পার্টটাইম রিসার্চ-বেইজড কাজ করে। ফেলুদা বা ব্যোমকেশের মতো ছোটখাটো বিষয়ে গোয়েন্দা বুদ্ধি কাজে লাগায় না। ইট-পাথরের তলায় চাপা পড়া ইতিহাসের সত্য ঘটনা টেনে বের করে। মাঝেমধ্যে এলেবেলে লেখালেখি করে। জীবন নিয়ে সুমনের কোনো আক্ষেপ নেই। টাকাপয়সার পেছনে ছোটাছুটি নেই। তবে ভাবুক।

শুনেছি বাংলাদেশ, ভারত এবং পাকিস্তানের কয়েকজন রিটায়ার্ড গোয়েন্দা কর্মকর্তার সঙ্গে সুমনের বেশ ঘনিষ্ঠতা। ধানমন্ডি লেকের পাড়ে মাঝেমধ্যে আমার সঙ্গে দেখা হয়। দেখা হলে জানতে চায়, দেশের রাজনীতিতে 'মোশতাক সিনড্রোম' কীভাবে উদয় হলো?

বঙ্গবন্ধুর বিষয়ে সুমনের আগ্রহ মাত্রাছাড়া।

অল্পবয়সে টের পায়, সারা জীবনের কাজ হতে চলেছে ধানমন্ডির বাড়িতে ঘটে যাওয়া নৃশংসতার ব্যাকরণ খোঁজা এবং তা মানুষকে জানানো। পরিষ্কার করে জানতে চায়, বঙ্গবন্ধু খুনের পেছনে কী স্বার্থ ছিল আমেরিকা ও চীনের? মুক্তিযুদ্ধের পরে পাকিস্তান কী চেয়েছিল? ফারুক-রশিদের ষড়যন্ত্র পাকা হলো কীভাবে? কে আসল খুনি? এদের পেছনে কারা?

বিভিন্ন সূত্রে যা জেনেছে তা লিখে রাখে রেক্সিনে বাঁধানো নোটবুকে। অনেক বছর ধরে কলমের পেছনে কামড়ে-টামড়ে নোটবইয়ের পাতায় সবকিছু লিখে রেখেছে।

মাঝেমধ্যেই কলকাতায় যায় সুমন। আজ আবার যাচ্ছে।

কিছুক্ষণ আগে উঠে বসেছে ট্রেনে।

দুই দিন আগে কলকাতা থেকে সাংবাদিক বন্ধু অমলেশ ফোন করে বলে, "দ্রুত চলে আয়। একজন রিটায়ার্ড 'র' কর্তার ডায়েরি পাওয়া গেছে। ১৯৭১ থেকে দশ বছর কাজ করেছেন উচ্চ পদে। কিছুদিন আগে তিনি মারা গেছেন। ভদ্রলোকের মেয়ের ঘনিষ্ঠ বন্ধু আমার স্ত্রী পায়েল। ওই মেয়ের নাম রুমা। সে দেশের বাইরে চলে যাচ্ছে। মনে হয়, এই ডায়েরিগুলো তোর কাজে লাগবে।"

এ কথা শোনার পর সুমন অস্থির। হাতে টাকা নেই। শেষমেশ নিজের সংগ্রহে থাকা কিছু প্রাচীন মুদ্রা বিক্রি করে দেয়। মাল্টিপল ভিসা আগেই লাগানো ছিল।

ট্রেন ছাড়ার মিনিট বিশেক পর, পাশের সিটে বসা একজনের কথা শুনে চমকে যায়। লোকটা বলে, আপনার হাতের বইটা সত্য না, ভুলে ভরা। দুনিয়ায় ভুল ধরা লোকের অভাব নেই। কোথাও একটু ফাঁক পেলেই নিজের বিশেষজ্ঞ ভাব জাগায়। সুমন বিরক্ত। ট্রেনে বই পড়া তার পুরোনো অভ্যাস। জানালার পাশে বসে বেশ হাওয়া খেতে খেতে এতক্ষণ বই পড়ছিল। হাতে 'বাংলাদেশ রক্তের ঋণ' নামের একটা বই। অ্যান্থনি মাসকারেনহাসের এ লিগ্যাসি অব ব্লাডের ভাষান্তর। পড়া এগোচ্ছে না। পাতা ওল্টালে ঘাতকের মুখ চোখে ভাসে।

পাশের সিটে বসা প্রায়-প্রবীণ মানুষটির কথায় পাত্তা দেয়নি সুমন।

আবার ভাবল, কেন বলল এসব?

টেনেটুনে সাড়ে পাঁচ ফুটের একটু বেশি। মোটা চেহারা, মোটা গোঁফ, মাথায় তেলতেলে টাক। গায়ের রং শ্যামলা। পরনে চেক ব্লেজারের নিচে হাফ সোয়েটার। গলায় মাফলার। পান খাওয়া দাঁত। কালো ঠোঁটের ওপার থেকে জনপ্রিয় বই সম্পর্কে এমন মন্তব্য শুনতে ভালো লাগল না সুমনের।

কিছুক্ষণ পর ওই লোকটা বলল, কী করেন?

এনজিওতে চাকরি করি।

আপনি কী করেন?

সেনাবাহিনীতে ছিলাম। রিসালদার। ছিয়াত্তর সালে রিটায়ার্ড।

বাড়ি কোথায়?

নরসিংদীর গ্রামে। সেখানে আর যাই না।

কই থাকেন?

ভারতে থাকি। তেমন কিছু করি না।

এই বইয়ের ভুল কোথায়?

সে অনেক কথা।

অল্প কথায় বলেন।

অল্প কথায় বললে বুঝবেন না।

এরপর আর কোনো কথা হয় না। দুজনেই চুপচাপ। ব্লেজারের পকেট থেকে কাগজে মোড়ানো একটা পান বের করে মুখে গুঁজে দেয় লোকটা। লম্বা যাত্রার পর ট্রেন একসময় থামল কলকাতার শিয়ালদহ। ট্রেন থেকে নামার সময় মানুষের চাপাচাপির ভেতর কানের কাছে মুখ নিয়ে লোকটা বলে, বেশি ব্যস্ততা না থাকলে আমার সাথে আসতে পারেন।

কোনো কথা না বলে বাধ্য ছেলের মতো পেছন-পেছন হাঁটতে থাকে সুমন। শিয়ালদহ রেলস্টেশন থেকে বেরিয়ে একটা অটোতে দুজন উঠে বসে। অটোওয়ালাকে লোকটা কী যেন বলল, সুমন শুনতে পায়নি। সম্ভবত জায়গার নাম বলেছে। কিছুক্ষণ চলার পর একটা বস্তি এলাকার পাশে দাঁড়ায় অটো।

সন্ধ্যা গড়িয়ে রাত নেমেছে। বিদ্যুৎ বাতিতে ভরে উঠেছে শহর। অটোর ভাড়া মিটিয়ে লোকটা বলল, এখানে লোকজনের হাত দেখি, পাথর বেচি আর ঘুরে বেড়াই। দুই-চার বছর পর পর বাংলাদেশে যাই। এবার গেলাম সাড়ে চার বছর পর। আমি এখন এখানকার নাগরিক।

হাত দেখে কি ভাগ্য বলা যায়? সুমন প্রশ্ন করে।

সব বোগাস।

আর কোনো কথা বলে না সুমন। লোকটার পেছন পেছন হাঁটতে থাকে। বস্তির ভেতরে একটা আধাপাকা ঘরের সামনে এসে বলে, ভেতরে চলে আসুন। আমরা এসে পড়েছি।

টিনশেড একটা ঘরের ভেতরে লোকটা প্রবেশ করে। ভেতরে একটা খাট পাতা। পাশে একটা ওয়ার্ডরোব। বিছানায় অনেক বালিশ আর একটা নকশিকাঁথা ভাঁজ করা। ওয়ার্ডরোবের ওপর একটা রঙিন টিভি। এখন স্টার জলসায় 'মা' নাটক চলছে। দুজন নারী এসে লোকটার কাছে দাঁড়ায়। একজনের বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি। অন্যজনের টেনেটুনে ত্রিশ বছর হতে পারে। লোকটা বলে, এই দুইজন আমার স্ত্রী। আমাদের চা দাও। আপনার চায়ে চিনি চলবে?

চলবে।

লোকটার ছোট স্ত্রী চা নিয়ে এল।

সঙ্গে চীনামাটির পিরিচের ওপর তিনটা বিস্কুট। চায়ের পেয়ালা হাতে নিয়ে লোকটা বলল, মুজিবের বাড়িতে আমি সবচেয়ে বেশি গুলি করেছি। ওই রাতে মাথা গরম ছিল। এখন নেই। ফারুক স্যার কাজটা ঠিক করেনি। '৭৫ সালের পর দেশেই ছিলাম। নরসিংদী বাজারে কাপড়ের দোকান করেছিলাম। শেখের বেটি ক্ষমতায় আসার পর ভারতে চলে আসি।

প্রশ্ন করে সুমন।

রাসেলকে কে গুলি করে?

একজন রিসালদার হাত ধরে তাকে নিয়ে যায় দোতলায়। ততক্ষণে বাড়ির সবাই শেষ। ঘরের মেঝেতে পড়ে থাকা মায়ের লাশ জড়িয়ে কেঁদে ওঠে ছেলেটা। পাশ থেকে ওই রিসালদার স্টেনগান দিয়ে গুলি করে। রাসেলের মাথার খুলি উড়ে যায়, মগজ আর ডান চোখ বেরিয়ে আসে।

এ কথা শুনে সুমন আকাশ থেকে পড়ে। কাঁপা কাঁপা গলায় প্রশ্ন করে কে এই রিসালদার?

আজ না আরেকদিন বলব।

আজই বলুন।

আজ না। এমনি অনেক কথা বলেছি।

শিয়ালদহ রেলস্টেশনের উত্তর পাশে বসি। লোকে আমাকে চেনে জ্যোতিষ মহারাজ নামে। খুঁজে পেতে অসুবিধা হবে না। পরে একদিন আসবেন, কথা হবে।

কাল আসব?

না। কাল আজমির যাব।

কবে ফিরবেন?

মাসখানেক পর। সেখানেই বেশি সময় থাকি।

আর কিছু ভাবতে পারছে না সুমন। মাথার ভেতর চরকির মতো কী যেন ঘুরছে। কিছু সময়ের জন্য সব ব্ল্যাকআউট। লোকটা বলল, রাতটা আমার বাসায় থাকতে পারেন।

না, চলে যাই।

ভরপুর মদ পান করা মাতালের মতো টলতে টলতে বের হয়ে আসে সুমন। খানিকটা পথ চলে এসে ফাঁকা জায়গায় দাঁড়ায়। এখানে রাস্তার পাশে একটা বুড়ো নারকেলগাছ। এই গাছের গোড়ায় বসে পড়ে সুমন। মাথাব্যথা করছে। মনে হচ্ছে মাথা ভেঙে পড়ছে। কাছে একটা গাড়ি মেরামতের ওয়ার্কশপ। ঢং ঢং শব্দ শোনা যাচ্ছে।

মগজে সিগারেটের নেশা চাপ দেয়। জিনসের পকেট থেকে কুঁচকে যাওয়া প্যাকেট বের করে। দুটো সিগারেট ছিল। শতবর্ষী মানুষের চামড়ার মতো ভাঁজ পড়েছে। একটা বের করে। বাঁ হাতে ধরে। ডান হাতের আঙুল দিয়ে টেনে কিছুটা সোজা করল। এতে আগুন জ্বালিয়ে আবার পা ফেলে। কিছুটা পথ এসে একটা হলুদ ট্যাক্সিক্যাব পায়।

ড্রাইভারকে বলে, যাবেন?

কোথায় যাবেন?

গালিব স্ট্রিট।

আসুন।

ট্যাক্সিক্যাবে উঠে বসে সুমন।

কলকাতায় এলে মন ভালো হয়। এবার তা হচ্ছে না।

ট্রেনে দেখা লোকটার কথাগুলো মাথার ভেতর ঘুরছে। ক্ষুধা-তেষ্টা কিছুই কাছে আসছে না। সুমন ভাবে, সে আজ একটা ধ্বংসস্তূপ। বয়ে চলা সময়ের সাথে নিজের সবকিছু উল্টেপাল্টে যাচ্ছে। মাথার ভেতর ঘড়ির পেন্ডুলামের মতো রাসেলের মুখটা অনবরত দোল খাচ্ছে।

কোনোমতে রাত কাটল। একটুও ঘুম হলো না। সকালে ভাবল, ১৫ আগস্ট হত্যাকাণ্ডে 'রিসালদার' কে কে ছিল? এ কথা মনে হতেই সুমন চমকে যায়। একজনই ছিল রিসালদার।

কীভাবে রিসালদার মোসলেমউদ্দিনের নাম ভুলে গেলাম? নিজেকে বোকা মনে হচ্ছে। কোনোমতে একটা টিশার্ট গায়ে দিয়ে হোটেল থেকে দৌড়ে বেরিয়ে যায় সুমন। একটা ট্যাক্সি ধরে সোজা হাজির হয় শিয়ালদহ রেলস্টেশনে।

এলাকায় হন্যে হয়ে খুঁজে চলল জ্যোতিষ মহারাজ নামের লোকটাকে। কেউ হদিশ দিতে পারল না। জ্যোতিষ ভীঙ্গরাজ, জ্যোতিষ ভারতী এ রকম নামের কয়েকজনকে পেলেন। তবে তারা কেউ গতকাল দেখা লোকটা নয়। তাহলে? ওই লোকটা কি আমাকে ঢপ মেরেছে? অটো চেপে কাল ওই লোকটার সঙ্গে যে এলাকায় গিয়েছিল, সেই এলাকার কথা মনে করতে পারল না।

বিধ্বস্ত মন নিয়ে বিকেলে কলেজ স্ট্রিট যায় সুমন। এখানে সারি সারি বইয়ের দোকান। কোনো কিছুতে মন বসছে না। নিজেকে তাড়া খাওয়া অপরাধী মনে হচ্ছে। কোনো কিছু সহজভাবে নিতে পারে না। সবকিছুতেই ছন্দপতন।

সন্ধ্যার আগে হঠাৎ বৃষ্টি শুরু হয়। একটা পুরোনো বিল্ডিংয়ের কার্নিশের তলায় দাঁড়ায় সুমন। বৃষ্টির কণাগুলো গাল বেয়ে নেমে যাচ্ছে। এই অদ্ভুত আনন্দের

ভেতরে মনের মধ্যে বিষাদের সুর। সুমন ভাবে, শুধু তানসেন না, আরেকজনের ক্ষমতা আছে বৃষ্টি নামাবার। তার নাম রাসেল। যেদিন বেশি করে ওর কথা মনে পড়ে সেদিন বৃষ্টি কল্পনায় টেলিপ্যাথি হয়। বিজলি চমকায়।

অমলেশকে মনে পড়ছে। এখন তার সঙ্গে দেখা হলে ভালো লাগত। আজ সে কলকাতায় নেই। জরুরি প্রয়োজনে বেহালায় দিদির বাড়ি গেছে। ফিরবে কাল সকালে। ভেজা শরীর নিয়ে হোটেলে ফিরে আসে সুমন। রাতে ঘুম হলো না। আসার সময় নিউ মার্কেটের সামনের মদের দোকান থেকে এক বোতল হুইস্কি এনেছিল। ভোররাত পর্যন্ত বোতলের পুরোটুকু পাকস্থলীতে চালান করে দেয়। তবুও ঘুমের দেখা মিলল না। বেশি পান করলে বমি হয়। আজ তাও হলো না।

সকাল সাতটা থেকে ১০টা পর্যন্ত বিছানায় মৃত মানুষের মতো পড়ে ছিল। সাড়ে এগারোটার দিকে হোটেলে আসে অমলেশ। তার দিদির বর খুব অসুস্থ। তাই হাসপাতালে দৌড়াদৌড়ি করতে হচ্ছে। সিভিয়ার হার্ট অ্যাটাক। বাঁচার সম্ভাবনা কম।

অমলেশ বলে, রুমা গতকাল বিদেশ চলে গেছে। আগের দিন তার বাবার এই ডায়েরিগুলো দিয়ে যায়। খুলে দেখতে পারিনি। আমার মনে হচ্ছে, এসব তোর কাজে লাগবে। প্রথমে দেবে না বলছিল, পরে রাজি হয়। যার ডায়েরি তিনি ছিলেন 'র'-এর সেকেন্ডম্যান।

এসব বলে একটা বড় আকারের প্যাকেট সুমনের হাতে দিয়ে বলে, সরি সুমন, ঝামেলায় আছি, এখন সময় দিতে পারলাম না। সুমন হেসে উত্তর দেয়, আমাকে নিয়ে ভেবো না, হাসপাতালে সময় দাও। অমলেশ চলে যায়। দরজা আটকে বিছানার ওপর উপুড় হয়ে শুয়ে প্যাকেটটা খোলে। বেরিয়ে পড়ে মাঝারি আকারের পাঁচটা ডায়েরি। সব ইংরেজিতে লেখা। একটার প্রথম পৃষ্ঠা পড়ে সুমনের চোখ ছানাবড়া। ফুল স্পিডে ফ্যান চলছে তবু ঘেমে জবজবে হয়ে যায়।

পাঁচ দিন পর ঢাকায় ফিরে আসে সুমন। নানা রকম ঘটনার ভেতর এবার কলকাতার দিনগুলো কেটেছে। বেশিরভাগ সময় থেকেছে হোটেলে। রাত-দিন এক করে পড়েছে 'র' কর্তার ডায়েরি।

এই কয়েকদিন ৩২ নম্বর বাড়ির সামনে সুমন আসেনি। ঢাকায় থাকলেও আজকাল কম আসা হয়। চাকরিতে যোগ দিয়ে আর সময় মিলছে না। চাকরি করার ইচ্ছা ছিল না কোনোদিন, আজও নেই। এদিকে বেকারত্ব আর টানতে পারছিল না। জীবনের প্রয়োজনে জুতোর শুকতলা ক্ষয়ে চাকরিটা পেয়েছে।

মাঝারি আকারের এনজিওতে হিসাব বাবুর পোস্ট। সারা দিন মুখ গুঁজে এল-গেলর ধারাপাত মেলানোর কাজ করে।

সব সময় দুই চোখে আশার বাতি জ্বেলে রাসেলকে খুঁজে বেড়ায়। সুমন জানে সে আর কোনোদিন ফিরবে না। তাহলে কেন এই প্রতীক্ষা? নিজ অন্তরে ছুড়ে মারে প্রশ্ন। উত্তরের সাড়া মেলে না। এমনকি একটু নাড়াও লাগে না। ধানমন্ডি ৩২ নম্বর বাড়ির সামনে এলে শুনতে পায় রাসেলের ভয় জড়ানো আর্তনাদ, আমাকে মেরো না।

এখন শ্রাবণ মাস। বৃষ্টির বিরাম নেই।

বৃষ্টি আসছে আবার পরক্ষণে আকাশ পরিষ্কার। লেকের পাড়ের গাছগুলোর পাতা ঘন সবুজ হয়ে উঠেছে। এখন বৃষ্টি পড়ছে না। লেকের পাড়ের রাস্তা দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে এগিয়ে যায় আট নম্বর ব্রিজের দিকে। হঠাৎ বুকপকেটে রাখা মোবাইল ফোন বেজে ওঠে। ধরতে ধরতে কেটে যায়। গ্রামের বাড়ি থেকে মা ফোন করেছিল। কল ব্যাক করে শুনতে পায়, 'পর্যাপ্ত ব্যালান্স না থাকায় আপনার সংযোগ বিচ্ছিন্ন করা হয়েছে।' এমন সময় রাস্তায় একটা নীল গাড়ি দেখতে পায়। বড় বড় ধাপ ফেলে এগিয়ে যায় সুমন।

না, এই গাড়িতে রাসেল নেই।

এ রকম প্রায়ই হয়। নীল রঙের গাড়ি দেখলে মনে হয়, এই বুঝি রাসেল আসছে।

আকাশ থেকে মেঘের পাল সরে গেছে।

পশ্চিম আকাশে এখন লাল রং। ডিম ভাঙা কুসুমের মতো। এই আকাশ ভালো লাগে না, পুব আকাশে সকালের রংটা সুমনের প্রিয়। বারবার এই আকাশে ফিরতে চায়।

মনে পড়ে ১৯৭৫ সালের ১৪ আগস্টের বিকেলের কথা। সারা দিন ভ্যাপসা গরম ছিল। আকাশে ভেসে বেড়াচ্ছিল টুকরো টুকরো মেঘ। এদিন রাসেলের সঙ্গে শেষবারের মতো দেখা হয়। কিছুক্ষণ গল্প করে বাসায় চলে আসবে এমন সময় রাস্তায় নীল রঙের গাড়ি দেখে রাসেলকে বলে, দ্যাখ কী সুন্দর গাড়ি! রাসেল ফিরে তাকায়। বলে 'গাড়িটা সুন্দর, আমার পছন্দ লাল গাড়ি। এবার হাসু আপাকে বলব দুইটা গাড়ি কিনে দিতে। একটা লাল আর একটা নীল। নীল গাড়িটা তোকে দেব।'

হাসু আপা রাসেলের সবচেয়ে প্রিয়।

সব আবদার তার কাছে। ওই দিনের পর থেকে নীল রঙের গাড়ি দেখলে রাসেলের কথাগুলো মনের ভেতর ধাক্কা মারে। সুমন ভাবে, এখনই নীল গাড়ি থেকে রাসেল নেমে এসে বলবে, 'সুমন এইটা তোর গাড়ি। হাসু আপা কিনে দিয়েছে।'

আচ্ছা রাসেল বেঁচে থাকলে কি সে তার বাবার মতো পরিপাটি গোঁফ রাখত? নাকি বড় ভাই কামালের মতো পাকানো গোঁফ রাখত?

এসব কল্পনা সিগারেটের নেশা বাড়ায়।

পকেটে টাকা নেই আবার লেকের পাড়ে পরিচিত কাউকে দেখা যাচ্ছে না, যাকে বলবে, সিগারেট খাওয়া। খানিকটা পথ হেঁটে কলাবাগান বাসস্ট্যান্ডের পাশে একটা ঢোপ দোকানের সামনে দাঁড়ায়। পাঁচটা ব্যানসন সিগারেট নেয় বাকিতে। দোকানি জানায়, মামা হাজার টাকা পার হলো।

সুমন বলে, এই তো আর কয়েক দিন, বেতন পেলে দিয়ে দেব।

১৯৭৫ সালে সুমনরা থাকত কলাবাগানের এক বাসায়। বাবা চাকরি করতেন খামারবাড়িতে। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদফতরে মাঝারি গোছের চাকরি। মধ্যবিত্তের সংসার। কয়েক বছর আগে বাবা পেনশনে যাওয়ার পর ঢাকা ছেড়ে চলে যান নাটোরের আনন্দপুরে।

ছোট দুই বোনের বিয়ে হয়েছে। তারা থাকে ঢাকার মোহাম্মদপুর এলাকায়। বাসায় সুমন একা। মানে একজনের সংসার। গ্রিন রোডে সাতশ বর্গফুটের বাসায় বিশেষ কোনো আসবাব নেই। থাকার মধ্যে কয়েকটা বুকশেলফ। শেলফ ছাড়াও সারা বাসায় ছড়ানো-ছিটানো বই আর বই।

বাসাটা অতিসাধারণ। একটাই সুবিধা, বারান্দা থেকে আকাশ দেখা যায়। মাঝেমধ্যে বারান্দায় মাদুর পেতে ঘুমায়। শহরটা মান্ধাতার আমলে পড়ে আছে বলে এখনো ঘুড়ি উড়তে দেখা যায়। একটা ঘুড়ি মাতালের মতো টাল খেতে খেতে ঘুমন্ত সুমনের নাকের ওপর এসে পড়েছিল বছর দুই আগে। ঘুড়িটার গায়ে আড়াআড়ি সবুজ আর গোলাপি রং। লেজটা খবরের কাগজের। শোবার ঘরের দেয়ালে ঘুড়িটাকে টাঙিয়ে রাখে। পুরো বাসার মধ্যে এটাই একমাত্র রং।

জামাকাপড় বেশি নেই। ফুটপাত থেকে কেনা জিনসের প্যান্ট আর গোটা তিনেক পোলো শার্ট। বাসায় দুটো চেয়ার। আগের দিনের একটা আলমারি, বয়সের ভারে অদ্ভুত রকমের খয়েরি রঙের হয়ে গেছে। কলাবাগানের বাসায় থাকার সময় পাশের বাড়িতে থাকতেন হোসনে আরা। সুমন ডাকত 'আরা বুবু'।

পাঁচ ফুট ছয় ইঞ্চি লম্বা। টিকালো নাক। হাসলে মিষ্টি লাগে। পাকা গমক্ষেতের মতো গায়ের রং। বলবান স্বাস্থ্য। ভালোবেসে বিয়ে করেছিলেন ১৯৬৯ সালের মে মাসে। তাদের সুখ টিকে থাকতে দেয়নি পাকিস্তানি সেনারা। ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চের রাত থেকে হোসনে আরার স্বামী জাফরকে পাওয়া যায়নি।

বাসে রংপুর থেকে ঢাকায় আসছিল। পরে জানা যায়, গাবতলী বাসস্ট্যান্ডে জাফরকে গুলি করে হত্যা করে পাকিস্তানি সেনারা। এ দিনের পর থেকে হোসনে আরার জীবন হাড় মচকানো কষ্টের। ২৮ মার্চ বিকেলে হোসনে আরাকে পাকিস্তানি আর্মিরা তুলে নিয়ে যায়। আটকে রাখে ক্যান্টনমেন্টে। মুক্তিযুদ্ধের পুরো সময়টা চলে পিশাচের নির্যাতন। তার মতো ক্যান্টনমেন্টে অনেক নারীকে আটকে রাখা হয়েছিল। মানুষ খুনের ক্লান্তি জুড়াতে পাকিস্তানি আর্মিরা তাদের ধর্ষণ করত। ঠোঁট, গাল, স্তন কামড়ে আনন্দ করত।

১৬ ডিসেম্বর, বিজয়ের দিনে। মুক্তিযোদ্ধারা কয়েক শ নারীকে উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করে দেয়। হোসনে আরার বাঁচতে ইচ্ছা করে না। মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলে। আড়াই মাস চিকিৎসার পর কিছুটা স্বাভাবিক হয়।

নির্যাতনের শিকার সবাইকে বাঁচানো যায় না। কয়েকজন আত্মহত্যা করে। হোসনে আরাও আত্মহত্যার চেষ্টা করেছিল। এক রাতে ফ্যানে শাড়ি বাঁধে। বারান্দা থেকে তা দেখতে পায় একজন নার্স।

এই হাসপাতালের চিকিৎসক মিজানুর। এমবিবিএস পাস করেছে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ থেকে। মুক্তিযুদ্ধের সময় শরণার্থী শিবিরে যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধাদের চিকিৎসা করতেন। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর নির্যাতিত নারীদের বাঁচানোর কাজ শুরু করেন। মেডিক্যাল কলেজে পড়ার সময় ছাত্ররাজনীতির সঙ্গে যুক্ত থাকার সুবাদে ব্যক্তিগত পরিচয় ছিল বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে। ১৯৭২ সালের ১০ জানুয়ারি দেশে ফেরার পর প্রতিদিন রাতে ফোন করে খবর নিতেন। রাত দশটার পর মিজানুর শুনতে পান ভরাট গলার উচ্চারণ, মায়েরা কেমন আছে মিজানুর? অসুবিধা হচ্ছে না তো?

মিজানুর দুই-এক কথায় উত্তর দেন।

বঙ্গবন্ধুর কথা শোনার পর চোখ ভিজে যায় মিজানুরের। ধর্ষণের শিকার হওয়া মেয়েদের বাবারা এখন পরিচয় দিচ্ছে না। স্বামীরা গ্রহণ করতে চাইছে না। প্রেমিক ভুলে গেছে প্রেমিকার পরিচয়। সবার কাছে অচ্ছুৎ হয়ে যাওয়া নারীদের 'মা' বলে সম্মান জানানোর ক্ষমতা বঙ্গবন্ধু ছাড়া আর কারো নেই। তা-ই নয়, হাসপাতালের রেকর্ড খাতায় এসব নারীর সন্তানদের বাবার পরিচয় কী লেখা হবে? এই নিয়ে সংকট তৈরি হয়। এ কথা বঙ্গবন্ধুর কানে যায়। তিনি বলে দেন, 'বাপের নামের জায়গায় লিখে দে শেখ মুজিবুর রহমান।'

গত রাতে ফোনে কথা বলার সময় মিজানুর জানান, হোসনে আরা নামের একজন আত্মহত্যার চেষ্টা করেছিল। সে খুব মানসিক যন্ত্রণার ভেতর আছে।

মাঝেমধ্যে অস্বাভাবিক আচরণ করছে। কী যে করি? ফোনের ওপার থেকে শুনতে পায়, কাল সন্ধ্যার পর নিয়ে আয়, আমি বাসায় থাকব।

পরদিন সন্ধ্যায় হোসনে আরাকে নিয়ে মিজানুর রওনা দেয় ধানমন্ডি। রিকশায় বসে আছেন হোসনে আরা, কোনো কথা বলছেন না। পাথর হয়ে যাওয়া মানুষ। পরনে লতাপাতা প্রিন্টের শাড়ি।

বঙ্গবন্ধুর বাড়িতে মানুষ আর মানুষ। এই বাড়ি সব সময় গমগম করে। হোসনে আরাকে নিয়ে মিজানুর ভেতরের ঘরে যায়।

এই ঘরে বঙ্গবন্ধু ফোনে কথা বলছেন। ফোন ছেড়ে চেয়ার থেকে উঠে 'মা' বলে হোসনে আরাকে বুকে জড়িয়ে ধরে বললেন, তুই তো আমার মা। মা চলে গেলে ছেলের কী হবে?

এ কথা শুনে হাউমাউ করে কেঁদে ওঠেন হোসনে আরা। এত দিন চেষ্টা করেও কাঁদতে পারেনি। কষ্টের তাপে চোখের পানি শুকিয়ে যায়।

একটু পাশে বসবি?

লজ্জা পায় হোসনে আরা। বঙ্গবন্ধুর পাশের চেয়ারে বসলেন। সামনের চেয়ারে মিজানুর। টেবিলের ওপর রাখা বিস্কুট আর বেশ কিছু আপেল টুকরো। এক টুকরো আপেল হোসনে আরার মুখে তুলে দিলেন বঙ্গবন্ধু। বললেন, খা মা। শুনে বাবার কথা মনে পড়ল, তিনি এমন করে খাওয়াতেন। আপেল টুকরো মুখে নিয়ে চিবুতে ভুলে যান। বঙ্গবন্ধুর মুখের দিকে তাকিয়ে আছেন। চোখের পানি থামতে চাচ্ছে না। বঙ্গবন্ধু বারবার রুমালে চোখ মুছছেন। মিজানুরের চোখেও পানি। চোখ মুছতে মুছতে বললেন, তোর এই বুড়ো ছেলেটাকে খাওয়াবি না?

এক টুকরো আপেল মুখে তুলে দেন হোসনে আরা। বঙ্গবন্ধুর আদরে মনের সব কষ্ট এক মুহূর্তে বাতাসে উড়ে যায়। নতুন করে বাঁচতে ইচ্ছা করে।

এদিনের পর অনেকবার বঙ্গবন্ধুর বাড়িতে এসেছেন, আসার সময় আপেল নিয়ে আসতেন। প্রতিবারই বঙ্গবন্ধু বলতেন, তোর আনা আপেল ছাড়া স্বাদ পাই না। শুনে মন ভরে যেত হোসনে আরার। পরে আর বিয়ে করেননি। বঙ্গবন্ধু একটা চাকরির ব্যবস্থা করে দেন সাধারণ বিমা অফিসে।

অফিস থেকে বাসায় ফিরে বই পড়া আর পাশের বাসার সুমনকে ডেকে গল্প করা প্রতিদিনের কাজ। শুধু গল্পই না, সুমনকে পড়াতেন। হোসনে আরার মা, বাবা একাত্তরে শহিদ। তিন কুলে কেউ নেই। বাবার মুখে শুনেছেন, গ্রামের বাড়ি বরিশালের স্বরূপকাঠি। কোনোদিন সেখানে যাওয়া হয়নি।

সুমনকে ছেলের মতো আদর করেন। বিকেলে অফিস থেকে ফিরে রান্না করার সময় প্রতিদিন সুমন এসে হাজির হয়। এসেই বলে, বুবু তোমার রান্নার গন্ধ দূর

থেকে টের পাই। হোসনে আরা বলতেন, ঘুমের মধ্যেও তো আমার রান্নার গন্ধ তোর নাকে যায়।

মাঝেমধ্যে রান্না সেরে সন্ধ্যায় ছাদে বসে গল্প করেন। ছাদে এলেই সুমন ভূতের গল্প শুনতে চায়। ঘ্যাঁঘো ভূত সুমনের সবচেয়ে প্রিয়। এই ভূতের মাথায় 'পোকা' হয়েছিল। কিছুতেই সেই পোকা যাচ্ছিল না। পোকার জ্বালায় অতিষ্ঠ ঘ্যাঁঘো একদিন কুয়োর ভেতর আশ্রয় নেয়। অনেকদিন পর এক তাঁতির গানের নামে বিকট চিৎকারে বিরক্ত হয়ে কুয়ো থেকে বেরিয়ে আসে। সাহিত্যিক ত্রৈলক্যনাথের অমর সৃষ্টি ঘ্যাঁঘো ভূত।

এই বাড়ির ছাদ থেকে ধানমন্ডি ৩২ নম্বর বাড়ি দেখা যায়। ছাদে ওঠার পর সুমন হোসনে আরাকে বারবার বলত, দ্যাখো-দ্যাখো, ওইটা রাসেলদের বাড়ি। শুনে না-জানার ভঙ্গিতে যতবারই বলতেন, তাই? জানি না তো! ততবারই সুমন বোঝানোর চেষ্টা করত, সে ঠিক কথাই বলেছে। রাসেল আর সুমন একই ক্লাসের ছাত্র। সুমনের কাছে গল্প শুনে রাসেলেরও প্রিয় হয়ে উঠেছিল ঘ্যাঁঘো ভূত।

গত কয়েক দিন থেকে হোসনে আরা বুবু এবং রাসেলের কথা মনে পড়ছে সুমনের।

স্মৃতিগুলো তাকে বড়ই জ্বালাচ্ছে। মাঝেমধ্যেই এ রকম হয়। তখন কোনো কাজ করতে ইচ্ছা করে না। ভাবনাগুলো থেকে সে বেরিয়ে আসতে চায়, জোরে ধাক্কা মারে। ভাবনাগুলো ছেড়ে যায় না বরং আরো শক্ত করে কামড়ে ধরে।

আজ সন্ধ্যায় ধানমন্ডি লেকের পাড় থেকে বড় বড় ধাপ ফেলে বাসায় চলে আসে। ভেজা কাপড় বদল করে বিছানায় শুয়ে পড়ে।

সাদাকালো টিভিটা ছাড়তে ইচ্ছা করল না। বিটিভি ছাড়া কিছু আসে না। কেবল-ফেবল নেয়নি। ওসবের নেশা নেই। মাঝে মাঝে অন করে। ঠিকমতো চলে না। ছবিটা আবার কাঁপছে। কিছুক্ষণ পর গরম হলে আবার ঠিক হয়ে যায়। অনেক বছর ধরে টিভিটা চলছে। কয়েক দিন আগে ছোট বোন বেড়াতে এসে বলে, বড় ভাই এই মালটা এবার পাল্টাও। এটা তো রেডিও হয়ে গেছে। কিস্তিতে এখন টিভি পাওয়া যায়, নিয়ে নাও।

সন্ধ্যায় শুয়ে থাকতে ভালো লাগছে না। বৃষ্টিতে ভিজে গায়ের তাপ বেড়েছে। মাথায় যন্ত্রণা করছে। মন ভাবতে পারছে না। মন আর কিছু নিতে পারছে না। আমার কি মাথার অসুখ হলো? আচ্ছা ঘুমটা কী? কীভাবে ঘুমাতে হয়? আবার ভাবে কী দরকার এই সব প্রশ্নের?

এদিকে পেটে টনটনে ক্ষুধা। গ্যাসের চুলার ওপর ভাঁজপড়া হাঁড়ি বসায়। এক মুঠো চালের ভেতরে দুটো লাল আলু ছেড়ে দিল। ভর্তা আর ডিম ভাজা হলে আর কিছু দরকার হয় না। আজ ডিম ভাজা খাওয়া হবে না। বাসায় একটাই ডিম ছিল, সেটা পচা বেরিয়েছে।

এবার, ফিরে যাই ১৯৭১ সালের আগস্ট মাসে।

কলকাতা গ্র্যান্ড হোটেলের বারে আড্ডা জমে উঠেছে। টেবিলে বিদেশি হুইস্কির বোতল। সামনের প্লেটে চিকেন ফ্রাই আর একটা টিনের পাত্রে বরফ-টুকরো। কাচের গ্লাসে টলমল করছে হালকা সোনালি রঙের হুইস্কি। ওপরে ভাসছে বরফ-টুকরো। সাংবাদিক জ্যোতি সেনগুপ্ত বন্ধুদের সঙ্গে বসে পান করছেন। উজ্জ্বল আলোতে লনের টবে রাখা গাছগুলোর পাতা দুলছে।

জ্যোতির চোখ গেল দরজার ওপারে।

ছোটখাটো একজন মানুষ হেঁটে যাচ্ছেন, সঙ্গে কয়েকজন সাদা চামড়ার লোক। ছোট আকারের লোকটাকে পরিচিত মনে হলো। তবে বুঝে উঠতে পারলেন না, কে তিনি? চেয়ার ছেড়ে দাঁড়ালেন। বাইরে উঁকি মারলেন। এবার তো চোখ ছানাবড়া। লোকটা খন্দকার মোশতাক আহমদ।

বার থেকে বেরিয়ে দ্রুত পা ফেলে লবিতে এগিয়ে গেলেন জ্যোতি সেনগুপ্ত। সামনে গিয়ে বললেন, নমস্কার। নমস্কারের উত্তর দিলেন কি না বোঝা গেল না। বিরক্তি ফুটে উঠল চেহারায়। মোশতাকের সঙ্গে থাকা একজনকে চিনলেন জ্যোতি। তিনি কলকাতার মার্কিন কনসাল জেনারেল গর্ডন। সঙ্গে আরো তিনজন। তারা সবাই একটা বড় রুমে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিলেন।

পরদিন সকালে রাজ্য সরকারের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে রাতের ঘটনা লিখে জানালেন জ্যোতি সেনগুপ্ত। ইঙ্গিত করলেন, গ্র্যান্ড হোটেলে রাতে দেখা লোকগুলো সম্ভবত কোনো গোপন ষড়যন্ত্রে লিপ্ত। বিষয়টি ভাবনা বাড়াচ্ছে। তাই লোকগুলোর পরিচয় জানা দরকার।

দুই দিনের মাথায় দুই লাইনে চিঠির জবাব এল, 'এ বিষয়ে আপনাকে কোনো তথ্য দেয়া যাবে না। বিষয়টি অত্যন্ত গোপনীয়।'

এখন অনেক কিছুই চলছে গোপনে। সবচেয়ে গোপনে চলছে পাকিস্তানের কারাগারে বঙ্গবন্ধুকে ফাঁসিতে ঝোলানোর আয়োজন। নিজ বাড়ি থেকে বঙ্গবন্ধুকে আটক করা হয় ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চে।

এদিন সকালে আড়মোড়া ভেঙে জেগে উঠল দেশ। সবার মনে একই জিজ্ঞাসা, আজ কী ঘটবে? নতুন খবর কী? সন্ধ্যার মধ্যে বঙ্গবন্ধু খবর পেলেন, পাকিস্তানি সেনারা রাতে আক্রমণ করবে। দেশের মানুষদের সতর্ক থাকতে বললেন। তিনি জানতেন, যে-কোনো মুহূর্তে তাঁকে বন্দি করা হবে। তাই সবখানে প্রয়োজনীয় নির্দেশ পাঠালেন।

রাত দশটার পর খবর এল, ইয়াহিয়ার সেনারা বাংলার মানুষের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে। এবার তারা বাঙালিদের টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলবে। শিরদাঁড়া ভেঙে ফেলবে।

গণহত্যার নির্দেশ দিয়ে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া গোপনে ঢাকা ছাড়লেন। এই খবর কেউ জানল না। রাতের অপেক্ষা করতে থাকে পাকিস্তানি সেনারা। রাত দশটার পর শুরু হয় নির্মম গণহত্যা। ইতিহাসে এই দিনটি ২৫ মার্চের কালরাত হিসেবে পরিচিত। রাত একটার পর পাকিস্তানি কমান্ডো দল বঙ্গবন্ধুর বাড়িতে হানা দেয়। এদের সাথে দুটি মিলিটারি জিপ, একটি সাঁজোয়া গাড়ি এবং ছয় ট্রাক বোঝাই সেনা।

তাদের হাতে লাইট মেশিনগান, ব্রেনগান, স্টেনগান আর থ্রি-নট থ্রি রাইফেল। বাড়ির সামনে এসেই গুলি ছুড়তে লাগল। সাথে মারল চারটা মর্টার। রাইফেলের গুলি এসে লাগে দেয়ালে, জানালার কাচে, কার্নিশে, ছাদে এবং বাড়ির পাশে দাঁড়ানো গাছে।

জানালার ফাঁক দিয়ে গুলি এসে লাগল দোতলার পশ্চিম দিকের ঘরে। দেয়ালে ঝুলে থাকা রবিঠাকুরের বাঁধানো ছবি টুকরো টুকরো হয়ে পড়ে গেল।

অক্ষত থাকল না বাড়ির গেট। দলের নেতাকর্মীরা গেটের ওপর ছয় দফার স্মারক হিসেবে ছয় তারকাযুক্ত একটি পিতলের প্লেট লাগিয়ে দিয়েছিল, সেটিও গুলিবিদ্ধ। রাইফেলের গুলিতে জানালার কাচ ভেঙে ছিটকে পড়ে। কাচের একটা টুকরো লাগে রাসেলের হাতে। গলগল করে রক্ত ঝরছে। অ্যান্টিসেপটিক লাগিয়ে ব্যান্ডেজ করে দিলেন বঙ্গবন্ধু।

স্ত্রী এবং ছোট ছেলেকে বাথরুমে ঢুকিয়ে দিয়ে দোতলার ব্যালকনিতে এসে বললেন, কী চাও তোমরা? এসবের কী দরকার ছিল? লেফটেন্যান্ট কর্নেল জেড এ খান চিৎকার করে বললেন, আমরা অর্ডার পালন করছি।

বঙ্গবন্ধু আলমারি থেকে ধবধবে সাদা পাজামা-পাঞ্জাবি বের করে পরলেন। ঘরের এক কোনায় দেয়াল ঘেঁষে স্ত্রী ফজিলাতুন্নেছা দাঁড়িয়ে আছেন। রাসেল তার মায়ের কোলে। লুঙ্গি, গামছা, টুথব্রাশ আর একটা গীতাঞ্জলি স্যুটকেসে আগে থেকেই ভরে রাখা ছিল। অনেকদিনের সঙ্গী একটা পাইপ হাতে নেন। ভুলে

গেলেন এরিনমোর তামাকের কৌটো নিতে। ফজিলাতুন্নেছা কোনো কথা বলছেন না। তিনি ভয়ে জড়োসড়ো।

স্ত্রীর কপালে আর রাসেলের গালে চুমু দিলেন। এ সময় ছেলের চোখে দেখলেন বাবার প্রতি মুগ্ধতার প্রতিচ্ছবি। রাসেলের মাথায় হাত রেখে বললেন, আব্বা আমি যাই। এই মুহূর্ত থেকে শিশু রাসেলের অটুট বিশ্বাস তার আব্বাজান একদিন অবশ্যই ফিরে আসবেন। তবে সে জানে না, তিনি এখন কোথায় আছেন?

রাসেলের আব্বা এখন পাকিস্তানের লয়ালপুর কারাগারে।

যে-কোনো মুহূর্তে তাঁর ফাঁসি।

এই কারাগারের বর্তমান নাম ফয়সালাবাদ সেন্ট্রাল জেল। ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনের নেতা ভগৎ সিংকে এখানে আটক রাখা হয়েছিল। এই জেলে বঙ্গবন্ধুর থাকার জায়গা, দশ ফুট বাই বারো ফুট আকারের একটা ঘর। এতে এতই অন্ধকার যে এখন দিন না রাত, তা বোঝা যায় না। ঘরে কোনো জানালা নেই। একজনের শোবার মতো একটা কাঠের চৌকি। অবশ্য চৌকি না বলে বড় আকারের সিট-বেঞ্চ বলাই ভালো।

গরান কাঠের দরজার তলায় ছয় ইঞ্চির মতো কেটে রাখা। কারারক্ষীরা দরজার তলার ফাঁকা জায়গা দিয়ে খাবারের থালা আর টিনের গ্লাসে পানি দিয়ে উধাও হয়ে যায়। তারা কেউ কথা বলে না। ঘরের সঙ্গে টয়লেটে হলুদ হয়ে যাওয়া প্যান। দিনে দুইবার পানি আসে। তখন বালতি ভরে রাখতে হয়। বাথরুমে একটা মরচে পড়া টিনের বালতি আর একটা টিনের বদনা।

জেলের নথিতে কয়েদির ঠিকানার জায়গায় লেখা আছে পূর্ব পাকিস্তান। জমা রাখা টাকা-পয়সার বিবরণী লেখার ঘরের পাশে লাল কালি দিয়ে ক্রস করে কাটা। বয়স পঞ্চাশ। উচ্চতা পাঁচ ফুট দশ ইঞ্চি। সেলের পাশে একটা বয়স্ক পারিজাত ফুলের গাছ। এ দেশে শিউলিকে বলে পারিজাত।

লয়ালপুর কারাগারে ফাঁসির মঞ্চটা ভালো না, অনেকদিনের পুরোনো। তাই নতুন মঞ্চে তুলতে চান প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান। মিয়ানওয়ালি কারাগারে কিছুদিন আগে ফাঁসির মঞ্চ তৈরি করা হয়েছে। এখানে আছে পাঁচ জন জল্লাদ। এরা সবাই পাঞ্জাবের ভয়ংকর অপরাধী।

পাকিস্তানি কমান্ডো দল ২৬ মার্চ ঢাকা থেকে বঙ্গবন্ধুকে আটক করে তিন দিন পর পাকিস্তানে নিয়ে আসে। প্রথমে রাখা হয়েছিল মিয়ানওয়ালি কারাগারে। এখানে আড়াই মাস রাখার পর নিয়ে আসা হয় লয়ালপুর কারাগারে। আজ আবার মিয়ানওয়ালিতে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে।

জেল সুপার তিন ট্রাক পুলিশ পাহারায় নিয়ে চলেছেন।

প্রথমে একটা ট্রাক। এরপর দুটো জিপ। পেছনে অন্য দুটি ট্রাক। জিপের একটায় বসে আছেন জেল সুপার। অন্যটায় ড্রাইভারের পাশের সিটে বঙ্গবন্ধু। পেছনের সিটে চারজন পুলিশ। সবার হাতে লোড করা রাইফেল। গাড়িবহর ছুটে চলেছে মিয়ানওয়ালির উদ্দেশে।

কিছুদূর এসে চোখে পড়ল অনেকগুলো বকপাখি উড়ে বেড়াচ্ছে। মনে পড়ল শৈশবের কথা। টুঙ্গিপাড়া গ্রামে একসময় অনেক পাখি ছিল। স্কুলে পড়ার সময় পাখি পুষতেন। কলেজে পড়ার সময় মনে হয় পাখিদের খাঁচায় পাখি আটকে রাখা ভালো কাজ না, ওরা কষ্ট পায়। তখন বাড়িতে থাকা সব পাখি ছেড়ে দিয়েছিলেন।

আচ্ছা বাড়িতে কি বকপাখি ছিল?

না, বক ছিল না।

টিয়া আর ঘুঘু ছিল।

কেমন আছে ওই পাখিগুলো?

পাখিরা এত দিন বাঁচে না, তাহলে?

বংশধররা নিশ্চয়ই আছে।

এসব এলোমেলো ভাবনা মাথার ভেতর দৌড়াচ্ছে। এমন সময় চোখে পড়ল ছোট-বড় অসংখ্য পাহাড়। আচ্ছা একসময় তো পাহাড় নিয়ে লেখা অনেক গল্প পড়েছি। সেগুলো বেশ মজার ছিল, রাসেলকে একটা গল্পটা বলেছিলাম। সম্ভবত সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকে ছাপা বইয়ে পড়েছি।

গাঁয়ের পাশে দাঁড়ানো একটা পাহাড়ে যান একজন বুড়ো মানুষ। বরফ জমা পথ পাড়ি দিয়ে অনেক কষ্টে তিনি পাহাড়ে ওঠেন। সবচেয়ে উঁচুতে একটি পাথরের বাজপাখি বসিয়ে দেন। ওই দিন থেকে গ্রামবাসীরা বিশ্বাস করে, বাজপাখিটা ডানা মেলে তাদের পাহারা দেয়। বিপদ-আপদে রক্ষা করে।

এই বাজপাখি তাদের দেবতা। কারণ, এই পাখি নিজের জীবন দিয়ে তাদের জন্য একদিন আগুন এনেছিল। পাহাড়ের উপরে দাঁড়ানো একটা বড় গাছের মগডালে বসে থাকত ছানাদের নিয়ে।

একবার বরফে ঢাকা পড়েছিল সারা গ্রাম। গ্রামবাসীদের বাঁচার কোনো আশা ছিল না। বেঁচে থাকার জন্য দরকার হলো আগুন। তাদের কাছে আগুন ছিল না। ওই বুড়ো মানুষ বাজপাখিকে অনুরোধ করলেন, আমাদের আগুন এনে দাও।

বাজপাখি কথা রাখল, সে আগুন এনে দিয়েছিল।

ঝলসে যাচ্ছিল, পুড়ে যাচ্ছিল তবু এনেছিল। ঠোঁটে ধরে পাহাড় থেকে আগুন নিয়ে নেমে আসে উপত্যকায়। সেই থেকে বাজপাখিটার সম্মান পাহাড়ের মতো উঁচু।

গাড়ির ব্রেক কষার শব্দে এসব কল্পনার ছেদ ঘটে। বন্ধ চোখ মেলে দেখলেন পাহাড়-ঘেরা কারাগার। লাল রঙের উঁচু দেয়াল। প্রবেশপথের ওপরে উর্দু ও ইংরেজিতে লেখা মিয়ানওয়ালি সেন্ট্রাল জেল। জিপ থেকে নেমে এগিয়ে গেলেন কারাগারের সামনে। মূল গেট পার হওয়ার পর কয়েকজন কয়েদি আক্রমণ করে। বঙ্গবন্ধু মাটিতে পড়ে যান। ঠোঁট কেটে রক্ত ঝরছে।

এমন সময় একজনের মায়া হলো। তিনি এই কারাগারের উপপ্রধান। কোমরে ঝোলানো চামড়ার খাপ থেকে পিস্তল বের করে তিনটা ফাঁকা গুলি ছোড়েন। শব্দে কয়েদিরা সরে যায়। বঙ্গবন্ধু উঠে বসেন। রক্তে পাঞ্জাবির বুকের অংশ ভিজে যায়। পতাকার মাঝের লাল রঙের মতো।

কারা উপপ্রধান বললেন, আসুন আমার সঙ্গে।

কারাগারের অফিস-ঘরে বসানো হলো। চেয়ারে বসে থাকার শক্তি নেই। অফিস ঘরের পাশে কারা-চিকিৎসকের চেম্বার। অসুস্থ কয়েদিদের প্রাথমিক চিকিৎসা দেয়ার স্থান। এখানে উঁচু টেবিলের ওপর বিছানার মতো করা, সাদা চাদর বিছানো। এটার ওপর শোবার কথা বললেন উপপ্রধান। কিছুক্ষণ পর একজন চিকিৎসক এলেন। অ্যান্টিসেপটিক লাগিয়ে দিলেন, সঙ্গে ব্যথানাশক ইনজেকশন।

কারাগারের ছয় জন ভয়ংকর কয়েদিকে আক্রমণের নির্দেশ দিয়ে কারাপ্রধান সটকে পড়েছেন। তাদেরকে বলা হয়, মুজিবকে খুন করতে পারলে তোমাদের সাজা কমানো হবে, সাথে যথেষ্ট টাকা-পয়সাও পাবে। ওপরের নির্দেশে কারাপ্রধান এই খুনের আয়োজন করে। ইয়াহিয়া খানকে এই বুদ্ধিটা দিয়েছিল গোয়েন্দা সংস্থা আইএসআই।

ব্যথায় গায়ের তাপ বাড়ল।

রাত সাড়ে তিনটার দিকে বঙ্গবন্ধুকে নিজের বাংলোতে নিয়ে আসেন কারা উপপ্রধান। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের প্রতি তার সমর্থন ছিল। আগে থেকেই বঙ্গবন্ধুকে জানতেন, শ্রদ্ধা করতেন। নিজের বিপদ হতে পারে ভেবেও নিজ বাংলোতে নিয়ে এলেন।

দুজন ভৃত্য ছাড়া তার বাংলোতে আর কেউ থাকে না। বিয়ে করেননি, বয়স পঁয়তাল্লিশের একটু বেশিই হবে। ভৃত্যদের ডেকে বললেন, গ্রামের বাড়ি থেকে আমার চাচাজান বেড়াতে এসেছেন। তিনি অসুস্থ। তোমরা ওনার সেবা করবে, কোনো রকম অসুবিধা যেন না হয়।

ভৃত্যরা সেবা করতে শুরু করে। সকালে আলো ফোটার আগে পানি গরম করে দেয়। গোসল করে একটু আরাম পেলেন। এরপর এল বাসমতি চালের ভাত।

সাথে শিং মাছ আর ছোট মুরগির ঝোল। বেলা এগারোটার সময় দেয়া হলো গরম দুধ আর দুটো সেদ্ধ ডিম। সঙ্গে তিন রকম ফল। বেদানা, আঙুর আর কলা।

গোপনে দুই দিন নিজের বাংলোতে রেখে বঙ্গবন্ধুর সেবা করলেন কারা উপপ্রধান। এদিকে কারাপ্রধানের ছুটি শেষ হয়ে যায়। তিনি করাচি থেকে মিয়ানওয়ালিতে আসার আগে বঙ্গবন্ধুকে জেলের ভেতরে নিয়ে আসা হলো। এর দুই দিন পর সেলের ভেতর থেকে কোদাল শাবলের শব্দ শুনতে পেলেন।

এখানকার মাটি অনেক শক্ত। লাল রঙের এঁটেল মাটি। ছয় জন জোয়ান কয়েদির দুই দিন সময় লাগল কবর খুঁড়তে। তিন দিন পর একজন চিকিৎসক এলেন। তিনি আসার পর দরজা খোলা হয়। তখন সামনের বারান্দায় পাতা চেয়ারে বসতে পারেন। সেল থেকে বেরিয়ে চোখে পড়ল কবরের মতো একটা গর্ত। রাতে বৃষ্টি হয়েছে। গর্তের অর্ধেক পানিতে টলমল করছে। এতে ভেসে বেড়াচ্ছে পারিজাত ফুলের কয়েকটা মরা পাতা। বারান্দায় দাঁড়ানো একজন কারারক্ষীকে বঙ্গবন্ধু জিজ্ঞেস করলেন, গর্তটা কীসের?

এটা আপনার কবর।

আমার কবর?

আর কোনো কথা না বলে চলে যায় কারারক্ষী। চিকিৎসকও নিশ্চুপ। কারাগারে কেউ যেন কথা না বলে, এমন নির্দেশ ছিল সরকারের। বিপি চেক করে যাওয়ার সময় কারা চিকিৎসক বললেন, ওষুধটা নিয়মিত খাবেন।

এদিকে ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থার কাউবয়রা সজাগ।

সারা দুনিয়ার গণমাধ্যমে হইচই। বঙ্গবন্ধুকে বাঁচানোর দাবি উঠছে দুনিয়ার নানা প্রান্ত থেকে। তেহরানের সংবাদপত্র 'কেহান ইন্টারন্যাশনালের' সাংবাদিককে ইয়াহিয়া জানিয়েছেন, অক্টোবরের জাতীয় পরিষদের বৈঠক পর্যন্ত মুজিব বেঁচে থাকবেন কি না তা বলা শক্ত। বঙ্গবন্ধুর নিরাপত্তা নিয়ে সারা বিশ্বের অনেকেই এখন চিন্তিত। ব্রিটিশ পার্লামেন্টে দেড় শ সদস্য মুক্তির জন্য আবেদন জানালেন। কোনো জবাব দিলেন না ইয়াহিয়া।

মিয়ানওয়ালি কারাগারে আসার আগে বিচারকাজ চলেছে লয়ালপুরে। কারাগারের উঁচু দেয়াল ঘেঁষা একটা পুরোনো বাড়ি। বাইরে হলদে রং। ভেতরে চুন দেয়া সাদা বাড়িতে বিশেষ ট্রাইব্যুনাল বসেছে। বঙ্গবন্ধুর বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহের অভিযোগ। সকাল দশটা থেকে বিকেল চারটা পর্যন্ত চলে শুনানি।

শুনানির সময় বঙ্গবন্ধু নিশ্চুপ থাকেন। খুব দরকার না হলে কোনো কথা বলেন না। কয়েক দিন শুনানি চলার পর আদালতের বিবরণী দেখার জন্য দেয়া হলো।

বিবরণী বই হাতে নিয়ে মলাটের ওপর বল পয়েন্ট কলম দিয়ে লিখলেন, 'সব মিথ্যা'। এর কয়েক দিন পর আবার বিবরণী বই দেখতে দেয়া হয়। এবার লিখলেন, রাষ্ট্রদ্রোহ কাকে বলে?

দুই দিন বিরতির পর আবার শুরু হলো শুনানি।

নীরব ট্রাইব্যুনাল কক্ষ। দুজন বিচারক সামনে। কাঠগড়ার ভেতরে পাতা ফোল্ডিং চেয়ারে বঙ্গবন্ধু বসে আছেন। তাঁর কোনো আইনজীবী নেই।

সরকারপক্ষের একজন আইনজীবী বললেন, 'আপনি রাষ্ট্রদ্রোহী।'

না, আমি কোনো রাষ্ট্রদ্রোহ করিনি।

তাহলে?

পরাধীন দেশের স্বাধীনতা চেয়েছি।

এটাই রাষ্ট্রদোহ।

যদি তা-ই হয়, তাহলে নতুন করে রাষ্ট্রদ্রোহের সংজ্ঞা লিখতে হবে।

এবার সরকারপক্ষের আইনজীবী বিচারকের সামনে রাখা একটি টেপরেকর্ডার অন করলেন। ২৬ মার্চে দেয়া বঙ্গবন্ধুর বেতার ভাষণ বেজে উঠল। শেষ হলে বিচারক বললেন, আপনি অসহযোগ আন্দোলনের নামে রাষ্ট্রদ্রোহিতা করেছেন। উত্তেজিত বঙ্গবন্ধু বললেন, কাল থেকে আর ট্রাইব্যুনালে আসব না।

না, তা হয় না। বিচারক বললেন।

কেন হয় না?

না এলে আপনি আদালত অবজ্ঞার মামলায় পড়বেন।

বঙ্গবন্ধু বললেন, প্রহসনের এই ট্রাইব্যুনাল আমি মানি না।

বিচারক নিশ্চুপ। সারা ঘরে পিনপতন নীরবতা। সাজানো বিচারের রায় ঘোষণা নিয়ে মহাচিন্তায় ইয়াহিয়া খান।

এদিকে বিশ্বনেতৃবৃন্দ চাপ বাড়াচ্ছে। সবাই দাবি করেছেন, শেখ মুজিবের যেন কোনো রকম ক্ষতি না হয়। এই চাপ বাড়ানোর পেছনে কাজ করছেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী।

লোকসভায় তিনি বলেছেন, 'শেখ মুজিবুর রহমানের বিরুদ্ধে পাকিস্তানের সামরিক চক্র যদি কোনো রকম ব্যবস্থা নেয়, তবে তার প্রতিক্রিয়া শুধু বাংলাদেশেই হবে না। তা হবে পৃথিবীজুড়ে। সকলেই উদ্বিগ্ন। কিন্তু এই জনমতে পাকিস্তানের সামরিক চক্র টলবে না। অন্য দেশের সরকার চাপ দিলে কাজ হবে। আমরা সেই কাজ করছি।'

চাপ বাড়লে সুর বদলে যায় ইয়াহিয়ার।

৮ নভেম্বর 'নিউজউইক' ম্যাগাজিনের সাক্ষাৎকারে বললেন, 'আমাকে অনেকে বিশ্বাস নাও করতে পারে। কিন্তু আমার মনে হয়, শেখ মুজিব যদি পূর্ব পাকিস্তানে ফিরে যান, তাহলে জনগণই তাঁকে হত্যা করবে।' এসব কথা কোন অঙ্ক কষে ইয়াহিয়া বলেছিলেন? তা জানা যায় না। তবে এই কথা সত্যি হতে সময় লেগেছিল পাঁচ বছরেরও কম।

৪ ডিসেম্বর ট্রাইব্যুনাল বঙ্গবন্ধুকে দোষী সাব্যস্ত করে। রায়ে বলা হয়, 'রাষ্ট্রদ্রোহের অভিযোগ প্রমাণ হওয়ায় শেখ মুজিবুর রহমানকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করল আদালত।'

এই রায় একটুও বিচলিত করল না বঙ্গবন্ধুকে। নরম স্বরে বললেন, আমার কবরটা যেন বাংলাদেশে হয়।

এই রায়ের পর ডিসেম্বর মাসে ওপর থেকে নির্দেশ আসে। কারাগারের বাইরে মিয়ানওয়ালির শহরতলির এক বাসায় নিয়ে যেতে হবে। পুরোনো জিপে চেপে ছুটে চললেন ডেপুটি জেলার। জিপের সামনে পেছনে তিন ট্রাক পুলিশ। কিছুক্ষণ পথ চলার পর একটা নতুন বাড়ির সামনে ব্রেক করে জিপটা।

এটা ডুপ্লেক্স বাড়ি। ওপরের ঘরে থাকার জায়গা। ঘরের ভেতর গিয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকলেন বঙ্গবন্ধু। অনেকদিন পর ভালো করে আকাশ দেখলেন। আশপাশে কোনো ঘরবাড়ি চোখে পড়ল না। বাড়ির চারপাশে পাহারা দিচ্ছে অন্তত ৫০ জন পুলিশ। সবার হাতে স্বয়ংক্রিয় রাইফেল।

জানালার পাশে দাঁড়িয়ে ভাবলেন, আমার বাংলায় কী হচ্ছে এখন? ইয়াহিয়ার সেনাদের সামনে কি ছেলেরা টিকে আছে? নাকি সব শেষ?

ভাবনাগুলো মাথার ভেতর জট পাকাচ্ছে। দুই চোখ খুঁজছে পাইপ আর এরিনমোর তামাকের কৌটো। অনেকদিন এরিনমোর তামাক কৌটার সঙ্গে দেখা নেই। দুই দিন আগে ডেপুটি জেলার কয়েক প্যাকেট সিগারেট দিয়েছিলেন এখন তা-ই পুড়ছে।

এদিকে পাল্টে যায় মুক্তিযুদ্ধের চিত্র। দেশসুদ্ধ লোক খেপে উঠেছে।

পাকিস্তানি সেনাদের আর রেহাই নেই।

তড়িঘড়ি মৃত্যুদণ্ডের রায় ঘোষণা করা হয়েছিল। ফাঁসিতে ঝোলানোর সব ব্যবস্থা এখন পাকা। এসব খবর জানা ছিল ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থা র-এর। আর গোয়েন্দাদের কাছ থেকে সব জানতেন ইন্দিরা গান্ধী। তিনি উদ্বিগ্ন। মাথার দুই পাশে চিনচিনে ব্যথা করছে। এবার প্রবল চাপে ফেলতে চান ইয়াহিয়ার বাহিনীকে।

পরিকল্পনা ছিল ৪ ডিসেম্বর কলকাতায় আসবেন, হঠাৎ কর্মসূচির বদল হলো।

দিল্লি থেকে সরকারি প্রেস নোটে বলা হয়, প্রধানমন্ত্রী কলকাতায় আসবেন ৪ তারিখে নয় ৩ ডিসেম্বর। এ দিনই ফিরে যাবেন।

এদিকে ভারত-পাকিস্তান সীমান্তে উত্তেজনা চরমে। আগরতলা আক্রান্ত। কাশ্মীর সীমান্তে চলছে খণ্ডযুদ্ধ। এরকম সময়ে কলকাতার প্যারেড গ্রাউন্ডে প্রধানমন্ত্রী কী বলবেন? এসব নিয়ে বিশ্বময় জল্পনাকল্পনার শেষ নেই। জনসভায় লাখ লাখ মানুষের সামনে যুদ্ধসংক্রান্ত কিছুই বললেন না। চমকপ্রদ কোনো ঘোষণাও দিলেন না।

প্যারেড গ্রাউন্ডের বক্তৃতা শেষ করে রাজভবনে এলেন। শিল্পী, সাহিত্যিকদের সঙ্গে ঘরোয়া আড্ডা। বক্তৃতা করে ক্লান্ত ইন্দিরা ওডিকোলন দেয়া টিস্যু পেপারে মুখটা মুছে নিয়ে বললেন, 'এ রাজ্যের সাংস্কৃতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে আপনারা বলুন আমি শুনি।'

কথাবার্তা শুরু হলো।

ইন্দিরা বললেন, 'যুদ্ধ কবে হবে, নাকি আদৌ হবে না, সেটা বড় নয়। বড় কথা হলো, যুদ্ধের চাপ আমরা সহ্য করতে পারব কি না। সৈন্যরা হাতিয়ার নিয়ে যুদ্ধ করে। তবে সাধারণ নাগরিকদেরও অনেক দায়িত্ব নিতে হয়।'

একটু থেমে বললেন, 'দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে আমি কিছুদিনের জন্য লন্ডন আটকা পড়ে যাই। তখন লন্ডনে নিয়মিত বোমা পড়ছে। তবু ব্রিটিশ সরকার সমস্ত কনসার্ট হল খোলা রাখত, কারো টিকিট লাগত না। বোমা পড়ার শব্দ থামলেই লোকজন মিউজিক শুনতে ছুটে যেত। উদ্বেগ, দুশ্চিন্তার সময় গান-বাজনা শোনার উপকারিতা অনেক। আপনারা যাঁরা লেখক শিল্পী, আপনাদের দেখতে হবে যেন দেশের মানুষ যুদ্ধের উন্মাদনায় না মেতে ওঠে...

কথা শেষ হয়নি। এমন সময় হলঘরে হনহন করে লেফটেন্যান্ট জেনারেল অরোরা ঢুকে পড়লেন। পরনে সামরিক পোশাক। কাছে এসে স্যালুট দিয়ে প্রধানমন্ত্রীর হাতে দিলেন একটা চিরকুট। এটার ওপর ইন্দিরার দুই চোখ আটকে গেল। দেড় মিনিট তাকিয়ে থাকলেন।

কী লেখা ছিল ওই চিরকুটে? কেউ জানতে পারে না। চাপা পড়ে যায় চিরকুটের তথ্য। ত্রিশ বছর পর সুমন জানতে পারে 'র' কর্মকর্তার ডায়েরি থেকে। ওই চিরকুটে লেখা ছিল, কাল মুজিবুরের রায়। সম্ভবত রাতেই ফাঁসি।

কাগজটা ছিঁড়ে ফেললেন ইন্দিরা।

চেপে রাখতে চান মনের অবস্থা। নায়ক উত্তম কুমারের সঙ্গে হেসে কথা বললেন। তবে উদ্বিগ্নতা ঢেকে রাখার চেষ্টা ধরে ফেললেন কেউ কেউ। নিজেও আর পারলেন না। আচমকা উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, 'মাফ করবেন, আজ বেশিক্ষণ

কথা বলার সুযোগ নেই। জরুরি দরকারে এক্ষুনি দিল্লি ফিরতে হবে। আপনারা চা পান করুন। আমি আসছি।'

অরোরার সঙ্গে বেরিয়ে গেলেন ইন্দিরা গান্ধী।

ভারতের বিভিন্ন শহরে বোমা ফাটায় পাকিস্তান। বিকেল পাঁচটা চল্লিশ মিনিটে বোমা ফেলেছে অমৃতসরে। পাঁচটা সাতচল্লিশ মিনিটে শ্রীনগরে। ছয়টা আট মিনিটে কাশ্মীরের অবন্তিপুর।

এদিকে বাংলাদেশের নদী-খাল এখন মানুষের লাশে ভরে উঠেছে। মাছেরা ঠোকর মেরে বের করছে সাদা হাড়। আচ্ছা এই হাড়গুলো কি অ্যাসিড দিয়ে ফরসা করা হবে? পালিশ হবে? উড়ে যাবে কোনো দেশের ল্যাবরেটরিতে? তা যা-ই হোক, এই মাছগুলো একদিন চলে আসে আমাদের খাবারের টেবিলে, রসনা মেটাতে।

সন্ধ্যা সাড়ে ছয়টার বিশেষ বিমানে ইন্দিরা গান্ধী উড়ে গেলেন দিল্লি।

তাঁর সঙ্গে উড়াল দেয় বিমানবাহিনীর জঙ্গিবিমান। কারণ, গোয়েন্দা বিভাগের আশঙ্কা ছিল, আকাশপথে বিমান আক্রমণ করতে পারে পাকিস্তান। বিমানবন্দরে দুই পুত্র সঞ্জয় ও রাজীবসহ মন্ত্রিপরিষদের অনেকে অপেক্ষা করছেন।

কারো সঙ্গে কোনো কথা না বলে গাড়িতে উঠে বসলেন। গাড়ি চলল পার্লামেন্ট ভবনের দিকে। দফতরে পৌঁছে মন্ত্রিসভার জরুরি বৈঠক ডাকলেন। কিছুক্ষণের মধ্যে সবাই এসে পড়লেন। প্রতিরক্ষা বাহিনীপ্রধানদের সঙ্গে একান্তে কথা বললেন। সেনাপ্রধান মানেকশ, বিমানবাহিনীর প্রধান লাল এবং নৌপ্রধান নন্দকে নির্দেশ দিলেন, ওয়ার ইজ অন। হিট ব্যাক। হিট ব্যাক উইথ অল ইওর মাইটি।

বিশেষ বেতার ভাষণে ইন্দিরা গান্ধী জানালেন, 'পাকিস্তান আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছে। এ যুদ্ধ বাংলাদেশের। এ যুদ্ধ আমাদের। দীর্ঘকালীন কৃচ্ছ্র ও আত্মত্যাগের জন্য আমাদের সকলকে প্রস্তুত থাকতে হবে। এ ছাড়া আর কোনো বিকল্প ছিল না। বাংলাদেশের সংকট মোকাবিলায় জাতিসংঘ শতভাগ ব্যর্থ।'

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সঙ্গে ভারতকে জড়িয়ে ফেললেন ইন্দিরা।

আজ ৩ ডিসেম্বর। মধ্যরাত গড়িয়ে গেছে।

ইংরেজি ক্যালেন্ডারে ৪ তারিখের শুরু। ভারতীয় ফাইটার বিমান হামলা চালায় ঢাকা ও কুর্মিটোলা বিমানবন্দরে। পরদিন লোকসভায় ইন্দিরা বললেন, 'আমরা শান্তির পক্ষে কিন্তু আজ শান্তি বিপন্ন। শান্তি রক্ষা করতে হবে। আমরা লড়াই করছি জাতীয় ভূখণ্ডের অখণ্ডতা ও জাতীয় মর্যাদা রক্ষার জন্য। লড়াই করছি আমাদের আদর্শ ও শান্তি রক্ষার স্বার্থে।'

প্রশ্ন ওঠে, ভারতের সেনাবাহিনী যে ভূখণ্ডে দাঁড়িয়ে যুদ্ধ করছে তা পাকিস্তানের না বাংলাদেশের? তখনো আইনগতভাবে ভারত কিংবা অন্য কোনো রাষ্ট্রের স্বীকৃতি পায়নি

বাংলাদেশ। পরদিন ইন্দিরা গান্ধীর কাছে চিঠি পাঠালেন অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম এবং প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ। অনুরোধ বার্তায় বলা হয়, 'আমাদের দেশ ও সরকারকে ভারত সরকারের স্বীকৃতির জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি।'

জবাব দিলেন ইন্দিরা। জানালেন, 'ভারত সরকার গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারকে স্বীকৃতি দেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।'

ভারতীয় বোমারু বিমান তেজগাঁও এবং নির্মীয়মান কুর্মিটোলা বিমানবন্দরের রানওয়ে ধ্বংস করে দেয়। বাংলাদেশের আকাশে এখন ভারতীয় বিমানের একক আধিপত্য। পাকিস্তানি নৌবাহিনীর অবস্থা বিপন্ন। ইয়াহিয়ার সেনাদলের শিরদাঁড়া ভেঙে যায়।

মিত্রবাহিনী ছয় ডিভিশন সৈন্য জড়ো করে কৃষ্ণনগর, শিলিগুড়ি ও গুয়াহাটিতে। মুক্তিযোদ্ধাদের সঙ্গে নিয়ে প্রবেশ করে পশ্চিম, উত্তর-পশ্চিম, উত্তর, উত্তর-পূর্ব এবং পূর্ব সীমান্ত দিয়ে। ভারতীয় সৈন্যবাহিনী, বিমানবাহিনী ও মুক্তিযোদ্ধাদের আক্রমণে পালানোর রাস্তা হারিয়ে ফেলে পাকিস্তানি সেনারা।

৭ ডিসেম্বর, সন্ধ্যা গড়ানোর পর জেনারেল আমির আবদুল্লাহ নিয়াজি উদ্‌ভ্রান্তের মতো গভর্নর মালিকের বাড়িতে ঢুকলেন। বড় হলঘর। জানালা দরজায় ভারি পর্দা ঝুলছে। দেয়ালে কায়েদে আজম জিন্নাহর টুপি পরা সাদাকালো ছবি। এই ছবির পাশে জেনালের ইয়াহিয়ার রঙিন ছবি ঝোলানো।

মুখ্য সচিব মুজাফ্‌ফর হোসেন সোফায় হেলান দিয়ে বসে আছেন। তাকে চিন্তিত মনে হচ্ছে। হাত ধরে একটু ঝাঁকুনি দিলেই চোখ থেকে পানি ঝরবে। ঘরের ভেতর এসেই নিয়াজি সোফায় বসে পড়লেন। মুখ থেকে কথা বেরোচ্ছে না। মনে হচ্ছে বুকের কাছে শব্দ আটকে গেছে।

ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলেন নিয়াজি। মুখ্য সচিব এই সুযোগে নিয়াজির সঙ্গে কান্না জুড়ে নিলেন। গভর্নর এম এ মালিক কাঁদলেন না। নিয়াজির কাছে এসে ঘাড়ে হাত রেখে কান্না জড়ানো গলায় বললেন, আপনার কোনো দোষ নেই। আমাদের সেনা ও অস্ত্র কম। আপনি অনেক চেষ্টা করেছেন। সবই আমাদের কপাল।'

এমন সময় রাওয়ালপিন্ডি থেকে সংকেত বার্তা এল।

বার্তা নম্বর জি ০৯০৭।

এই বার্তায় নিয়াজিকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে 'লড়াই অব্যাহত রাখুন'। পরদিন চিফ জেনারেল স্টাফ অফিস থেকে জি ০৯১২ নম্বরের আরেকটি সংকেত বার্তা আসে। জানানো হয়, 'তৎপরতা শুরু হয়েছে'। তৎপরতা মানে পাকিস্তানের পাশে দাঁড়াচ্ছে চীন।

এদিকে থেমে নেই জেনারেল অরোরা।

সীমান্ত এলাকায় সেনাবাহিনীকে সাজিয়ে ফেললেন আক্রমণের সাজে। সংবাদ বিনিময়ের জন্য গুয়াহাটি অফিস খোলা হলো। ভারতীয় বাহিনীর সঙ্গে থাকল জেনারেল ওসমানীর নেতৃত্বে ৬০ হাজার মুক্তিসেনা। মুক্তিবাহিনীর সঙ্গে যোগাযোগের দায়িত্বে থাকলেন লেফটেন্যান্ট জেনারেল বি এন সরকার। ভারতীয় সেনাবাহিনী ও মুক্তিবাহিনী নিয়ে কমান্ড গঠিত হলো। সর্বাধিনায়কের দায়িত্বে লেফটেন্যান্ট জেনারেল জগজিৎ সিং অরোরা।

সীমান্ত এলাকায় শত শত কংক্রিটের পিল বক্স, পুরু ছাদওয়ালা ব্যাংকার, ট্যাংক প্রতিরোধকারী পরিখা খনন করা হলো। প্রতিটি জায়গায় জমা করলেন বিপুল গোলাবারুদ।

নিয়াজির পরিকল্পনা ছিল, ভারতীয় আক্রমণ ঠেকানোর সব রকম ব্যবস্থা। বাংলায় প্রবেশের সব পথ বন্ধ করে দেয়া হলো। অরোরার যুদ্ধপরিকল্পনা আঁচ করতে পারলেন না নিয়াজি।

স্থলযুদ্ধে সুবিধা করতে না পেরে আমেরিকার দেয়া স্যাবার জেট বিমান দিয়ে আক্রমণ করে নিয়াজির সেনারা। সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয় বিমান তাড়া করে। মাটিতে ভেঙে পড়ল তিনটি স্যাবার জেট।

শুরু হলো খণ্ডযুদ্ধ।

মুক্তিবাহিনী প্রচণ্ড শক্তি নিয়ে আঘাত করে।

লেজ গুটিয়ে পালানোর সময় পাকিস্তানিরা পোড়ামাটির নীতি হাতে নেয়। ঘরবাড়ি ধ্বংস করে। শত শত গ্রাম পুড়ে হয়ে গেল শ্মশান। ইয়াহিয়ার সেনারা পড়ল চরম বিপদে।

এই খবরে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট নিক্সনের চুল ছেঁড়ার দশা। ইন্দিরাকে চিঠি পাঠালেন। সেনাদের সরিয়ে নিন। ইন্দিরা জানিয়ে দিলেন সম্ভব নয়। ১৯৭১ সালের ৯ ডিসেম্বর, বিকেল পাঁচটা পঞ্চান্ন মিনিটে হোয়াইট হাউসে বৈঠকে বসলেন প্রেসিডেন্ট নিক্সন ও হেনরি কিসিঞ্জার।

নিক্সনের গায়ে অফ হোয়াইট শার্ট। ওপরে নেভি ব্লু কোট। আজ টাই ঝোলাননি। মন ভালো নেই। দক্ষিণ এশিয়া নিয়ে চিন্তিত। কপালের ভাঁজগুলো আরো লম্বা হয়েছে। পাকিস্তানের হেরে যাওয়া মানে সোভিয়েতের জয়। তাই রাতে ভালো ঘুম হয়নি। চোখে ঘুম লেপ্টে আছে। ঘন ঘন কফি পান করে ঘুম তাড়ানোর চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন।

কিসিঞ্জারকে নিক্সন বললেন, 'ভুট্টো একটা ভয়ংকর বেজন্মা'।

কিসিঞ্জার জানালেন, ভুট্টো ওয়াশিংটন আসছেন।

ভুট্টো? বেজন্মার বাচ্চাটা আসছে কেন? বাংলাদেশ স্বাধীন করার পর কাশ্মীর দখল করবে ইন্দিরা?

আমাদের কাছে সে রকম কোনো তথ্য নেই। বললেন কিসিঞ্জার।

নিক্সন ও কিসিঞ্জার ইন্দিরা গান্ধীকে সহ্য করতে পারতেন না। কথায় কথায় 'দ্যাট বিচ' বলে গালি দিতেন নিক্সন। মার্কিন প্রেসিডেন্ট এখনো চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন দুই টুকরো পাকিস্তানকে একসঙ্গে রাখতে।

এদিকে মার্কিন কংগ্রেসের নিষেধ সত্ত্বেও ইরান ও জর্ডান থেকে অস্ত্রের চালান পৌঁছে যায় পাকিস্তানে। বঙ্গোপসাগরের দিকে ছুটে আসতে থাকে আণবিক অস্ত্র বোঝাই রণতরী 'এন্টারপ্রাইজ'। এসবের পেছন থেকে কলকাঠি নাড়াচ্ছেন হেনরি কিসিঞ্জার। বঙ্গোপসাগরের দিকে এগিয়ে আসতে থাকে মার্কিন নৌবহর। এখনো আমেরিকার স্টেট ডিপার্টমেন্টকে কিছু বলা হয়নি, এমনকি নৌবহরের কমান্ডার এলমো জামভালটও কিছু জানতেন না। প্রশ্ন হলো এই গোপনীয়তার রহস্য কী?

আমেরিকার সঙ্গে সোভিয়েত ইউনিয়নের উত্তেজনা সামনে এসে দাঁড়ায় ১২ ডিসেম্বর। নিক্সনকে বার্তা পাঠায় ব্রেজনেভ সরকার। বলা হয়, 'ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে আমাদের যোগাযোগ থেকে ইঙ্গিত মিলেছে যে পশ্চিম পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ভারতীয় সরকার কোনো সামরিক ব্যবস্থা নিতে আগ্রহী নয়।' নিক্সনকে কিসিঞ্জার বললেন, 'এটা সুখবর। তবে ভারতের এই নিশ্চয়তার মধ্যে স্পষ্টতার ঘাটতি রয়েছে।'

আমেরিকার নৌবহর রওনা হওয়ার খবর সোভিয়েত গোয়েন্দা সংস্থার জানা ছিল। পাল্টা ব্যবস্থা নেয় রাশিয়া। ভারত মহাসাগরে রণপোতের প্রথম টাস্কফোর্স পাঠায় সপ্তম নৌবহরকে মোকাবিলা করতে। দ্বিতীয় টাস্কফোর্সকে এগিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দেয়।

নিক্সন জানতে চাইলেন, বঙ্গোপসাগরে সপ্তম নৌবহর পাঠানো কত দূর?

কিসিঞ্জার বললেন, সবকিছু ঠিকঠাকমতো এগোচ্ছে। এরই মধ্যে পাকিস্তানে চারটি যুদ্ধবিমান রওনা হয়েছে। আরো ২২টি যাবে। সৌদি আরব ও তুরস্কের সঙ্গে কথা বলেছি। তুরস্ক পাঁচটি যুদ্ধবিমান দেবে।

মুখে হাসি ফুটল নিক্সনের।

সকালে জাতিসংঘে নিযুক্ত চীনের স্থায়ী প্রতিনিধি হুয়াং হুয়ার সঙ্গে বৈঠক করেন কিসিঞ্জার। সঙ্গে ছিলেন জাতিসংঘে আমেরিকার প্রতিনিধি জর্জ বুশ। পরবর্তী সময়ে বুশ আমেরিকার প্রেসিডেন্ট হয়েছিলেন।

বৈঠকে কিসিঞ্জার বলেন, 'মিস্টার হুয়াং আপনাকে বুঝতে হবে; আমাদের পক্ষে এই মুহূর্তে পাকিস্তানকে অস্ত্র সরবরাহ করা সম্ভব নয়। আইন আমাদের

হাত-পা বেঁধে রেখেছে। বন্ধু দেশকে বলতে পারছি না, পাকিস্তানকে অস্ত্র দাও। তবে আমরা কিছু বিকল্প ব্যবস্থা নিয়েছি।'

সপ্তম নৌবহর পাকিস্তানিদের সাহায্য করার জন্য ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে আসতে থাকে। ঠিক সেই সময় রাশিয়ার নৌবহর ভারত মহাসাগরে রওনা দেয়। এই খবর জানতে পেরে থমকে দাঁড়ায় সপ্তম নৌবহর। শেষ পর্যন্ত নৌবহর ফিরিয়ে নিতে বাধ্য হয় নিক্সন সরকার।

নিক্সন সরকার এবার অন্য চেষ্টা শুরু করে। ইয়াহিয়া খানকে বোঝালেন অসামরিক নেতার কাছে পাকিস্তানের শাসনভার হস্তান্তর করলে পূর্ব পাকিস্তানের সমস্যা মিটে যাবে। এসব কানে তুললেন না ইন্দিরা গান্ধী। বরং বুঝিয়ে দিলেন, দেরি করলে বাংলাদেশের স্বাধীনতা আসবে না।

১০ ডিসেম্বর, জাতিসংঘ প্রতিনিধি পল মার্ক হেনরির মাধ্যমে পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর সামরিক উপদেষ্টা রাও ফরমান আলীকে একটা বার্তা পাঠালেন, বললেন, 'অবিলম্বে যুদ্ধবিরতি এবং পাকিস্তান বাহিনীকে নিরাপদ হস্তান্তরে জাতিসংঘের সাহায্য চাই'।

পাল্টে যায় যুদ্ধের চিত্র। মাথায় বাজ পড়ল নিক্সনের।

কিসিঞ্জারকে ডেকে বললেন, 'পাকিস্তানের শরীর থেকে পূর্ব পাকিস্তান আলাদা হলে ক্ষতি নেই। তবে কোনোভাবেই যেন পশ্চিম পাকিস্তান ভারতের পেটে চলে না যায়।'

জুলফিকার আলী ভুট্টো নিউ ইয়র্কে। নিরাপত্তা পরিষদের মাধ্যমে যুদ্ধ বন্ধের সম্মানজনক প্রস্তাব চান তিনি। রাতে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়াকে এক বার্তায় জানালেন, এই আবেদনপত্র প্রত্যাহার করুন। এরই মধ্যে জাতিসংঘে পাকিস্তানের স্থায়ী প্রতিনিধি আগা শাহি মহাসচিব উ থান্টের সঙ্গে দেখা করে পাকিস্তানি গভর্নর মালিকের আত্মসমর্পণের বার্তা, 'অননুমোদিত' বলে প্রত্যাহার করার জন্য অনুরোধ করলেন। আগা শাহি দেখা করার আগে উ থান্ট আত্মসমর্পণ বার্তা নিরাপত্তা পরিষদ সদস্যদের দিয়েছেন। এখন একটাই আলোচনা, আর কতক্ষণের মধ্যে ইয়াহিয়ার পতন হচ্ছে?

নিউ ইয়র্কের ফিফথ অ্যাভিনিউ হোটেলে ভুট্টো অস্থির পায়চারি করছেন। বিড়বিড় করে বারবার একই কথা বলছেন, হায় হায় সব শেষ। ১৩ ডিসেম্বর সকালে নিরাপত্তা পরিষদে পোল্যান্ড একটি খসড়া প্রস্তাব তুলে ধরে। বলা হয়, রাজনৈতিক সমাধানের জন্য বাহাত্তর ঘণ্টার যুদ্ধবিরতি কার্যকর করা হোক। এই সময়ে পাকিস্তানি সেনা প্রত্যাহার শুরু হবে এবং সেখানকার নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরিত হবে।

পোল্যান্ডের প্রস্তাব শুনে নিউ ইয়র্কে ভুট্টোকে ফোন করলেন ইয়াহিয়া, পোলিশ প্রস্তাবটি ভালো মনে হচ্ছে। আমাদের তা গ্রহণ করা উচিত। ভুট্টো বললেন, কী বলছেন শুনতে পাচ্ছি না।

ইয়াহিয়া একই কথা বারবার বলতে থাকলেন। আর ভুট্টো বলতেই থাকলেন, শুনতে পাচ্ছি না। টেলি কথোপকথনের মাঝে নিউ ইয়র্কের টেলিফোন অপারেটর বললেন, স্যার আমি তো সব কথাই শুনতে পাচ্ছি। ভুট্টো বললেন, তুমি চুপ করো।

এদিন ঢাকায় গভর্নর মালিক পদত্যাগ করলেন। পরদিন সন্ধ্যায় জেনারেল নিয়াজি 'আত্মসমর্পণে সম্মতি' জানিয়ে জেনারেল মানেকশকে বার্তা পাঠান। বিকেল চারটায় নিউ ইয়র্কে নিরাপত্তা পরিষদের ১৬১৪ নম্বর কক্ষে বৈঠক শুরু হলো। ততক্ষণে নিয়াজির আত্মসমর্পণ বার্তা জেনারেল মানেকশর হাতে।

১৪ ডিসেম্বর। আমেরিকার স্থানীয় সময় এখন সন্ধ্যা ছয়টা পঁয়তাল্লিশ মিনিট।

হেনরি কিসিঞ্জার, সোভিয়েত চার্জ দ্য অ্যাফেয়ার্স ভরনস্তব ও ব্রিগেডিয়ার জেনারেল হেগ বৈঠকে বসলেন। শুরুতে কিসিঞ্জার বললেন, সোভিয়েত সরকারের কাছ থেকে নিশ্চয়তা পেয়ে আমরা আশ্বস্ত হচ্ছি যে, পশ্চিম পাকিস্তানের ভূখণ্ড দখল করা ভারতের উদ্দেশ্য নয়। এই বৈঠক একটি বিষয় স্পষ্ট করে, পাকিস্তানিরা আত্মসমর্পণ করার পর পশ্চিম পাকিস্তানের সঙ্গে জুড়ে থাকা কাশ্মীর যেন নিরাপদ থাকে।

আমেরিকা ব্যাকুল হয়ে চাইল পশ্চিম পাকিস্তান যেন, রক্ষা পায়। যদিও ১৪ ডিসেম্বরে জেনারেল নিয়াজিসহ পাকিস্তানের সেনা কর্তারা পরাজয় মেনে নেয়ার জন্য গালে হাত দিয়ে বসে আছেন। চূড়ান্ত বিজয়ের অপেক্ষায় সারা দেশ। বাংলাদেশের অস্থায়ী সরকারের সবাই এখন আনন্দে। শুধু একজনের মন খারাপ। তিনি এখন কলকাতার অফিস ঘরে একা বসে আছেন। মোশতাকের শ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দ সারা ঘরে ঘুরপাক খাচ্ছে।

কালো রঙের টুপি খুলে রাখলেন টেবিলের ওপর। মন মাথা দুটোই বিগড়ে যাচ্ছে। শান্ত থাকার চেষ্টা করছেন। চেয়ার থেকে উঠে জানালা দিয়ে আকাশের দিকে তাকালেন। জানালার ওপারে দাঁড়ানো নারকেলগাছের ডালে কয়েকটি দাঁড়কাক কা কা করছে।

দুপুর দেড়টায় ইয়াহিয়া বার্তা পাঠালেন। বার্তার প্রাপক দুইজন।

পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর এবং জেনারেল নিয়াজি।

বার্তায় লেখা, এখন আপনারা এমন এক অবস্থার মধ্যে পৌঁছেছেন, যেখানে কোনো মানুষের পক্ষে আর লড়াই করা সম্ভব নয়। করেও কোনো ফায়দা নেই। আরো মানুষের প্রাণ যাবে। ক্ষয়ক্ষতি বাড়বে। যুদ্ধ থামাতে এবং পশ্চিম পাকিস্তান থেকে পাঠানো সেনা ও সহযোগীদের প্রাণ বাঁচাতে যা যা করা দরকার, সব করুন।

বার্তাটি হাতে নিয়ে উদ্বিগ্ন গভর্নর ডাক্তার এম এ মালিক। বাংলাদেশের মানুষের কাছে তিনি 'ঠ্যাটা মালেইক্কা' নামে পরিচিত। চিকিৎসা না করে রাজনীতির 'সর' খেতে শুরু করেছেন অনেক আগে থেকে। এখন তার হাত কাঁপছে। হাত কাঁপা রোগটা পুরোনো। কয়েক দিন হলো তা বেড়েছে। টেলিফোনের কাছে গিয়ে বসলেন। একবার প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার সঙ্গে কথা বলতে চান। তবে কী বলবেন? বুঝে উঠতে পারছেন না। কাঁপা কাঁপা হাতে ডায়াল করলেন। একবার দুইবার না অন্তত দশ বার রিং বাজল। ইয়াহিয়া ফোন রিসিভ করলেন না। এমন হওয়ার কথা নয়। বিকেলে পদত্যাগ করে মুখ্য সচিব এবং মন্ত্রিসভার সদস্যদের নিয়ে গভর্নর হাউস থেকে বেরিয়ে এলেন মালিক। উঠলেন হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে। এই হোটেলকে নিরপেক্ষ এলাকা হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছিল।

১৫ ডিসেম্বর। হোয়াইট হাউসের ওভাল অফিসে বৈঠক শুরু হলো।

কথার শুরুতে হেনরি কিসিঞ্জার প্রেসিডেন্ট নিক্সনকে বললেন, রাশানরা নিশ্চয়তা দিয়েছে যে পশ্চিম পাকিস্তানে হামলার ঘটনা ঘটবে না। নিক্সন জানতে চাইলেন, আমাদের সঙ্গে সোভিয়েতের বোঝাপড়ার বিষয়টি চীন কীভাবে দেখবে? কিসিঞ্জার বললেন, যদি পশ্চিম পাকিস্তান রক্ষা পায়, তাহলে চীনারা আনন্দে লাফিয়ে উঠবে।

উত্তেজনায় নিজেকে সামাল দিতে পারছেন না ভুট্টো।

নিরাপত্তা পরিষদের ভাষণে বললেন, নিরাপত্তা পরিষদ আমাদের ন্যায়বিচার থেকে বঞ্চিত করেছে। সদস্যরা যদি ভেবে থাকেন, তাদের তৈরি আত্মসমর্পণ দলিলে আমি সই করব তাহলে তারা ভুল করেছেন।' এরপর ভারতীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী শরণ সিংয়ের দিকে আঙুল তুললেন ভুট্টো। বললেন, 'তাকে মাননীয় বলা হয়েছে, এই মাননীয় বলার কী মানে? লোকটি যদি ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী হতে পারেন, তাহলে আমি অখণ্ড ভারতের প্রধানমন্ত্রী হতে পারি। কিন্তু না, এর বদলে আমি মুক্ত দেশের ঝাড়ুদার হওয়া পছন্দ করি। আমি আমার দেশের অকৃত্রিম ও অবিসংবাদিত নেতা। পশ্চিম পাকিস্তানের নির্বাচনে যে বিজয় অর্জন করেছি, তা পূর্ব পাকিস্তানে মুজিবুর রহমানের বিজয়ের চেয়ে চমকপ্রদ। আমার দেশ যোদ্ধার দেশ। বিশ্বের সেরা পদাতিক পাকিস্তানে। আমরা যুদ্ধ করব। হাজার বছর ধরে যুদ্ধ করব। অল্প সময়ের বিজয়ে আমাদের আগ্রহ নেই।'

এসব বলে এবার সোভিয়েত প্রতিনিধি ইয়াকভ মালিকের দিকে আঙুল তুললেন ভুট্টো, 'আমি জানি, আপনি একটি মহান দেশের প্রতিনিধি, আপনাকে দেখে তাই মনে হয়। বিশেষ করে যেভাবে আপনি বুক উঁচু করে চলেন, যেভাবে টেবিল চাপড়ান তা দেখে মনে হয় আপনি কমরেড মালিকের মতো কথা বলেন না। কথা বলেন জার মালিকের মতো। আমরা চাই আপনাদের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক কিন্তু আপনারা আমার দেশকে নিশ্চিহ্ন করতে চান।'

বক্তৃতার শেষ প্রান্তে ভুট্টো বললেন, 'ইঁদুরের মতো পালিয়ে যাইনি কখনো। এই পরিষদ ছেড়ে চলে যাচ্ছি। এখানে এক মিনিট থাকাও অপমানজনক মনে করি। যুদ্ধবিরতির যে প্রস্তাব, তা ভার্সাই চুক্তির চেয়ে অপমানজনক, এই চুক্তি সমর্থন করতে পারি না। আমরা যুদ্ধ করব। আমার দেশ আমাকে ডাকছে। সময় নষ্ট করা যাবে না। রইল পড়ে আপনাদের নিরাপত্তা পরিষদ। আমি চললাম।' এসব বলে কয়েকটা কাগজ টুকরো টুকরো করে বেরিয়ে গেলেন।

পরদিন সকাল সাড়ে আটটা। সাভারে হেমায়েতপুর ব্রিজের ওপর 'ঘ্যাঁচ' শব্দ করে দাঁড়াল একটি জিপ। ভেতর থেকে নামলেন জেনারেল নাগরা। গাড়ির বনেটের ওপর এক টুকরো কাগজ রেখে একটানে লিখলেন, 'প্রিয় আবদুল্লাহ। আমরা এসে পড়েছি। তোমার সব বাহাদুরি আর খেলা শেষ। আমরা তোমাকে চারপাশ থেকে ঘিরে ফেলেছি। বুদ্ধিমানের মতো আত্মসমর্পণ করো। না হলে তোমাদের ধ্বংস অনিবার্য। আমরা কথা দিচ্ছি, আত্মসমর্পণ করলে জেনেভা কনভেনশন অনুযায়ী তোমাদের সঙ্গে আচরণ করা হবে। তোমাকে আমি ব্যক্তিগতভাবে জানাচ্ছি, তোমার জীবনের নিরাপত্তা অবশ্যই দেয়া হবে।'

এই চিঠি নিয়াজির হাতে এখনই পৌঁছাতে হবে।

সাদা কাপড় হাতে নিয়ে বাহক যাবেন। যুদ্ধের নিয়ম। হাতে সাদা কাপড় থাকা মানে, প্রস্তাব নিয়ে এসেছি। আশপাশে কোথাও সাদা কাপড় পাওয়া গেল না। নাগরার চোখে পড়ল, একজন পথচারী সাদা শার্ট গায়ে দিয়ে হাঁটছেন। অল্প বয়স। কাছে ডেকে নাগরা বললেন, ভাই তোমার জামাটা দেবে। কোনো কথা না বলে যুবক গায়ের শার্ট খুলে দেয়। তা ছিঁড়ে বাঁধা হলো জিপের সামনে।

নাগরার চিঠি নিয়ে পাঁচ জন ভারতীয় সেনা ছুটে চলল ঢাকার দিকে। ত্রিশ মিনিটের মধ্যে এই চিঠি পৌঁছে যায় নিয়াজির হাতে। মাথা তেতে উঠল। বাম হাত রাখলেন মাথায়। ভেলভেট কাপড়ে মোড়ানো সোফায় বসে পড়লেন। পাশে বসে আছেন মেজর জেনারেল জামশেদ, মেজর জেনারেল রাও ফরমান আলী ও রিয়ার অ্যাডমিরাল শরীফ।

তারা সবাই চিঠি দেখলেন। দেখা শেষে রাখা হলো টেবিলের ওপর। রাও ফরমান আলী একজনকে বললেন, চিঠির বাহককে ভেতরে নিয়ে এসো।

কিছুক্ষণ পর বিশেষ বার্তা পেলেন জেনারেল অরোরা। কলকাতায় সেনাকর্তাদের নিয়ে বৈঠক করছিলেন। বার্তার প্রেরক জেনারেল নিয়াজি। এতে লেখা, ঢাকার ওপর আজ বিকেল তিনটা পর্যন্ত বোমা বর্ষণ বন্ধ রাখুন। একজন স্টাফ অফিসার পাঠান আত্মসমর্পণের বিষয় চূড়ান্ত করার জন্য। চিৎকার করে উঠলেন অরোরা, 'বন্ধুরা যুদ্ধ শেষ হয়ে গেছে। আমরা জিতে গেছি। আমরা জিতে গেছি। জিতে গেছি।'

মুহূর্তেই আনন্দের খবর ছড়িয়ে পড়ল সারা দেশে।

বিশেষ বিমানে চেপে অরোরা ঢাকায় চলে আসেন। এদিকে দুপুর গড়ানোর আগে মেজর জেনারেল জ্যাকব আত্মসমর্পণ অনুষ্ঠানের বিষয় চূড়ান্ত করে ফেললেন। আত্মসমর্পণ দলিলে ভারত-বাংলাদেশ যৌথ কথাটির আপত্তি তুললেন রাও ফরমান আলী। তারা বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিতে চান না। টিকল না আপত্তি। নিয়াজি চাইলেন, আত্মসমর্পণের পর্বটা তার অফিসে হোক। জ্যাকব বললেন, না বিষয়টা খোলা জায়গায় এবং খোলাখুলিভাবেই করতে হবে। অনুষ্ঠান হবে রেসকোর্স ময়দানে; যেখানে দাঁড়িয়ে বঙ্গবন্ধু ঘোষণা করেছিলেন, এবারের সংগ্রাম আমাদের স্বাধীনতার সংগ্রাম।

সারা দেশের মানুষজন রাস্তায় নেমে আসে। সবার কণ্ঠে জয় বাংলা ধ্বনি।

মিত্রবাহিনীর ট্রাকে ফুল আর পাকিস্তানি সেনাদের গাড়িতে থুতু ছিটিয়ে দিচ্ছে লোকজন। রেসকোর্স ময়দানে কাঠের টেবিল পেতে পাশাপাশি বসলেন জেনারেল অরোরা ও নিয়াজি।

মুজিবনগর সরকারের কেউ এলেন না কেন? মুক্তিযুদ্ধের সর্বাধিনায়ক জেনারেল ওসমানী অভিমান করে বসে থাকলেন। আত্মসমর্পণ দলিলে স্বাক্ষর করার জন্য গাঢ় কালো কালির 'শেফার' কলম সঙ্গে নিয়ে এসেছেন অরোরা। বিকেল চারটা পঞ্চান্ন মিনিটে সই হয়ে গেল। নিয়াজি সই করার সময় শেফার কলম দিয়ে কালি বেরোল না। দুবার ঝাঁকি দিয়েও কালি বেরোল না।

নিয়াজির হাত কাঁপছে।

মাঘ মাসে পুকুরে গোসল করার পর যেমন হয়।

কাগজের ওপর কলম ঠেকানো কঠিন হয়ে দাঁড়াল। নিয়াজিকে অন্য একটি কলম দেয়া হলো। কাঁধ থেকে অধিনায়কের ব্যাজ খুলে রাখলেন নিয়াজি। কোমরের বেল্ট খুলে 'পয়েন্ট থার্টি এইট' রিভলবার থেকে সব গুলি বের করে অরোরার হাতে

তুলে দিলেন। আত্মসমর্পণের পুরোনো নিয়ম। নিয়াজির দুই চোখ ঠেলে বেরোচ্ছে পানি। আটকাতে চেষ্টা করলেন না। চোখের পানির ওপর তিনি এখন বিরক্ত।

আত্মসমর্পণের প্রতীক হিসেবে এক শ পাকিস্তানি সেনা অফিসার এবং এক শ জোয়ান হাতের অস্ত্র মাটিতে নামিয়ে রাখলেন। আত্মসমর্পণের অনুষ্ঠানটি শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে স্লোগান দিল অনেকে। 'জয় বাংলা' এবং 'শেখ মুজিব জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ' ধ্বনি উঠল।

আজ থেকে বাংলাদেশ স্বাধীন। আনন্দের দিনে বিষাদের সুর।

বঙ্গবন্ধু কবে ফিরবেন? তিনি বেঁচে আছেন তো? মোশতাকের ষড়যন্ত্রের খবর অনেকের জানা, এখন তার কি বিচার হবে? এরকম অনেক প্রশ্ন মনের ভেতর টাটাচ্ছে।

২০ ডিসেম্বর প্রেসিডেন্ট পদ ছাড়লেন ইয়াহিয়া।

ক্ষমতা হস্তান্তরের সময় ভুট্টোকে বললেন, ভুল করেছি মুজিবকে হত্যা না করে। এবার অনুমতি দেন, ক্ষমতা হস্তান্তরের আগে তাকে হত্যা করি। এরপর আপনাকে ক্ষমতায় বসাই। ভুট্টো বললেন, তাহলে পূর্ব বাংলার মানুষরা পাকিস্তানি সেনাদের বাঁচতে দেবে না। ইয়াহিয়ার মাথা তেতে উঠল। প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব বগলদাবা করলেন পাকিস্তান পিপলস পার্টির নেতা জুলফিকার আলী ভুট্টো। দুই দিন পর আমেরিকার প্রেসিডেন্ট নিক্সনকে বার্তা পাঠালেন, মুজিবকে দ্রুত মুক্তি দেয়া হবে। ২৬ ডিসেম্বর, সেনাবাহিনীর হেলিকপ্টারে করে বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে যাওয়া হয় রাওয়ালপিন্ডির বাইরের এক গেস্টহাউসে।

রাতে দেখা করলেন ভুট্টো।

কীভাবে এখানে এলেন? বঙ্গবন্ধু জানতে চাইলেন।

আমি এখন পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট।

আমার বাংলার অবস্থা কী?

ভারতীয়রা দখল করে নিয়েছে।

যাওয়ার বন্দোবস্ত করুন।

দুই পাকিস্তান কি একসঙ্গে থাকতে পারে না?

প্রতিশ্রুতি দিতে পারব না।

যদি প্রেসিডেন্ট হতে চান, আমি রাজি। আপনি মন্ত্রিসভা গঠন করুন।

বঙ্গবন্ধু বললেন, না তা হয় না। সম্ভব নয়।

কথা আর এগুলো না।

Northern University NUB Library Bangladesh

এরপর ৭ জানুয়ারি বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে দেখা করেন ভুট্টো। টুকরো হওয়া পাকিস্তানকে একসঙ্গে করে তিনি ত্রাণকর্তা সাজতে চান। তাই গলায় এখন আকুতি ভেজানো কথাবার্তা।

দুই দেশের মধ্যে কনফেডারেশন করা যায় না?

না, কোনো দিনই তা সম্ভব নয়।

মিয়ানওয়ালির কারাগারের কাছের বাংলোতে বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে আসা হলো।

এখানে ভুট্টোর লোকজন বেশ খাতির-যত্ন করছে।

দুজন দর্জি এসে শরীরের মাপ নিয়ে যায়। একদিন পরে পাজামা পাঞ্জাবি, হাতা কাটা কোট দিয়ে যান দুজন সেনাকর্তা। সাথে নিয়ে এসেছে দুইটা পাইপ আর ছয়টা এরিনমোর তামাকের কৌটা। বঙ্গবন্ধু বুঝতে পারছেন না হঠাৎ এই খাতির-যত্নের কারণ কী?

মন ভালো নেই। এখনো জানতে পারেননি এই কয় মাস দেশে কী ঘটেছে? আর এখনই বা কী হচ্ছে?

এই অতিথি ভবনে ডক্টর কামাল হোসেনের সঙ্গে দেখা। কামাল বন্দি ছিলেন পাকিস্তানের কারাগারে। তাকে দেখামাত্রই বঙ্গবন্ধু চিৎকার করে বললেন, এত দেরি হলো কেন?

ইচ্ছা করে কি আর দেরি করেছি? এখানে কখন এলেন?

পরশু থেকে। ওই দিনই জানলাম তোমাকে এখানে আনা হবে। তখন থেকেই অপেক্ষা করছি। আচ্ছা কামাল, আমার স্বপ্ন কি সত্যি হয়েছে? আমরা কি এখন স্বাধীন?

এসব প্রশ্নের উত্তর জানা নেই কামালের।

এখানে একটা টু ইন ওয়ান দেয়া হয়েছিল। সাথে কয়েকটি উর্দু ও হিন্দি গানের ক্যাসেট। মনে হলো সারা দুনিয়া হাতের মুঠোয় পাওয়া। কামাল হোসেন ঘোরাতে লাগলেন সুইচ।

বিবিসি, ভয়েস অব আমেরিকা, আকাশবাণী, রেডিও পাকিস্তান সব কটি রেডিও স্টেশনের খবর শুনলেন দুজন। বঙ্গবন্ধু জানলেন, বাংলাদেশ এখন স্বাধীন। আনন্দে চোখ গড়িয়ে পানি পড়ল।

A-95765

বাংলাদেশ চলছে মুজিবনগর সরকারের নেতৃত্বে।

কলকাতা থেকে মন্ত্রীরা দেশে ফিরলেন ২২ ডিসেম্বর। ঠোঁটে হাসি ঝুলিয়ে ফিরলেন খন্দকার মোশতাক। রাজা হওয়ার সুযোগ হাতের কাছে এসেও ফসকে

গেল। তবে হাল ছাড়তে নারাজ। নব উদ্যমে মাঠে নামার কথা ভাবছেন। দেশে ফিরে তাজউদ্দীনবিরোধীদের গায়ে হাত বুলিয়ে আদর করে বুঝিয়ে দিলেন, তোমাদের সঙ্গে আছি।

এবার আগুন খেলা খেলতে চান না। নতুন কিছু ভাবছেন।

পানি-বাতাসা সাজিয়ে নিজের দল গোছানোর কাজ শুরু করলেন। এবার আর মিসটেকের এমপি-থ্রি বাজাতে চান না, এতে কেবল একটার পর একটা ট্র্যাক। মনে মনে ভাবছেন, আমার জীবন কি শুধুই ভুলে ভরা?

ঢাকায় ফিরে আসার পরদিন আগামসি লেনের বাড়িতে টস করলেন, এশার নামাজের পর। তিনবারই গোপন ইচ্ছার পক্ষে পড়ল মুদ্রার পিঠ।

এদিকে বামপন্থি দলগুলো দাবি তোলে, ঐক্যের সরকার গঠন হোক। কারণ, মুক্তিযুদ্ধের অর্জনে আমরাও সমান অংশীদার। শুরু হলো নতুন বিতর্ক।

ওদিকে পাকিস্তানের নয়া প্রেসিডেন্ট ভুট্টোর ভোজবাজির আয়োজন চলছে।

উপলক্ষ সাত জানুয়ারি ভুট্টোর ৪৪তম জন্মদিন। এই উপলক্ষে অনেক মানুষকে আমন্ত্রণ জানালেন ভুট্টো। বঙ্গবন্ধুকে আমন্ত্রণ করেছেন।

লারকানার খামারবাড়িতে উৎসব সেরে নৈশভোজে যোগ দিলেন ভুট্টো। এখনো তার ইচ্ছা বাংলাদেশের সঙ্গে পাকিস্তানের অটুট সম্পর্ক। রাতের ভোজবাজিতে ডক্টর কামাল হোসেনও অতিথি। তবে এরই মধ্যে বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে দেখা করে ভুট্টো নিশ্চিত হয়ে গেছেন যে, সম্পর্ক উন্নয়নের চেষ্টা করে কোনো লাভ নেই।

বড় আয়োজন। হরেক রকম খাবার আর বিভিন্ন ব্র্যান্ডের বিদেশি মদের গন্ধে ম ম করছে। বঙ্গবন্ধু মদ পান করেন না। অল্প একটু খাবার খেয়ে সোফায় হেলান দিয়ে বসলেন। কারাগারে নির্যাতনে ক্লান্ত শরীর। হাতা কাটা কালো কোটের পকেট থেকে বের করলেন তামাকের কৌটো। আস্তে আস্তে পাইপ টানছেন। জোরে টান দিলেই বুকে ব্যথা করছে। মাত্র দু-একটা টান দিয়েছেন, এমন সময় কালো রঙের ব্রিফকেস হাতে সামনে দাঁড়ান ভুট্টো। বললেন, এতে ৫০ হাজার ডলার আছে। আপনার হাতখরচ।

বঙ্গবন্ধু বললেন, লাগবে না।

ভুট্টোর এসব আচরণ লোক দেখানো। ভেতরের ইচ্ছা ভিন্ন। বিশ্বস্ত একজন গোয়েন্দা কর্তাকে জানিয়ে রেখেছেন, এমন লোক খুঁজে বের করুন যে বাংলাদেশে পৌঁছার আগে মুজিবকে খুন করতে পারবে।

২৮৯ দিন পর মুক্ত আকাশের নিচে এলেন বঙ্গবন্ধু।

আজ ৮ জানুয়ারি, শনিবার। মধ্যরাতের কিছুক্ষণ পর বঙ্গবন্ধু ও কামাল হোসেনকে নিয়ে বিমানবন্দরে এলেন ভুট্টো। সবাই একসঙ্গে প্লেনে উঠলেন। হাত ধরে ভুট্টো বললেন, তিনটি জিনিস কি আমরা একসঙ্গে রাখতে পারি না? প্রতিরক্ষা, বিদেশ দফতর আর মুদ্রাব্যবস্থা। বঙ্গবন্ধু বললেন, কোনোদিন তা আর সম্ভব নয়।

পাকিস্তান ইন্টারন্যাশনাল এয়ারলাইনসের প্রধান এয়ার মার্শাল জাফর চৌধুরীও উঠেছেন। বিমান কর্মকর্তাদের বলে দিলেন ননস্টপ লন্ডন যাবেন। পথে কেউ জানতে চাইলে বলবেন, এটা পণ্যপরিবহন কার্গো। প্যাসেঞ্জারের নাম বলা যাবে না। লন্ডন পৌঁছার এক ঘণ্টা আগে ব্রিটিশ ফরেন মিনিস্ট্রিকে জানাবেন শেখ মুজিবুর রহমান আসছেন। তাঁকে আপনাদের কাছে হ্যান্ডওভার করতে চাই। এসব বলে বিমান থেকে নেমে গেলেন ভুট্টো ও জাফর। একটু পরই বিকট শব্দ করে বোয়িং ৭০৭ বিমানটি উড়াল দেয় আকাশে।

বিমান থেকে নেমে ভুট্টো বললেন, খাঁচার পাখি উড়ে গেল।

এই বিমানের সাড়ে চার ঘণ্টা আগে আরেকটি বিমান উড়ে গেছে লন্ডন। ওই বিমানের পেটের ভেতর বসে আছে পাকিস্তানের জাতীয় হকি দল। তাদের সাথে আছে তিনজন ছদ্মবেশী। এরা ভুট্টোর পরামর্শ মতো বঙ্গবন্ধুকে খুন করার দায়িত্ব নিয়ে এখন উড়ে যাচ্ছে লন্ডন। সবাই ভাড়াটে খুনি। তিনজনের এই ছোট দলের প্রধান দবির উদ্দিন সিদ্দিকী। সে ঢাকা অঞ্চলের বলিয়াদি গ্রামের বিশিষ্ট জমিদার পরিবারের সন্তান।

বিবিসির তরঙ্গে ভেসে আসছে, 'বাঙালির অবিসংবাদিত নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান লন্ডন পৌঁছে গেছেন।' ভোর সাড়ে ছয়টায় এয়ারপোর্টে নামে বিমান। সারিবদ্ধভাবে দাঁড়ানো ব্রিটিশ পুলিশ। তাদের থেকে একটু দূরে দাঁড়িয়ে আছে দবির উদ্দিন ও আরো দুজন।

একজন পুলিশ কর্মকর্তা স্যালুট দিয়ে বললেন, স্যার, উই হ্যাভ বিন ওয়েটিং ফর ইউ।

বঙ্গবন্ধুর গায়ে সাদা শার্ট। ধূসর ওভারকোট। হাতে পাইপ। কাকডাকা ভোরে বিমানবন্দরে হাজার হাজার বাঙালি। আশপাশের রাস্তায় যানজট লেগে যায়। বাংলাদেশ মিশনের প্রধান রেজাউল করিম জেনেছেন, বঙ্গবন্ধু লন্ডনে আসছেন। তবে কখন আসবেন তা জানেন না। রেজাউল এখন ঘুমে। ফোন বেজে উঠল। ঘুম চোখে ফোন ধরে শুনতে পেলেন, রেজাউল, আমি শেখ মুজিব, এখন তোমার লন্ডনে।

বিছানা থেকে লাফিয়ে উঠলেন রেজাউল। ফোনে কোনো কথা বলতে পারলেন না। রওনা দিলেন বিমানবন্দরে। এদিকে দুই সহযোগীকে নিয়ে বিমানবন্দরের বাইরে অপেক্ষা করছে দবির।

বিমানবন্দরের বাইরে ছোট-বড় অনেক গাড়ি দাঁড়ানো। এখানে এসে গাড়িতে উঠতে হয়। দবির রেডি। গাড়িতে ওঠার সময় ধারালো ছুরি পেটে ঢুকিয়ে দেবে। তিন জনের কাঁধে চামড়ার ব্যাগ। এর মধ্যে ধারালো ছুরি আর নকল দাড়ি-গোঁফ। ছদ্মবেশ ধরতে এসব কাজে লাগবে।

কালো রঙের লম্বা মার্সিডিজ গাড়ির পেছনে দাঁড়ায় দবির। চারপাশে মানুষের ভিড় বাড়তে থাকে। ব্রিটিশ পুলিশ বঙ্গবন্ধুকে ঘিরে বিমানবন্দর থেকে বেরিয়ে এলো। ব্যাগ থেকে ধারালো ছোরা বের করতে পারল না দবির উদ্দিন।

বঙ্গবন্ধু উঠলেন ক্ল্যারিজেস হোটেলে।

ঢাকা থেকে ফোন গেল। কথা বললেন সৈয়দ নজরুল ইসলাম, তাজউদ্দীন আহমদ এবং স্ত্রীর সঙ্গে। ভারতের লক্ষ্ণৌ থেকে ফোন করলেন ইন্দিরা গান্ধী।

হোটেলের সামনে মানুষের ঢল। সবাই বঙ্গবন্ধুকে একনজর দেখতে চান। ভিড় দেখে একজন পুলিশ কর্মকর্তা কামাল হোসেনকে বললেন, আপনি আমাদের সঙ্গে থাকুন। কারা কারা আপনাদের সঙ্গে দেখা করবেন, তা ঠিক করে দেবেন।

পুলিশের কড়াকড়ি। ব্রিটিশ পুলিশ কি টের পেয়েছিল, এখানে বঙ্গবন্ধু আক্রান্ত হতে পারেন? হোটেলের সামনের রাস্তায় পুলিশের তল্লাশি বসে। সবার ব্যাগ, শার্টের তল, কোমর চেক করা হচ্ছে। পুলিশ দেখে একটু দূরে একটা কালো রঙের জিপ দাঁড়ায়। ভেতরে সহযোগীসহ দবির উদ্দিন। সবার চোখ লাল। ইউটার্ন নিয়ে ফিরে আসে গাড়িটা।

সন্ধ্যা সাতটায় ১০ ডাউনিং স্ট্রিটে দেখা হলো ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে।

অ্যাডওয়ার্ড হিথ বললেন, 'আপনাদের পক্ষে সব সময় আমরা বক্তব্য রেখেছি। আপনার নিরাপত্তার ব্যাপারে এবং যেন কোনো রকম ক্ষতি না হয়, এ ব্যাপারে পাকিস্তানকে চাপের মধ্যে রেখেছিলাম। এখন বলুন, আপনার জন্য আমরা কী করতে পারি? বঙ্গবন্ধু বললেন, যদি একটা প্লেনের ব্যবস্থা করে দেন, ভালো হয়। তাহলে ইমিডিয়েটলি ঢাকায় পৌঁছতে পারি। ইন্ডিয়া থেকে আমাদের জন্য যে প্লেন আসবে তার জন্য আরো একটা দিন অপেক্ষা করতে হবে।

ব্যক্তিগত কর্মকর্তাকে ডেকে প্রধানমন্ত্রী হিথ বললেন, আমার যে পার্সোনাল প্লেনগুলো আছে। খবর নাও কাল সকালের মধ্যে একটা রেডি হতে পারবে কি না? কয়েক মিনিট পরে ওই অফিসার এসে জানান, একটা প্লেন কাল সকালের মধ্যে রওনা হতে পারবে।

প্রধানমন্ত্রী জানতে চাইলেন, 'আমাদের প্লেন যাওয়ার পথে কোথায় কোথায় থামে? অফিসার জানান, সাইপ্রাস ও শারজায়। সময়ের অঙ্ক করে দেখা গেল, দিল্লি ও কলকাতায় নামলে দিনের আলোতে ঢাকায় পৌঁছুতে পারা যাবে না। বঙ্গবন্ধু বললেন, ইন্দিরাকে জানিয়ে দাও কয়েক দিন পর কলকাতায় যাব। এবার কলকাতায় থামছি না। দিল্লি হয়ে সরাসরি দেশে যাব।

লন্ডনে বঙ্গবন্ধুকে খুন করতে পারল না দবির উদ্দিন।

দল নিয়ে ফিরে গেল পাকিস্তানে।

দিল্লির রাস্তায় ভারত এবং বাংলাদেশের পতাকা দিয়ে ছেয়ে ফেলা হয়েছে। লাগানো হয়েছে অসংখ্য পোস্টার। এতে লেখা, ইন্ডিয়া-বাংলাদেশ সেম ব্লাড।

বঙ্গবন্ধুকে অভিবাদন জানাতে দাঁড়িয়ে আছেন রাষ্ট্রপতি ভি ভি গিরি, প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীসহ অনেকে। বিমান থেকে বেরিয়ে বঙ্গবন্ধু উচ্চ স্বরে বললেন, জয় বাংলা। পর পর তিনবার বললেন।

বিমানবন্দরের পাশে বিশাল মাঠ। লাখ লাখ মানুষ। মঞ্চে আছেন ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী এবং প্রতিরক্ষামন্ত্রী জগজীবন রাম। বক্তৃতায় বঙ্গবন্ধু বললেন, 'শেষ পর্যন্ত আমি আমার স্বপ্নের সোনার বাংলায় ফিরে যাচ্ছি। সেখানে গিয়ে আমি দেখতে পাব লক্ষ লক্ষ মানুষের বিজয়ের হাসি। আমি মুক্ত। স্বাধীন বাংলাদেশে ফিরে যাচ্ছি।'

বঙ্গবন্ধু 'জয় হিন্দ' ধ্বনি দিয়ে বক্তৃতা শেষ করার সঙ্গে সঙ্গে ইন্দিরা গান্ধী বললেন, জয় বাংলা।

এরপর গেলেন রাষ্ট্রপতি ভবনে। এরই মধ্যে ঢাকার তেজগাঁও বিমানবন্দরের রানওয়ের মাপটা জানা যায়। ব্রিটিশ ক্যাপ্টেন বললেন, ঠিক আছে, ওই মাপের রানওয়েতে আমরা নামতে পারব।

১০ জানুয়ারি। দুপুর দুইটা ছাব্বিশ মিনিটে।

তেজগাঁও বিমানবন্দরের ধুলোমাটি উড়িয়ে স্থির হলো প্লেন। শেখ কামাল দৌড়ে গিয়ে বাবাকে জড়িয়ে ধরলেন। বিমানবন্দর থেকে রেসকোর্স ময়দান পর্যন্ত জনস্রোতে ভেসে চললেন জাতির জনক। মঞ্চে দাঁড়িয়ে বেশ কিছুক্ষণ বাকরুদ্ধ তিনি। কোনো কথা বলতে পারছেন না।

অনেকদিন পরে সেই কণ্ঠস্বর, 'আমার জীবনের সাধ আজ পূর্ণ হয়েছে। আমার সোনার বাংলা আজ স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র। বাংলার কৃষক, শ্রমিক, ছাত্র, মুক্তিযোদ্ধা ও জনতার উদ্দেশে জানাই সালাম। ইয়াহিয়া খাঁর কারাগারে আমি প্রতি মুহূর্ত প্রতীক্ষা

করেছি। মৃত্যুর জন্য আমি প্রস্তুতও ছিলাম, কিন্তু বাংলাদেশের মানুষ যে মুক্ত হবে, এ বিষয়ে আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ ছিল না।'

সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে সভা শেষ করে ফজলুল হক এবং সোহরাওয়ার্দীর কবর জিয়ারত করে যান কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে। এখানে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন করে কিছুক্ষণ নীরবে দাঁড়িয়ে থাকেন।

সন্ধ্যার পর বাড়িতে এলেন শেখ মনি, সিরাজুল আলম খান, আবদুর রাজ্জাক এবং তোফায়েল আহমেদ। মুজিব বাহিনীর এই শীর্ষ চার নেতার সঙ্গে কথা বললেন।

পরদিন সকালে ধানমন্ডির বাসায় দেখা করতে এলেন তাজউদ্দীন। বাড়িটি সকাল থেকে মোশতাকের লোকজনে ঠাসা। বঙ্গবন্ধু কোনো কথা বললেন না। মর্মাহত তাজউদ্দীন। প্রায় আড়াই ঘণ্টা বসে থেকে বেরিয়ে আসার জন্য উঠে দাঁড়ালেন। বললেন, আমি আসছি। এবারও কিছু বললেন না বঙ্গবন্ধু। বিষণ্নতা টন টন ভারি হয়ে চেপে ধরেছে। পা ফেলতে পারছেন না। বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেটের কাছে এক বন্ধুর সঙ্গে দেখা হলে তাজউদ্দীন তাকে বললেন, এটা খুবই ভালো হতো যদি বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর মারা যেতাম।

বঙ্গবন্ধু দেশে ফেরার দিন প্রকাশ হয় সাপ্তাহিক পত্রিকা গণকণ্ঠ।

নানা অঘটন-ঘটনপটীয়সী গণকণ্ঠ বঙ্গবন্ধু সরকারকে চাপে রাখতে নানা রকম খবর ছাপত। বিশেষ করে গুজব ছড়ানোর কাজে গণকণ্ঠের জুড়ি ছিল না। একাত্তরের ডিসেম্বরে সিরাজুল আলম খানের এক দল শিষ্য পুরান ঢাকার র‍্যাংকিন স্ট্রিটের জনতা প্রিন্টিং অ্যান্ড প্যাকেজেস দখল করে। দলপতির দায়িত্বে ছিল মুজিব বাহিনীর সদস্য আফতাবউদ্দিন আহমদ। এই ছাপাখানা থেকে আফতাব গণকণ্ঠ প্রকাশ করলেন। প্রধান সহযোগী রায়হান ফেরদৌস মধু। পত্রিকায় সম্পাদকের নাম লেখা হলো কবি আল মাহমুদের। যদিও আল মাহমুদ ঢাকায় এখনো এসে পৌঁছেননি। পত্রিকা নিবন্ধনের জন্য ঢাকা জেলা প্রশাসকের কাছে আবেদন জানানো হয়। এতে প্রধান পৃষ্ঠপোষক হিসেবে লেখা হলো তাজউদ্দীনের নাম। পৃষ্ঠপোষক হিসেবে রাখা হলো ঢাকা মহানগর আওয়ামী লীগের সভাপতি গাজী গোলাম মোস্তফাকে।

প্রথম দিন থেকে গণকণ্ঠ অফিসে সিরাজুল আলম খানের শিষ্যদের আনাগোনা শুরু হয়। ঢাকায় তাদের বসার জায়গা ছিল না। দিনের বেলায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জহুরুল হক হলের ক্যান্টিন আর প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের আহসানউল্লাহ হল ক্যান্টিনে আড্ডা হতো। মাঝেমধ্যে সন্ধ্যায় আড্ডা হতো নীলক্ষেতের আনোয়ার রেস্টুরেন্টে।

পাঁচ জনের যৌথ মালিকানায় গণকণ্ঠ নিবন্ধিত হয়। এরা হলেন আ স ম আবদুর রব, শাজাহান সিরাজ, কাজী আরেফ আহমেদ, মনিরুল ইসলাম এবং

আফতাব আহমেদ। নির্বাহী সম্পাদক আফতাব আহমেদ। ব্যবস্থাপনা সম্পাদক কাজী আরেফ আহমেদ। নাজিমুদ্দিন মানিক দায়িত্ব পেলেন বার্তা সম্পাদকের।

সহকারী সম্পাদক পাঁচ জন, মোহাম্মদ তোহা খান, আলাউদ্দিন আহমেদ, রমেন দত্ত, আবুল হাসান এবং নির্মলেন্দু গুণ। সাহিত্য সম্পাদনার ভার আবু কায়সারের কাঁধে।

১৯৭২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি গণকণ্ঠ দৈনিক হিসেবে প্রকাশ হতে থাকে। সাত মাস পর সম্পাদকীয় বিভাগে যোগ দেন আহমদ ছফা।

শুরু হলো দেশ গড়ার কাজ।

গঠন করা হলো নতুন সরকার। বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের গদিতে বসলেন খন্দকার মোশতাক আহমদ। তার ডান হাত বলে পরিচিত তাহেরউদ্দিন ঠাকুর উঠে বসলেন তথ্যমন্ত্রীর গদিতে।

নতুন করে শুরু হয় চক্রান্তের বেলুনে হাওয়া দেয়ার কাজ। মোশতাক এবার সাবধান। হিসাব করে পা ফেলছেন। এবার কোনো ভুল করতে চান না। সামনে রাখলেন চারটি বিষয়। আইনশৃঙ্খলার অবনতি ঘটানো, সাম্প্রদায়িকতার প্রসার, ভারতবিরোধিতা এবং খাদ্যসংকট তৈরি।

দেশে আসার কয়েক দিন পর বঙ্গবন্ধু গেলেন কলকাতায়। ১৯৭২ সালের ৮ ফেব্রুয়ারি। দমদম বিমানবন্দরে অভ্যর্থনা জানাতে উপস্থিত ছিলেন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীসহ মন্ত্রিপরিষদের অনেকে। গমগম করছে কলকাতার প্যারেড গ্রাউন্ড। লাখ লাখ মানুষের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে লন্ডনে খুন করতে ব্যর্থ হওয়া দবির উদ্দিন। খুনের নেশায় চোখে সবকিছু এখন অন্যরকম দেখছে। পাঁড় মাতালের মতো চোখ ফুটে বেরোচ্ছে।

ঘন ঘন সিগারেট টানছে আর গালভরা ধোঁয়া ছাড়ছে। সঙ্গে ছয় জন। ধারালো ছোরা নয়, পিস্তল দিয়ে গুলি করবে দবির। মাথা গরম। মরুভূমির বালির মতো তেতে আছে। মঞ্চের পাশে দাঁড়ায়। কলকাতা পুলিশ টের পায় লোকটা স্বাভাবিক নয়।

একজন পুলিশ কর্মকর্তা কাছে এসে ব্যাগ তল্লাশি করে গুলিভর্তি বিদেশি পিস্তল পায়। কিছু বুঝে ওঠার আগেই দবির উদ্দিন আটক। লাল বাজারের পুলিশ সদর দফতরে তাকে নিয়ে যাওয়া হয়। সব কথা স্বীকার করে। কয়েক দিন পর টাইপ করা ১২৭ পাতার জবানবন্দি দেয়।

দবির জানায়, আমি পাকিস্তান সামরিক বাহিনীর গোয়েন্দা বিভাগের লোক। পাকিস্তান প্রতিরক্ষা দফতর থেকে দায়িত্ব দেয়া হয়েছে মুজিবকে খুন করার।

দবিরকে গ্রেপ্তারের ঘটনা পরদিন বঙ্গবন্ধুকে জানানো হয়। হেসে বললেন, দবিরকে বাংলাদেশের হাতে তুলে দিন। তিন মাস পর কলকাতা পুলিশ দবিরকে বাংলাদেশে ফেরত পাঠায়। ঢাকায় ছয় মাস জেলে থাকার পর ছাড়া পায়। দবিরের সঙ্গে যোগাযোগ ছিল মোশতাকের। অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে দবিরের ১২৭ পাতার জবানবন্দির ফটোকপি জোগাড় করেছে সুমন।

১৯৭২ সালের শুরু থেকে ছাত্রলীগের গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব চরমে ওঠে।

বিভেদ পর্বে প্রথমে রাখা হলো 'মুজিববাদ'। যারা এই মুজিববাদের জন্ম দিয়েছে তাদের মধ্যেই এখন বিরোধ। ১২ মে ছাত্রলীগের চার জন সাবেক শীর্ষনেতা আলাদা হয়ে যান। একদিকে আবদুর রব ও শাজাহান সিরাজ। অন্যদিকে আবদুল কুদ্দুস মাখন এবং নূরে আলম সিদ্দিকী। রব-সিরাজ ঘোষণা করলেন, আমরা মুজিববাদে বিশ্বাসী নই। মাখন-সিদ্দিকী বললেন, মুজিববাদ প্রতিষ্ঠা করতেই হবে। দুই টুকরো হয়ে যায় ছাত্রলীগ।

বাহাত্তরের ২১ থেকে ২৩ জুলাই। তিন দিন ধরে ছাত্রলীগ কেন্দ্রীয় সম্মেলনের আয়োজন করে দুই টুকরো হয়ে যাওয়া ছাত্রলীগ। রব গ্রুপের আয়োজন পল্টন ময়দানে এবং মুজিববাদী গ্রুপের সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে। দুই গ্রুপ পোস্টারে জানিয়ে দেয়, সম্মেলন উদ্বোধন করবেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।

আগের দিন পর্যন্ত সিরাজুল ও তার দলের ছেলেরা অপেক্ষা করলেন। বঙ্গবন্ধু তাদের সম্মেলন উদ্বোধন করতে আসবেন বা তিনি কোনোটাতেই হাজির হবেন না। সারা দেশে এই আলোচনা অনেক মানুষের মুখে। ২১ জুলাই সব জল্পনাকল্পনা দূর হয়। বঙ্গবন্ধু গেলেন সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের জনসভায়।

ছাত্রলীগের প্রায় নব্বই ভাগ কর্মী পল্টনে। সিরাজুলের মঞ্চে ভিড় করল মুজিববাহিনীর অনেকে। এই আয়োজন প্রাণবন্ত করতে কলকাতা থেকে কয়েকজন বড় শিল্পী আনা হয়েছিল। এই দলে রবীন্দ্রসংগীত শিল্পী অশোকতরু বন্দ্যোপাধ্যায় এবং বাণী ঠাকুর ছিলেন। দিনের বেলায় উত্তপ্ত ভাষণ আর সন্ধ্যার পর থেকে মধ্যরাত পর্যন্ত জমজমাট গানের অনুষ্ঠান।

সদ্য উদিত হওয়া ফকির আলমগীর নিজের রচিত একটা গান করে সবার হাততালি পেলেন। এটা ঠিক গান না বলে বঙ্গবন্ধুর নামে খিস্তি বলাই ভাল। 'একশ টাকা চালের দাম, মুজিববাদের অপর নাম' চিৎকার করে গাইলেন ফকির।

অন্দরমহল থেকে বাইরে চলে আসে বিরোধিতা।

অস্ত্র দিয়ে সমাজ বদলের লাইন ধরলেন সিরাজুল। হঠাৎ অতিবিপ্লবী হয়ে উঠলেন। মুক্তিযুদ্ধের সময় ছিলেন কলকাতা। কখনো যুদ্ধে নামেননি। সেখানে কী

করতেন? তা কেউ জানে না। ২১ জুলাইয়ের সম্মেলন মঞ্চ থেকে বলতে শুরু করলেন, মুজিবকে দিয়ে সমাজ বদল সম্ভব নয়, আমাদেরই তা করতে হবে। রাজধানীর অস্থির সময়ের মধ্যে গরম হয়ে ওঠে উত্তরের জনপদ।

নওগাঁ জেলার আত্রাইতে শুরু হয় গলা কাটা রাজনীতি। ধনী মানুষদের পটাপট খুন করা হয়। নেতৃত্বে থাকলেন ওহিদুর রহমান এবং টিপু বিশ্বাস। নাম দেয়া হলো শ্রেণিশত্রু খতম অভিযান। সারা দেশে হইচই পড়ে যায়। আত্রাই নামটা সবার মুখে মুখে ঘুরতে থাকে।

গলা কাটা রাজনীতি থামাতে সেনাবাহিনীর রংপুরের এক ব্রিগেডকে মোতায়েন করা হয়। ব্রিগেড কমান্ডারের নাম লেফটেন্যান্ট কর্নেল শাফায়াত জামিল। তার কয়েকজন সহযোগীর একজন ক্যাপ্টেন নূর। এই নূর ১৫ আগস্ট খুনিদের অন্যতম হোতা।

ছাত্রজীবনে নূর ছিলেন ছাত্র ইউনিয়ন মেনন গ্রুপের কর্মী। আত্রাইতে সন্ত্রাস দমনে উঠেপড়ে কাজ করলেন শাফায়াত জামিল। নূর চাইলেন না আত্রাই অপারেশনে নির্বিচারে গুলি চালাতে। এ নিয়ে ব্রিগেড কমান্ডার শাফায়াতের সঙ্গে বিরোধ হয়। এই ঘটনার কিছুদিন পরে তদবির করে ঢাকায় চলে আসেন নূর। ঢাকায় এসে সেনাবাহিনীর উপপ্রধান জিয়াউর রহমানের এডিসি নিযুক্ত হলেন।

সবকিছু মিলে দেশের রাজনীতির আকাশে এখন রোদ-মেঘের খেলা।

রেফারির দায়িত্ব নেন মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থা সিআইএ। এই দায়িত্ব তাদের দেয়া হয়নি। তাদের দায়িত্ব দিতে হয় না। নিজেদের স্বার্থে যা ইচ্ছা, তা-ই করতে পারে।

বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর পরই ঢাকার মার্কিন দূতাবাসের দায়িত্ব নেন ইউজিন বোস্টার। মাঝারি আকারের গড়ন। হালকা নীল চোখ। মাথায় বুদ্ধিতে ঠাসা। বেশিরভাগ সময় হাতে কালো রঙের অ্যাটাশে কেস। এর ভেতর কী থাকে তা কেউ জানে না।

মোশতাক সম্পর্কে আগে থেকেই সব জানতেন। ঢাকা দূতাবাসের দায়িত্ব নেয়ার পরদিন মোশতাকের সঙ্গে দেখা করে যান। সপ্তাহে এক-দুবার সাংবাদিকদের নৈশভোজে ডাকেন। মধ্যরাত পর্যন্ত চলে মদের আড্ডা। এই আড্ডা ছুতো মাত্র। আসল কাজ বঙ্গবন্ধুবিরোধীদের খুঁজে বের করা।

এই কাজটা সহজ করে দেয় গণকণ্ঠ। পত্রিকার একমাত্র কাজ বঙ্গবন্ধু সরকারের বিরোধিতা করা।

এই সময়ে মুক্তিবাহিনী ও মুজিববাহিনীসহ সকল বাহিনী বিলুপ্ত ঘোষণা করা হয়। এরপরই সরকার এবং মুক্তিবাহিনীর দ্বন্দ্ব উঠে আসে প্রকাশ্যে। পাস হয়

দালাল আইন। বঙ্গবন্ধু সরকার চাইল, মুক্তিযুদ্ধের সময় পাকিস্তানিদের সাহায্য করা আলবদর ও রাজাকারদের বিচার হোক। মোশতাক গং অনেক নিরীহ মানুষদের হয়রানি করতে থাকে। মানবতাবিরোধীরা চলে যায় পর্দার আড়ালে।

এদিকে অস্ত্র জমা পড়ে অর্ধেকের কম। রাজাকার, আলবদর এবং চীনাপন্থি বাম সংগঠন, বিশেষ করে নকশাল আন্দোলনের সঙ্গে যারা যুক্ত তাদের সবার হাতেই তাজা অস্ত্র।

হঠাৎ সবকিছুর দাম বাড়ে। এমন সময় সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের নামে শুরু হয় নৈরাজ্য। যারা বিপ্লবের পথে হাঁটলেন তাদের অধিকাংশ বিপ্লবের ব-ও বোঝে না। বাড়ল মানুষ খুন। তারা বদলাতে চাইল বিপ্লবের ইতিহাস। শেষে পালিয়ে যাওয়া ছাড়া ইতিহাসে তাদের কোনো অবদান নেই।

এদিকে প্রতিদিন খুন ধর্ষণ আর লুটপাটের ঘটনা সংবাদপত্রের হেডলাইন হচ্ছে। দুশ্চিন্তায় বঙ্গবন্ধু। হাতে পাইপ নিয়ে তামাকে আগুন দিতে ভুলে যাচ্ছেন। কী করবেন এখন? ভেবে পাচ্ছেন না। পাঁকের জঞ্জাল থেকে বেরিয়ে আসে নষ্ট মানুষের দল। বাম, অবাম, অতিবাম, সকল রাজনৈতিক সংগঠন জঙ্গিপনার মহড়া দিতে থাকে।

মোশতাকের বাড়িতে নানা কিসিমের লোকের আনাগোনা।

এদের কেউ লম্বা, মাঝারি, বেঁটে, ভুঁড়িদার, আধ-টেকো, ঢেউ খেলানো, কারো মাথায় বাবরি চুল।

চেয়ারে বসে মাঝেমধ্যে দীর্ঘশ্বাস ছাড়েন মোশতাক। রাজা হওয়ার ইচ্ছাটা আবার মাথা তুলেছে। বাসায় অনেকেই আসে। তাদের কাউকে বিশ্বাস হয় না। এখন তার একটা ডান হাত আছে। এই হাতের নাম মাহবুবুল আলম চাষী। এ রকম আরো কয়েকটা ডান হাত দরকার।

খটখটে দুপুর। লাঞ্চ করতে বসলেন মোশতাক। এমন সময় মন্ত্রণালয়ের রিসেপশন রুমে প্রবেশ করলেন করিম। পেটানো শরীর। বয়স ষাটের ওপরে। ঠোঁটের ওপর ছেঁটে রাখা গোঁফ। দাড়ি নেই। বড় বড় চোখ। দৃষ্টি বাজপাখির মতো। পাকিস্তান সেনাবাহিনী থেকে মেজর জেনারেল পদ থেকে অবসর নিয়েছেন। মুক্তিযুদ্ধের আগে মোশতাকের সঙ্গে কয়েকবার দেখা হয়েছে। লাহোর এবং করাচিতে। কয়েক দিন আগে এক গোপন বার্তায় ফিলিপ চেরি জানান, করিম আপনার পাশে থাকবে। ফিলিপ চেরি মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থার বড় কর্মকর্তা।

খেতে বসবেন, এমন সময় ব্যক্তিগত সহকারী জানায়, করিম নামের একজন এসেছেন।

মনে পড়ল চেরির কথা। করিমকে ভেতরে নিয়ে আসা হলো। দুজন একসঙ্গে লাঞ্চ সারলেন। অফিসকক্ষে এখন অন্য কেউ নেই। জানালাগুলো ঠিকমতো লাগানো আছে কি না, উঁকি দিয়ে দেখলেন মোশতাক।

করিম জানান, চেরির সঙ্গে আমার কথা হয়েছে।

কী বলেছে সে?

সাহসী সেনা কর্মকর্তাদের খুঁজে বের করতে হবে।

গোপনে করতে হবে।

এসব নিয়ে আপনি ভাববেন না।

শুরু হয় করিম মিশন। পরদিন বিকেলে ক্যান্টনমেন্টের টেনিস গ্রাউন্ডে যাওয়া শুরু করলেন করিম। মাঝেমধ্যে গলফ মাঠে যান। খরগোশের মতো কান সজাগ। শুনতে চান কারা সরকারবিরোধী কথা বলছে।

গরমকাল। পড়ন্ত বেলা। টেনিস গ্রাউন্ডের পাশে করিম হাঁটার মুডে পায়চারি করছেন। টেনিস খেলেছে ফারুক। সাথের তরুণ খেলোয়াড়কে চিনতে পারলেন না। ফারুককে আগে একবার দেখেছেন। চেনা চেহারা। করিমকে মোশতাক আগেই বলে দিয়েছেন, এই ছেলেটা কাজের।

টেনিস খেলা শেষ। তোয়ালে দিয়ে ঘাম মুছতে মুছতে গ্রাউন্ড থেকে বেরিয়ে আসছে ফারুক। হাতে টেনিস ব্যাট। সামনে এসে করিম বললেন, কেমন আছ? থমকে দাঁড়াল ফারুক। হাত এগিয়ে দিলেন করিম। হ্যান্ডশেক অবস্থায় বলেন, আমি মেজর জেনারেল করিম। এখন রিটায়ার্ড। পশ্চিমে ছিলাম। নাম শুনে চিনতে পারল ফারুক। দুজন এগিয়ে গেল ক্যাফেটেরিয়ার দিকে।

বঙ্গবন্ধুর জনপ্রিয়তা সহ্য হচ্ছে না বিরোধী নেতাদের।

তারা দেশের মানুষদের অভাব-অনটনের কারণ বুঝতে দিলেন না। কেউ জানল না, আন্তর্জাতিক অসহযোগিতার কারণে গর্তে পড়েছে অর্থনীতি। বন্যা-খরার কথাও ভুলে যায় বেশিরভাগ মানুষ।

প্রকাশ্যে বঙ্গবন্ধুর বিরোধিতা হলো ১৯৭২ সালের ১৭ সেপ্টেম্বর।

গরমের দিন।

বিকেলে এক ঝাঁক মেঘ এসেছিল। বৃষ্টি পড়েনি। ভ্যাপসা গরমে সবাই অতিষ্ঠ। এর ভেতর পল্টন ময়দানে প্রায় এক লাখ মানুষের সমাবেশ।

মতিঝিল অফিস থেকে বেরিয়ে এসেছেন হোসনে আরা। বাসে চড়ে কলাবাগান রওনা দিয়েছেন। পল্টনের এই বিপুলসংখ্যক মানুষ দেখে বাস থেকে নেমে রাস্তার পাশে দাঁড়ান।

মাইকে একজন ভাষণ দিচ্ছেন। দূর থেকে চেনা যাচ্ছে না। ভ্যানিটি ব্যাগের ভেতর থেকে চশমা বের করে শাড়ির আঁচলে মুছে চোখে পরলেন। চশমা ছাড়া দূরে দেখতে পান না। গত মাস থেকে চশমা ব্যবহার করছেন। এখনো অভ্যস্ত হননি। চশমা পরে মঞ্চে ভাষণ দেয়া লোকটার মুখ দেখে চিনতে পারেন, তিনি আ স ম আবদুর রব। রবের সঙ্গে কোনোদিন দেখা হয়নি। সংবাদপত্রে ছবি দেখে চেহারাটা মুখস্থ।

এই প্রথম সমাবেশের ভাষণ শোনা। মাইক দিয়ে গরম কথার স্রোত বেরোচ্ছে। বঙ্গবন্ধুকে উদ্দেশ করে রব বললেন, 'আপনি আমাদের বেপরোয়া ধরপাকড় করছেন, উৎপীড়নের সকল যন্ত্রপাতি আমাদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করছেন। আপনি বক্তৃতায় অস্ত্রের কথা বলেছেন, আপনি কি কোনোদিন বন্দুক চালিয়ে দেখেছেন? আমরা জানি সত্যিকারের অস্ত্র কীভাবে চালাতে হয়?'

বক্তৃতা আর শুনতে ইচ্ছা করল না। বাসার দিকে রওনা দিলেন হোসনে আরা। বাস নেই। রিকশা পাওয়া গেল। উঠেই রিকশাচালকের সঙ্গে কথা বলতে শুরু করেন, ভাষণ শুনলেন?

শুনলাম তো।

ক্ষমতায় বসতেই পারলেন না, শুরু হলো বিরোধিতা।

এরা শেখ সাবের বিরুদ্ধে লাগল ক্যান?

রিকশাচালকের সরল প্রশ্নের উত্তর খুঁজে পান না হোসনে আরা। কিছুদূর আসার পর রিকশার চেন পড়ে যায়। এখন কার্জন হলের কাছাকাছি। রাস্তার পাশে রিকশা থামিয়ে চেন তুলতে ব্যস্ত চালক। এমন সময় ছাত্রদের একটা মিছিল যায় পাশ দিয়ে। এদের কারো হাতে বাঁশের টুকরো, কারো হাতে গাছের শুকনো ডাল। সবার কণ্ঠে বঙ্গবন্ধুবিরোধী স্লোগান। হতবাক হোসনে আরা, ভাবছেন এসব হচ্ছেটা কী? আমরা কি আবার কোনো লড়াইয়ের মধ্যে প্রবেশ করছি?

আস্তিন গুটিয়ে রাজপথে নেমে পড়লেন মওলানা।

১৯৭২ সালের অক্টোবরে ভারত থেকে ফেরার দিন থেকে শুরু করলেন পুরোনো অভ্যাস 'বিরোধিতার খেল'। রাতারাতি হয়ে গেলেন চীনা অনুসারী অতিবাম গোষ্ঠীর আধ্যাত্মিক নেতা। কয়েক দিন পর মওলানার যোগাযোগ হলো চীনা প্রধানমন্ত্রী চৌ এন লাইয়ের সঙ্গে। চৌ মুক্তিযুদ্ধের বিপক্ষের লোক।

বাংলাদেশের প্রথম বিজয় দিবসের পরদিন চৌ মন্তব্য করলেন, 'ভারতীয়রাই পাকিস্তানের ঘাড়ে তথাকথিত বাংলাদেশের ক্রীড়নক সরকারকে চাপিয়ে দিয়েছে।' এর দুই দিন পর পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট জুলফিকার আলী ভুট্টোর গলায় শোনা গেল, 'এই অবস্থা চিরস্থায়ী নয়, পূর্ব পাকিস্তান এখনো পাকিস্তানের অঙ্গ।'

চীন ও পাকিস্তান থেকে এ রকম বক্তব্য ভেসে আসার পর বুঝতে বাকি রইল না, হাওয়া এখন কোন দিকে?

অনেকের সঙ্গে সিরাজ শিকদারের সর্বহারা পার্টি অস্ত্র নিয়ে বেরিয়ে পড়ল। সিরাজ জানিয়ে দিলেন, স্বাধীনতার নামে বাংলাদেশ এখন ভারতের পদানত হয়ে আছে। এসব বলে স্বাধীন গণতান্ত্রিক পূর্ব বাংলা কায়েমের জন্য রাইফেলের গুলি ফোটালেন। সিরাজের পাশাপাশি চীনাপন্থি অন্যদলের লোকজনও কোমর বেঁধে নেমে পড়ে।

মুক্তিযুদ্ধবিরোধী শক্তি জামায়াতে ইসলামী, নেজামে ইসলাম ও পিডিপিকে পাঞ্জাবির পকেটে রাখলেন মওলানা। একবারও ভাবলেন না মুক্তিযুদ্ধের আদর্শ। সাম্প্রদায়িক শক্তিকে জোরদার করতে গঠন করলেন 'হুকুমতে রব্বানী'। প্রতিটি জনসভায় একই কথা বললেন মওলানা, 'মুসলিম বাংলার জন্য যারা কাজ করছে তাদের আমি দোয়া করছি। আল্লাহর রহমতে তারা জয়যুক্ত হবে।' এসবের ভেতর চূড়ান্ত হলো সংবিধান।

চার মূলনীতির ওপর দাঁড়িয়ে থাকল নতুন দেশের টাটকা সংবিধান।

জাতীয়তাবাদ

সমাজতন্ত্র

গণতন্ত্র

এবং ধর্মনিরপেক্ষতা।

এই সংবিধান বাতিলের দাবি তুললেন মওলানা। পল্টন ময়দানে বললেন, কোরআন হাদিসের ভিত্তিতে আমাদের সংবিধান তৈরি করতে হবে।

জেলে থেকে ওজন কমে গেছে প্রায় পনেরো কেজি। ফিরে এসে রাতদিনের পরিশ্রম টানতে পারলেন না। অসুস্থ হয়ে পড়লেন বঙ্গবন্ধু। পেটের পীড়া দেখা দিল। হজমের গণ্ডগোল, ব্যথায় কাতর হয়ে পড়লেন। চিকিৎসক বললেন, উন্নত চিকিৎসা আর বিশ্রাম দরকার। গেলেন লন্ডন। কয়েক দিন পর গলব্লাডার অপারেশন করে দেশে ফিরলেন।

শরীর ও মন কোনোটাই ভালো নয়। এদিকে বাংলার রাজনীতির আকাশ তেতে উঠছে।

জিনিসপত্রের দাম এখন লাগামছাড়া।

সপ্তাহে এক দিন বাজার করেন হোসনে আরা। ছুটির দিন ছাড়া সময় পান না। অন্যদিন দরকার হলে অফিস থেকে ফেরার সময় অল্প সবজি নিয়ে বাসায় আসেন।

সকালে মুদি দোকানির সঙ্গে ঝগড়া বাধার উপক্রম। মহল্লার এই দোকানের নাম আবুল জেনালের স্টোর। দোকানির নাম আবুল মাল। বয়স ষাটের কাছাকাছি। হোসনে আরা চাচা ডাকেন।

কলাবাগানের প্রায় সবাই এই দোকানের ক্রেতা। আবুল মালের মাথা ভরা তেলতেলে টাক। সর্বক্ষণ হাসিমুখ। হড়বড় করে কথা বলেন। সব কথা স্পষ্ট নয়। মনে হয় মুখভরা পান নিয়ে কথা বলছেন। এলাকার ছেলেরা তার সঙ্গে মজা করে। কারণ, আবুল মালের বাসায় তিনটে বউ।

গত সপ্তাহে যা কিনেছে তিরিশ টাকায় আজ তার দাম কেন পঞ্চান্ন টাকা? রেগে যান হোসনে আরা।

চাচা, দাম বাড়ল ক্যান?

কী বলি মা! আমিও বুঝলাম না।

কারা বাড়াল?

সেইডা কি আর কইতে পারি?

কথা বাড়ান না হোসনে আরা। দাম মেটানোর আগে বলেন, চাচা সুমনের জন্য একটা চকলেট দ্যান। চকলেট দিয়ে আবুল বলেন, দাম লাগব না।

লাগব না ক্যান?

একটা চকলেটই তো, এ আর এমন কী?

মহল্লার প্রায় সবাই জানে রাষ্ট্রপতির ছোট ছেলে রাসেলের বন্ধু সুমন। সে কারণে সবাই তাকে একটু খাতির করতে চায়। সুমন এসব বোঝে না। কেউ চকলেট বা আইসক্রিম খাওয়ালে খুশি হয়। কয়দিন আগে হোসনে আরা সুমনকে বলেছেন, কেউ কিছু দিলে নিতে হয় না।

তুমিও তো দাও।

এই গাধা, আমি কি তোর কেউ?

না তুমি আমার বুবু।

হেসে ওঠেন হোসনে আরা। বলেন, তুই আমার সব রে সুমন।

ওআইসি সম্মেলনের দিনক্ষণ আগে থেকেই ঠিক করা ছিল।

মুসলিম দেশগুলো চাইল, শেখ মুজিবুর রহমান যেন লাহোরে আসেন। তাই বঙ্গবন্ধুকে রাজি করাতে ঢাকায় এলেন সাত মুসলিম দেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রীরা। দলে প্রতিনিধিত্ব করছেন কুয়েতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী শেখ সাবাহ আল জাবের। তারা ঢাকায় এসে রাতভর বৈঠক করলেন।

২২ ফেব্রুয়ারি সকালে পররাষ্ট্রমন্ত্রীরা লাহোরে চলে যান। সেখানে পাকিস্তানের ক্ষমতাসীন দলের নেতাদের সঙ্গে বসলেন। দিন শেষে সন্ধ্যার পর বসলেন প্রাদেশিক গভর্নর এবং আইন পরিষদের যৌথ সভায়। এই বৈঠকের পর জুলফিকার আলী ভুট্টো বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়ার ঘোষণা করেন। তখন বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকে বলা হয়, ওআইসি সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমান যোগ দেবেন।

আলজেরিয়ার প্রেসিডেন্ট বুমেদিনের বিমানে চেপে বঙ্গবন্ধু লাহোরে পৌঁছলেন। লাহোর বিমানবন্দরে এই প্রথমবার 'আমার সোনার বাংলা' বাজল। জাতীয় সংগীত গাওয়ার সময় পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর প্রধান জেনারেল টিক্কা খান মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে থাকলেন। এখানে এখন উচ্চপর্যায়ের সেনা কর্তাদের অনেকেই আছেন।

বঙ্গবন্ধু বললেন, এদের মধ্যে এমন একজন আছেন, আমাকে জেলের মধ্যে হত্যা করার ষড়যন্ত্র থেকে বাঁচিয়েছেন।

লাহোর থেকে দেশে ফিরে অসুস্থ হয়ে পড়েন।

মুখ দিয়ে রক্ত পড়ছিল। ব্যক্তিগত চিকিৎসক নুরুল ইসলাম বললেন, উন্নত চিকিৎসার জন্য সোভিয়েত ইউনিয়ন যাওয়া দরকার। কয়েক দিন পর চিকিৎসার জন্য মস্কো গেলেন। অস্ত্রোপচার না করেই কিছুটা সুস্থ হয়ে উঠলেন। সোভিয়েত নেতা ব্রেজনেভ ও কোসিগিনের সঙ্গে কথা হলো।

কনকনে ঠান্ডা দেশ থেকে ফেরার পথে দিল্লিতে তিন দিন কাটালেন। ফিরে আসার দিন পালাম বিমানবন্দরে ছুটে এলেন ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী। কিছুসংখ্যক সাংবাদিক হাজির। তারা নানা প্রশ্ন করতে থাকলে ইন্দিরা গান্ধী বললেন, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন না? উনি অসুস্থ।

১৭ অক্টোবর জাপান সফর করার সময় চাইলেন যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশের জন্য আর্থিক সহযোগিতা এবং সেখানে যমুনা সেতু প্রকল্পে জাপানের সাহায্যপ্রাপ্তির বিষয়ে আলোচনা হয়। সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয় পশ্চিম জার্মানি, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া ও ফ্রান্স। সদয় হয় জাতিসংঘ।

পল্টন ময়দানের জনসভায় ভাসানী বললেন, 'দ্যাশের অর্থনীতি ধ্বংস করার জন্য ভারত জালনোট ছেড়েছে।' অথচ বাস্তবে দেখা গেল, সরকার ঘোষিত ভারতীয় নোট জমা হয় ইস্যু করা ৫৩ লাখ ৫৪ হাজার ৪৮০ টাকার কম। তাহলে গুজবের নোটগুলো কোথায়?

এই সময় মওলানা বলতে থাকলেন, 'একদিকে দুর্ভিক্ষে মানুষ মরছে, অন্যদিকে রেডক্রসপ্রধান গাজী গোলাম মোস্তফার গরুর খামারে গোখাদ্য হিসেবে ব্যবহার হচ্ছে ত্রাণের খাদ্য।' সত্যটা হলো, গাজী গোলাম মোস্তফার কোনো খামার ছিল না।

১৯৭২ সালের শেষ প্রান্তে ঢাকা শহর ছেয়ে গেল বঙ্গবন্ধু-সরকারবিরোধী পোস্টারে। আজ সকালে অফিসে যাওয়ার সময় হোসনে আরা বাসস্ট্যান্ডে এক দেয়ালের পাশে কয়েকজন শ্রমিক শ্রেণির লোকের জটলা দেখতে পান। উঁকি দিয়ে বুঝলেন, তারা একটি পোস্টার পড়ার চেষ্টা করছে। এক পা দুই পা করতে করতে কাছে গিয়ে দেখলেন, এই পোস্টার সর্বহারা দলের।

হঠাৎ অঘটন ঘটল।

১৫ ডিসেম্বরের মধ্যরাত। শহরবাসী এখন ঘুমের তলায়। বঙ্গবন্ধুর বড় ছেলে শেখ কামাল তার বন্ধুদের নিয়ে একটি মাইক্রোবাসে ঘুরতে বের হন। এদিকে সিরাজ শিকদারের খোঁজে হন্যে হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে ঢাকা স্পেশাল ব্রাঞ্চের পুলিশ সুপার মাহবুব।

মতিঝিল এলাকায় একটা টয়োটা কারে তল্লাশি করছে মাহবুবের লোকজন। তল্লাশি দলের প্রধান সার্জেন্ট কিবরিয়া। কামালের মাইক্রোবাস চলে এসেছে কাছাকাছি। টহল পুলিশ ভাবল, ওই মাইক্রোবাসে সিরাজের লোকজন আছে।

মতিঝিল বাংলাদেশ ব্যাংকের কাছে এসে পুলিশের স্কোয়াড শেখ কামালের মাইক্রোবাস আক্রমণ করে। একটা গুলি এসে লাগল কামালের পায়ে। গলার পাশ দিয়ে যাওয়া একটা গুলি চামড়া ছিঁড়ে নিয়ে যায়। ফিনকি দিয়ে রক্ত বের হতে থাকে।

এতক্ষণে কামাল ও তাঁর বন্ধুরা বুঝে গেছেন ওরা সিরাজ শিকদারের লোক নয়, পুলিশ। মাইক্রোবাস থেকে নেমে কামাল চিৎকার করে বলতে থাকলেন, গুলি করবেন না, আমি শেখ কামাল।

গুলি বন্ধ হলো।

কয়েকজন পুলিশ ধরাধরি করে কামালকে নিয়ে যায় পিজি হাসপাতালে। শীতের রাত। পুরু কাপড়ের শার্ট আর জ্যাকেট রক্তে একাকার। সার্জেন্ট কিবরিয়া ভয়ে জড়োসড়ো। ঠকঠক করে কাঁপছেন। এবার প্রাণে বাঁচবেন না। কারণ, তাঁর গুলিতে রাষ্ট্রপতির ছেলে আহত। একটা উপায় বের করতে সোজা চলে গেলেন ঢাকার ডেপুটি কমিশনার আবুল হায়াতের বাসায়। রাত এখনো অবশিষ্ট।

আবুল হায়াত ফজরের নামাজ পড়ে বারান্দায় বসে চা পান করছেন। এমন সময় কিবরিয়া হাজির। বাংলাদেশ ব্যাংকের সামনে ঘটে যাওয়া সবকিছু জানালেন। পিজি হাসপাতালে ফোন করে নিশ্চিত হলেন, কামাল এখন শঙ্কামুক্ত।

সকালের আলো ফুটেছে। সার্জেন্ট কিবরিয়াকে নিজ কাজে যোগ দিতে বললেন ডেপুটি কমিশনার আবুল হায়াত। তিনি রেডি হলেন রাষ্ট্রপতির বাসায় যেতে। পড়ার ঘরে বসে রাতের সব ঘটনা শুনলেন বঙ্গবন্ধু। বেরিয়ে আসার সময় হায়াত জানতে চাইলেন, এ বিষয়ে পুলিশের কী করা দরকার? উত্তরে বললেন, 'কিছু করতে হবে না, তারা যা করছিল তা-ই করবে।'

রাষ্ট্রপতির বাসভবন থেকে ফিরে এলেন হায়াত। এই ঘটনায় ছেলে কামালের ওপর বঙ্গবন্ধু এতটাই ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন যে, দুই দিন পর্যন্ত ছেলেকে দেখতে যাননি।

সমাজে ভাইরাস ছড়াতে থাকল বিরোধীরা।

বঙ্গবন্ধু সরকারের দ্বিতীয় বছর।

কিছুদিন আগে সংবিধান তৈরি হয়ে গেছে। খবরের কাগজ হাতে নিয়ে অনেকক্ষণ বসে থাকেন হোসনে আরা। খুন, লুটপাট, পাটের গুদামে আগুন। এ রকম খবরে ঠাসা থাকে সংবাদপত্র। হোসনে আরার ভাবনা বাড়ে। অফিস থেকে বেরোবার আগে পিয়ন ফজলু মিঞা মন খারাপের খবরটা দেয়।

আপা শুনেছেন?

কী?

মিছিলে নাকি গুলি হইছে? ছাত্ররা মারা গেছে?

কোথায়?

বেশি কিছু শুনি নাই। নিচের দোকানদার বলল।

টেবিলের ওপর পানির গ্লাস রেখে চলে যায় অফিস পিয়ন। কী ঘটল? অফিসের দুজনের কাছে জানতে চান হোসনে আরা। কেউ স্পষ্ট করে বলতে পারল না। বিকেলে বাসায় ফেরার সময় খবরটা বাসে শুনলেন। সামনের সিটে বসা দুজন গল্প করছিল।

ভিয়েতনাম যুদ্ধে মার্কিন নৃশংসতার বিরুদ্ধে ছাত্ররা প্রতিবাদ করছিল। ঢাকার মার্কিন তথ্যকেন্দ্র ও লাইব্রেরির সামনে জড়ো হয় অনেক ছাত্র-জনতা।

পরিকল্পনা ছিল প্রতিবাদ জানিয়ে ছাত্ররা চলে যাবে। এমন সময় মিছিলের ভেতর থেকে কয়েকজন ইট ছুড়ে মারে। তেড়ে আসে পুলিশ। বাধে সংঘর্ষ। ছড়িয়ে পড়ে ছাত্র-জনতা। পুলিশ গুলি চালায়। দুইজন ছাত্রের প্রাণ যায়। আহত হয় ছয় জন। স্বাধীন দেশের প্রথম রক্তপাতের খবর ছড়িয়ে পড়ল দেশ-বিদেশে। এই ঘটনায় বামপন্থি ছাত্রসংগঠনগুলো হরতালের ডাক দেয়। বিচার বিভাগীয় তদন্তের নির্দেশ দেয় সরকার।

তিন মাস পর। জাতীয় নির্বাচনে জয়ের জোয়ারে ভেসে চলল আওয়ামী লীগ।

৭০ শতাংশ ভোট পড়ল নৌকা মার্কায়। ২৯৯ আসনের মধ্যে ২৯৪ আসন হাতে। প্রতিষ্ঠার পাঁচ মাসের মাথায় ২৩৭টি আসনে প্রার্থী দিয়ে আলোচনায় জাসদ। ভাসানী-ন্যাপ বঙ্গবন্ধু সরকারবিরোধী আন্দোলনের ঘোষণা দিয়ে বিশেষ কিছু করতে পারল না। নেতা ও কর্মীদের রাজনৈতিক দর্শন সম্পর্কে এদের পরিষ্কার ধারণা ছিল না। একমাত্র উদ্দেশ্য সরকার উৎখাত। তবে আওয়ামী লীগের বিপুল বিজয়ের পর কিছুদিনের জন্য গা-ঢাকা দিল চীনাপন্থি বামেরা।

নির্বাচনে বিজয়ের খবর শুনে হোসনে আরা মহা খুশি। বিকেলে ৩২ নম্বরে যান হোসনে আরা। মানুষের ভিড়ে পা ফেলার জায়গা নেই। বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে দেখা হলো না।

এই নির্বাচন সম্পর্কে নোটবইয়ে সুমন লিখে রেখেছে, নির্বাচনের ফলাফলে অশুভ ইঙ্গিত ছিল। এই কথার মানে আমি বুঝতে পারি না। বছরখানেক আগে জানতে চাই, বিপুল বিজয়ের অশুভ ইঙ্গিতটা কেমন? সুমন জানায়, এই নির্বাচনে ক্যান্টনমেন্ট এলাকায় ৮৩ দশমিক ২১ ভাগ ভোট পড়েছিল আওয়ামী লীগের বিপক্ষে।

তাই? আমার বিস্ময় বাড়ে।

যারা বিরোধিতা করে তারা সবাই মুক্তিযুদ্ধে লড়েছেন।

এমনটা হলো কেন?

এখন সময় নেই। ইমেইলে একটা লেখা পাঠাব।

কী সেটা, কার লেখা?

অ্যান্থনি মাসকারেনহাসের সঙ্গে জিয়া এবং মঞ্জুরের সাক্ষাৎকার।

একদিন পর সুমন লেখাটা পাঠায়।

সেনাবাহিনী সম্পর্কে জিয়া বলেছেন, 'আমরা সত্যিকার অর্থে কোনো সেনাবাহিনী ছিলাম না। কাগজপত্রে আমাদের কোনো অস্তিত্বই ছিল না। সেনাবাহিনীর জন্য আইনগত কোনো ভিত্তিই ছিল না। টেবল অব অর্গানাইজেশন অ্যান্ড অ্যাস্টাব্লিশমেন্ট বলে কোনো কিছু ছিল না। সবই ছিল এডহক। সেনাবাহিনী বেতন পেত। কারণ, শেখ মুজিব তা দিতে বলেছিলেন। মুজিবের কথার ওপর আমাদের অস্তিত্ব নির্ভরশীল ছিল। আমাদের ছেলেরা নরকের যন্ত্রণায় ভুগছিল। কিন্তু তারা মুখ ফুটে কোনো অভিযোগ করেনি। কারণ, এরা দেশসেবায় নিয়োজিত ছিল এবং প্রয়োজনে এরা জীবন উৎসর্গ করতেও প্রস্তুত ছিল।'

অ্যান্থনিকে মঞ্জুর বলেছেন, 'সেনাবাহিনী ছিল স্বেচ্ছাসেবক দলের মতো। আমাদের অফিসার এবং জোয়ানরা সৈনিক হিসেবে তাদের ভবিষ্যৎ গড়তে চায় বলে তাদের স্বেচ্ছাসেবক হিসেবেই কাজ করতে হচ্ছে। বিনিময়ে তারা কী

পেয়েছে? প্রত্যেকেই এরা হতভাগ্য। এদের খাবার নেই। গায়ের কোট নেই। পায়ে দেয়ার বুট পর্যন্ত নেই। শীতের রাতে কম্বল গায়ে দিয়ে পাহারা দিতে হয়। আমাদের অনেক সিপাহি লুঙ্গি পরে কাজ করছে। তাদের কোনো ইউনিফর্ম নেই। পুলিশ আমাদের লোকদের পেটাত। পাকিস্তান থেকে প্রত্যাগত সরকারি আমলারা সেনাবাহিনীকে ঘৃণার চোখে দেখত। একবার আমাদের কিছু ছেলেকে মেরে ফেলা হলো। আমরা মুজিবের কাছে গেলাম। মুজিব কথা দিলেন, তিনি ব্যাপারটি দেখবেন। পরে তিনি আমাদের জানালেন, ওই ছেলেরা কোলাবরেটর ছিল বলে মেরে ফেলা হয়েছে। সেনাবাহিনীকে ধ্বংস করার জন্য মুজিব সকল পন্থাই কাজে লাগিয়েছেন। জীবনের জন্য হুমকি হয়ে দাঁড়াতে পারে, এমন কাউকে সন্দেহ হলেই সেখানে ভাঙন ধরিয়ে দিতেন। একমাত্র মুজিব সেনাবাহিনীতে ভাঙন ধরিয়ে টুকরো টুকরো করে ফেলেছিলেন।'

সেনাবাহিনীর উচ্চপদের এই দুজনের মন্তব্য বলে দেয়, ১৯৭৩ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগে ভোট কম পড়ার কারণ।

অনেক রঙের গুজব তখন বাতাসে ভেসে বেড়াচ্ছে। সাধারণ সৈন্যদের মধ্যে বলাবলি হচ্ছে, বঙ্গবন্ধু ছেলে জামালকে সেনাবাহিনীর উচ্চ পদের জন্য তৈরি করছেন।

মাসকারেনহাসকে মঞ্জুর বলেন, 'জামালকে আর্মিতে ঢুকিয়ে উপযুক্ত প্রশিক্ষণের জন্য ইয়োগোশ্লাভ মিলিটারি একাডেমিতে পাঠিয়ে দেন। ওখানকার পড়াশোনায় কুলোতে না পেরে মুজিবকে দারুণভাবে হতাশ করে সে ঢাকায় ফিরে আসে। এরপর মুজিব তাকে বিলেতের স্যান্ডহার্স্ট মিলিটারি একাডেমিতে পাঠাতে চাইলেন। একদিন সেনাপ্রধানকে ফোন করে জানান, জামালকে স্যান্ডহার্স্টে ক্যাডেট হিসেবে পাঠানোর ব্যবস্থা করেন। এতে পরিস্থিতি আরো জটিল হয়ে যায়। নানাভাবে যোগাযোগ করে ছয় হাজার পাউন্ড ফি নিয়ে বিশেষ ব্যবস্থায় জামালকে তারা নিতে রাজি হয়।' মঞ্জুরের মতে, এই টাকা অর্থ মন্ত্রণালয়ের অজ্ঞাতে গোপনীয়ভাবে আর্মি চ্যানেলে পাঠানো হয়েছিল।

১৬ মার্চ প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব নিলেন বঙ্গবন্ধু।

হাতে রাখলেন চারটি দফতর। ক্যাবিনেটবিষয়ক, প্রাতিষ্ঠানিক বিভাগ, দেশরক্ষা ও পরিকল্পনা।

শুরু হলো দেশ গড়ার নতুন সংগ্রাম।

৬ সেপ্টেম্বর গেলেন আলজিয়ার্সে, গেলেন জোটনিরপেক্ষ সম্মেলনে যোগ দিতে। এই সময় সিআইএ ছদ্মবেশে লোক পাঠায়। ঢাকায় এলেন পিটার জোসেফ

মারিয়া কাসটারাস। বাড়ি হল্যান্ড। যুবক পিটার সিআইএর ভাড়াটিয়া কর্মী। রিলিফ কর্মীর পরিচয়ে ঢাকা এসে প্রথম কোন কাজ শুরু করলেন পিটার? একটু পরে আসছি সে কথায়।

১১ জুলাই মার্কিন দূতাবাসে গেলেন রশিদ। তাকে আপ্যায়ন করা হলো। দূতাবাস কর্মকর্তাকে রশিদ বললেন, 'বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর জন্য অস্ত্র কিনতে এসেছি।' পরদিন যান ফারুক রহমান। দুজন জানিয়ে আসেন, 'সেনাবাহিনীর জন্য অস্ত্র কিনতে আরমানেন্টস প্রকিউরমেন্ট কমিটি গঠন করা হয়েছে। কমিটির চেয়ারম্যান ব্রিগেডিয়ার জিয়াউর রহমান।'

আরব-ইসরাইল যুদ্ধ চলছে। মুসলমান-ইহুদির লড়াই।

আরবদের সাহায্য করার জন্য বঙ্গবন্ধু কিছু দিতে চান। সিনিয়র মন্ত্রীরা জড়ো হলেন অফিস কক্ষে। সবার মত জানতে চাইলেন। নানাজন নানা কথা বললেন। আবদুর রব সেরনিয়াবাত বললেন, চা পাঠালে কেমন হয়? শুনে খুশি সবাই। বন্ধুত্ব আর মৈত্রীর স্মারক হয়ে বিমানে চেপে সিলেটের চা গেল মিশর। মিশরের প্রেসিডেন্ট আনোয়ার সাদাত উন্নত মানের চা আনন্দের সাথে গ্রহণ করলেন।

এই উপহার পেয়ে আনোয়ার বাংলাদেশকে কিছু দিতে চাইলেন। মনে পড়ল, মরুভূমির বালির ভেতর দাঁড়িয়ে রোদে হেঁচকি তুলছে এক ঝাঁক ট্যাংক। এই ঝাঁক থেকে টি-ফিফটি ফোর ট্যাংক উপহার দিতে চান। ৩০টি ট্যাংকের সঙ্গে আসবে ৪০০ রাউন্ড গোলা। উপহারের এই প্রস্তাবে বঙ্গবন্ধু খুশি হলেন না। মন ভার হলো। মন্ত্রিপরিষদের বৈঠকে বললেন, বাংলাদেশে এসবের আর দরকার নেই।

অফিসে বসে কথাগুলো বলার পর সামনে রাখা গ্লাসের সবটুকু পানি পান করলেন। নাছোড় বাণিজ্যমন্ত্রী মোশতাক। বৈঠক শেষে অফিসে এসে বোঝালেন, ট্যাংক ফেরত পাঠালে আরব বিশ্বের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক খারাপ হতে পারে।

শেষ পর্যন্ত ট্যাংকগুলো নেয়ার সিদ্ধান্ত হলো। মিশর থেকে এলো ৩০টি টি-ফিফটি ফোর ট্যাংক। আগের ছিল তিনটা। সব মিলিয়ে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর হাতে এখন ৩৩টি ট্যাংক। সেনাবাহিনীর পক্ষ থেকে মিশরের উপহার পাঠানো ট্যাংক গ্রহণ করলেন মেজর সৈয়দ ফারুক রহমান। দেশে তিনি একমাত্র ট্যাংকবিশারদ। ফারুক হয়ে গেলেন ট্যাংক বাহিনীর প্রধান।

কয়েক দিন পর বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে দেখা করলেন ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থা র-এর প্রধান কাউ। বঙ্গবন্ধু বললেন, আপনারা কি ট্যাংকগুলো বিকল করে দিতে পারেন?

এসব নষ্ট করার দরকার কী?

আমার এসব দরকার নেই। ট্যাংক দিয়ে দৈত্য বানাতে চাই না।

কাউ বললেন, একটা বিকল্প উপায় আছে।

সেটা কী?

ট্যাংক থাকুক ঢাকায়, গোলাগুলো রাখুন দূরে, গোলা ছাড়া ট্যাংক অচল। বিকেলে সেনাপ্রধানকে ফোনে নির্দেশ দিলেন বঙ্গবন্ধু। ট্যাংকের গোলা জয়দেবপুরে গোপন জায়গায় রাখুন। কেউ যেন টের না পায়।

১৯৭৪ সালের ১৭ মার্চ। বঙ্গবন্ধুর জন্মদিনে সারা দেশ অস্থির করে তুলল জাসদ।

পল্টন ময়দানে জলিল আর রব গরম বক্তৃতা ছাড়লেন। এই বক্তৃতার পর জাসদের ছেলেপুলেরা অগ্নিমূর্তি ধারণ করে। বিরাট মিছিল নিয়ে এগিয়ে যায় মিন্টো রোডের দিকে। মিছিলের সামনে রব, জলিল এবং ইনুসহ অন্তত কয়েক হাজার কর্মী। মিছিলে হাঁটা অনেকের কাঁধের ব্যাগে হাতবোমা, কারো শার্টের তলায় পিস্তল। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর বাড়ির সামনে পর পর কয়েকটা বোমা ফাটায়। তিনি বাড়িতে নেই। গেছেন কেরানীগঞ্জের জনসভায় ভাষণ দিতে। জাসদের ছেলেরা বাড়ির গেটে আগুন জ্বালিয়ে দেয়। এমন সময় এখানে হাজির হয় আট ট্রাক বোঝাই পুলিশ এবং রক্ষীবাহিনীর সদস্য। শুরু হয় গোলাগুলি। গুলি খেয়ে পড়ে যান ইডেন মহিলা কলেজের ছাত্রী মুকুল দেশাই। ইনু চিৎকার করে জানিয়ে দেন, সবাই শুয়ে পড়ো।

রব, জলিল এবং ইনুসহ অনেকে শুয়ে পড়েছেন। আবার অনেকে দৌড়ে জীবন বাঁচানোর চেষ্টা করছেন। রবের পাশে পড়ে থাকা জাহাঙ্গীর গুলি খেয়ে ছটফট করতে করতে মারা যান। আহত হলেন রব, জলিল, বেগম মমতাজ এবং মাঈনুদ্দীন খান বাদল। এদের সবাইকে আটক করা হয়। পরদিন সরকারি প্রেস নোটে বলা হয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর বাসভবনে হামলা করার সময় তিনজন নিহত এবং ১৮ জন আহত হয়েছেন। তবে জাসদ দাবি করে অন্তত ৫০ জন নিহত হয়েছেন। গণকণ্ঠ অফিসে আগুন দেয় ছাত্রলীগের ছেলেরা। এই আগুনের আঁচ ছড়িয়ে পড়ল সারা দেশে।

কয়েক দিন পর, ৫ এপ্রিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে দলীয় কোন্দলে প্রাণ হারান সাত জন ছাত্রলীগ কর্মী।

সূর্যসেন হল থেকে সাত জনকে ধরে এনে মুহসীন হলে টিভি রুমের সামনে হাত-পা দড়ি দিয়ে বেঁধে ব্রাশফায়ার করে খুন করা হয়। ছাত্রলীগের গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব চরমে ওঠার ফল। যারা খুন হলেন তারা সবাই শেখ মনির সমর্থক।

শফিউল আলম প্রধান আওয়ামী লীগের ছাত্রসংগঠন ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক। লম্বা গড়ন। মুখে গোঁফ। রহস্যজনক চলাফেরা। দলীয় ছাত্রসংগঠনকে দাঁড় করালেন আওয়ামী লীগের প্রধান প্রতিপক্ষের চেহারায়। কথায় কথায় শফিউল বলেন, 'আওয়ামী লীগের নেতারা দুর্নীতি করে টাকার পাহাড় গড়ছেন। আর না খেয়ে দেশের মানুষ মরছে।'

আওয়ামী লীগের ১৪ জন নেতার সম্পদের হিসাব লিখে ইশতেহার প্রকাশ করেন শফিউল। এসব করে থামলেন না, পল্টন ময়দানে সরকারের মন্ত্রী ও দলের নেতাদের বিরুদ্ধে জনসভা করলেন। তবে শফিউলের বিরুদ্ধে কেউ কোনো কথা বললেন না। বিরোধী দলের চেয়ে বঙ্গবন্ধু সরকারের বেশি ক্ষতি করল ছাত্রলীগ।

অফিস শেষে পুরান ঢাকায় এক সহকর্মীর বাসায় বেড়াতে যান হোসনে আরা।

এখন রাত সাড়ে নয়টা। রিকশায় ফিরছেন। আগামসি লেনের মোশতাকের বাড়ির সামনে এসে চোখ পড়ল গেটের দিকে। বাড়ির ভেতর থেকে বেরিয়ে আসতে দেখলেন শফিউলকে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রলীগ কর্মীদের খুনের দিন বঙ্গবন্ধু মস্কো ছিলেন। শরীরটা ভালো যাচ্ছে না। ঢাকায় ফিরে পুলিশকে নির্দেশ দিলেন আজই শফিউলকে গ্রেপ্তার করো। দুই ঘণ্টার মধ্যে আটক হলেন ছাত্রলীগ নেতা শফিউল আলম প্রধান। পরদিন তোলা হলো আদালতে।

পুরান ঢাকার আদালত চত্বর। গিজগিজে মানুষ। সবাই ছাত্র। বেশিরভাগ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আর জগন্নাথ কলেজের। ছাত্রলীগের ছেলেরা স্লোগান দিল, খুনি মুজিবের ফাঁসি চাই।

পরদিন এই স্লোগানের খবর ছাপা হলো সংবাদপত্রে। হতবাক দেশের মানুষ। অফিসে কোনো কাজ করতে পারছেন না হোসনে আরা। শঙ্কা ধাক্কা দিচ্ছে। ভাবছেন, শফিউল আসলে কার হয়ে কাজ করছেন? বঙ্গবন্ধুর সম্মান নষ্ট করতেই কি তিনি দলে ভিড়েছেন? কীভাবে এমন একজন ছাত্রসংগঠনের সর্বোচ্চ পদ পেলেন? তার পেছনের শক্তিটা আসলে কার? মোশতাকের বাসায় ঘন ঘন যাতায়াত কেন?

হোসনে আরার মাথার ভেতর দৌড়াদৌড়ি করে এরকম অসংখ্য প্রশ্ন। আসলে কে এই শফিউল? বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডের সময় জেলে ছিলেন। জিয়াউর রহমান ক্ষমতায় বসার পর বিশেষ মার্জনায় বেরিয়ে আসেন। জেল থেকে বেরিয়ে সোজা চলে যান সিরাজ শিকদারের কবর জিয়ারত করতে।

জাসদ গণবাহিনীর প্রতি জনসমর্থন ছিল না।

নেতারা আত্মগোপনে থেকে সশস্ত্র বাহিনী গঠন করে। অভাব-অনটনে দেশ কাঁপছে। এরকম সময় সিনিয়র কর্মকর্তাদের বেতন কমানোর সিদ্ধান্ত নেন বঙ্গবন্ধু। সমাজতান্ত্রিক চিন্তাধারা থেকে এই ভাবনার উদয়। সাধারণ মানুষরা খুশি। কর্মকর্তারা অসন্তুষ্ট।

বাংলার আকাশে এগিয়ে আসছে মেঘ। খুব খারাপ সময়ের ভেতর আটকে যায় ছাপান্ন হাজার বর্গমাইলের মানচিত্র। আমেরিকা থেকে উড়ে এলেন ডেভিস ইউজিন বোস্টার। ঢাকার মার্কিন দূতাবাসের দায়িত্ব নিয়ে। হাসি মুখ। তবে এই হাসি প্রাণবন্ত নয়। দেখলে মনে হবে পুরোটাই সিনথেটিক।

ঢাকায় এসে নিজের পরিচয়পত্র পেশ করলেন ১৯৭৪ সালের ১৩ এপ্রিল। পরদিন থেকে শুরু হয় হেনরি কিসিঞ্জারের ডান হাত বলে পরিচিত বোস্টারের আসল কাজ। যোগাযোগ হয় মোশতাক গংয়ের সঙ্গে। শুরু হয় বঙ্গবন্ধু সরকার উৎখাতের পরিকল্পনা।

রাজনৈতিক পরিবেশ অস্থির হয়ে উঠল।

পল্টন ময়দানের জনসভায় মওলানা হুংকার ছাড়লেন, মুজিব সরকারকে উৎখাত করতেই হবে। ১৪ এপ্রিল মওলানার ন্যাপ, জাতীয় লীগ, বাংলাদেশ জাতীয় লীগ, বাংলাদেশ গণমুক্তি ইউনিয়ন, বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি (লেনিনবাদী), শ্রমিক কৃষক সাম্যবাদী দল 'ঐক্যজোট' গঠনের ঘোষণা দেয়।

১৯৭৪ সালের ১৩ মে দিনটা ছিল ভ্যাপসা গরমের।

বিকেলে মার্কিন দূতাবাসের কর্মকর্তা গ্রেসামের বাসায় হাজির হন ফারুক। গ্রেসামকে বলেন, উচ্চপর্যায়ের বাংলাদেশ সেনা কর্মকর্তার নির্দেশে মার্কিন সরকারের মনোভাব জানতে এসেছি। দেশে যদি অভ্যুত্থান ঘটানো হয়, তাহলে মার্কিন সরকারের মনোভাব কী হবে? ভারত হস্তক্ষেপ করলে আমেরিকা কি পাশে থাকবে?

বুদ্ধিমান গ্রেসাম স্পষ্ট করে কিছু বললেন না।

জুন মাসে কলকাতা থেকে প্রকাশিত দৈনিক যুগান্তরে ছাপা হলো সাংবাদিক পরেশ সাহার বিশেষ প্রতিবেদন। শিরোনাম 'বাংলাদেশ সরকারের বিপদ আসবে সৈন্যবাহিনীর কাছ থেকে।' পরেশ সাহা জানিয়ে দিলেন বঙ্গবন্ধু ও তাঁর সরকারের বিপদ আসন্ন।

সিআইএর স্টেশনপ্রধান হয়ে ঢাকায় এসেছেন ফিলিপ চেরি। এই খবরে মোশতাক চনমনে হয়ে উঠলেন। রাজা হওয়ার স্বপ্নটা বড় হতে থাকে। ফিলিপ

চেরি মুক্তিযুদ্ধের সময় দিল্লি ও কলকাতায় সিআইএর কাজ করেন। ১৯৭১ সালের জুনে দিল্লি অফিসে যোগ দেন। তখন থেকে মোশতাক ও মাহবুবুল আলম চাষীর সঙ্গে যোগাযোগ।

চেরি ঢাকায় আসায় মোশতাকের বুকের বল বেড়ে যায়। চক্রান্ত পাকা হতে থাকে। মোশতাকের দুই হাত ভালোভাবে কাজ করছে। এক হাত মাহবুবুল আলম চাষী, অন্য হাত করিম।

সিআইএর স্টেশন অফিসার ফিলিপ চেরি এবং ফারুক-রশিদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখছেন করিম। আর দিন শেষে একবার হাজিরা দেন আগামসি লেনে, মোশতাকের বাড়িতে। এই সময় চেরি মারফত গোপন বার্তা পেয়েছেন মোশতাক। বার্তায় বলা হয়েছে মুজিব সরকার আর থাকছে না।

এই আনন্দে ঘন ঘন নামাজ পড়ছেন।

জুনের শেষ সপ্তাহে ঢাকায় এলেন ভুট্টো।

নিজেও ভাবেননি বাংলাদেশে এই রকম বিশাল সংবর্ধনা জুটবে।

ঘুঘু ডাকা দুপুরে তেজগাঁও বিমানবন্দরে হাজির হয় অগণিত মানুষ। সঙ্গে বিশেষ প্রতিনিধিদল। আর গোয়েন্দা বিভাগের উচ্চ পর্যায়ের চার জন। বিমানবন্দর থেকে মোটর শোভাযাত্রা করে নিয়ে এলেন সরকারবিরোধীরা। আনন্দে কাণ্ডজ্ঞান হারিয়ে অনেকে জামা-জুতো ছোড়াছুড়ি করেন। মাত্র আড়াই বছর আগে যার নাম উচ্চারণ হতো ঘৃণার সঙ্গে, সেই ভুট্টো আজ সম্মানিত অতিথি।

ঢাকার নাগরিক সভায় ভুট্টো বললেন 'মহানবীর নামে আমি আপনাদের কাছে তওবা করছি। আমার আগে আপনাদের যারা শাসন করেছে দয়া করে তাদের সঙ্গে আমাকে এক করে দেখবেন না।' ব্যস্ত সময়ের মধ্যেও ইন্টারকন্টিনেন্টাল হোটেলের লবিতে মোশতাকের সঙ্গে বৈঠক করলেন।

কী কথা হলো তাদের? ভুট্টো কি সবুজ সংকেত দিয়ে গেলেন? দরজার বাইরে থেকে 'র'-এর একজন শুনলেন ভুট্টোর শেষ কথা, মসনদে বসার জন্য প্রস্তুত হন।

মুক্তিযুদ্ধে গণহত্যায় ভুট্টোর বিশেষ ভূমিকা, অথচ লোকটা কোথাও গণহত্যা শব্দ উচ্চারণ করলেন না। এই সময় মওলানা শুরু করলেন ভারতবিরোধিতা।

তিনি কি ভুলে গেলেন, মুক্তিযুদ্ধের সময় তাকে আশ্রয় দেয়ার ঘটনা? বাংলাদেশের স্বাধীনতার জন্য ১৪ হাজার ভারতীয় সেনার আত্মত্যাগ? এসব ভাবতে ভাবতে অফিস থেকে ফিরছিলেন হোসনে আরা। অফিসে আসা-যাওয়ার সময় নানা কিছু ভাবনা-চিন্তা মাথার ভেতর ঘুরপাক করে।

বর্ষাকাল। হঠাৎ বৃষ্টি শুরু হয়। কিছুক্ষণের মধ্যে মেঘ এসে সারা আকাশ দখল করে। বৃষ্টি ভালো লাগছে না হোসনে আরার। রোদের তাপে নাজেহাল হওয়ার পর ঠান্ডা বাতাসের বৃষ্টিতে দাঁড়ালে ভালোই লাগে।

যদিও বর্ষা ভয়ংকর হয়ে তালগোল পাকিয়ে দেয়। বৃষ্টির ঝড়ে ডালপালা ভাঙে। ভাঙে পাখির বাসা। ফুটপাতে পলিথিনের অসহায় ছাদগুলো দেখতে দেখতে বাসায় চলে আসে। বারান্দায় দাঁড়ায়। এখন বৃষ্টি কমেছে। তবে গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টির ছাট এসে পড়ছে মুখের ওপর।

হাত বাড়িয়ে পানি ধরে হোসনে আরা। যেন এ জীবনে কোনোদিন পানি ছুঁয়ে দেখেনি। পানির ধারায় আশপাশের বাড়িগুলো ঝাপসা লাগে। বৃষ্টির পানি গড়িয়ে পড়ছে জানালার শার্সি বেয়ে, দেয়াল বেয়ে। একটা সুতো ছেঁড়া ঘুড়ির কঙ্কাল টেলিফোনের তারে ঝুলছে।

সন্ধ্যা হয়ে আসছে। রাস্তার লাইটপোস্টের আলোতে বৃষ্টিধারা ঝাপসা হয়ে আছে। গাড়ির হেডলাইট মাঝেমধ্যে ঝলসে দিচ্ছে বৃষ্টির শরীর।

বৃষ্টি থেকে বন্যা। দেশের বেশ কিছু এলাকা পানির তলায় চলে যায়। প্রাণ হারায় অসংখ্য মানুষ। ভেসে যায় হাজার হাজার গবাদিপশু। তলিয়ে গেল ক্ষেতের ফসল, মাঠ আর হাজার হাজার বসতবাড়ি।

বিপন্ন মানুষদের আহাজারিতে ভারি হয়ে ওঠে বাতাস। ঢাকার সঙ্গে উত্তরাঞ্চলের সড়ক ও ট্রেন যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন। গণভবনে ত্রাণকেন্দ্র খোলা হয়। ১৯৭৪ সালের ১৮ আগস্ট বঙ্গবন্ধু রেডিও-টেলিভিশন ভাষণে সাহায্য চাইলেন। ঘুরে দেখলেন বানভাসি মানুষের হাহাকার। নিত্যপণ্যের দাম সাধারণ মানুষের নাগালের বাইরে চলে যায়।

বিভিন্ন আন্তর্জাতিক দাতা সংস্থার সাহায্য চাইলেন বঙ্গবন্ধু।

সাড়া দেয় অনেকে।

খাদ্য সাহায্য কিছু এল, তবে তা প্রয়োজনের তুলনায় অনেক কম।

বাংলাদেশ যখন সংকটে হাবুডুবু খাচ্ছে তখন আমেরিকা প্রতিশ্রুত সাহায্য ইচ্ছা করে দেরিতে পাঠায়। এই ফাঁকে দুর্ভিক্ষ দরজা দিয়ে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করছে। রওনা হয়ে আমেরিকার জাহাজ দুটি বাংলাদেশে এল না। ওয়াশিংটন জানায়, শত্রুর সঙ্গে বন্ধুত্ব করেছে বাংলাদেশ। তাই আমরা খাদ্য সাহায্য করছি না।

তাদের শত্রু বলে পরিচিত কিউবায় কিছু পণ্য রপ্তানি করেছিল বাংলাদেশ। এটাই কি অপরাধ?

সিআইএর খাদ্য-রাজনীতির শিকার হয় দেশের মানুষ। প্রাণ গেল হাজার হাজার মানুষের।

সংকট হতে পারে, এটা আগেই টের পেয়েছিলেন বঙ্গবন্ধু।

গত বছর পহেলা আগস্ট ওয়াশিংটনে মার্কিন পররাষ্ট্র সচিব উইলিয়াম রজার্সের সঙ্গে অর্থমন্ত্রী তাজউদ্দীন বৈঠক করেন। এক মাস পর পরিকল্পনা কমিশনের ডেপুটি চেয়ারম্যান নুরুল ইসলাম ও মার্কিন সাহায্য সংস্থার সহকারী প্রশাসক মরিস উইলিয়ামের মধ্যে বৈঠক হয়। বাংলাদেশ থেকে বারবার বলা হলো, আমরা বিপদে আছি, খাদ্য সাহায্য দরকার। এই আবেদনে আমেরিকার মন গলে না।

দুর্ভিক্ষের পেছনে মজুদদাররা অনেক দায়ী। সময়মতো বাজারে খাদ্যশস্য ছাড়ল না। বঙ্গবন্ধু নির্দেশ দিলেন লঙ্গরখানা খুলে মানুষের ক্ষুধা মেটাতে।

পাঁচ হাজার ৮৬২টি লঙ্গরখানা খোলা হলো। তবে তা দিয়ে লাখ লাখ মানুষের ক্ষুধা মিটল না। ত্রাণসাহায্য কিছু জোগাড় হলো। তা ঠিকঠাক পৌঁছল না অভাবী মানুষের দরজায়। সবই হয়ে গেল রাক্ষুসের গ্রাস। অনেক পরে আমেরিকা খাদ্য পাঠানোর সংকেত দেয়। দুই মাস পরে জাহাজ ভিড়ল চট্টগ্রাম বন্দরে। ততক্ষণে অনাহারী মানুষের মৃত্যু থেমেছে।

১৯৭৪ সালের ১১ সেপ্টেম্বর ঘোড়াশাল সার কারখানার কন্ট্রোল রুম বিস্ফোরক দিয়ে উড়িয়ে দেয়া হয়। ক্ষতি হয় ওই সময়ের হিসাবে প্রায় ১৫০ মিলিয়ন টাকা। এর ফলে প্রায় চার লাখ টন সার কৃষকের হাতে দেয়া গেল না। তদন্ত কমিটির রিপোর্টে বলা হয়, দক্ষ এবং অভিজ্ঞ হাতের কাজ।

খবরের কাগজ পড়ে এসব জানতে পারেন হোসনে আরা। মনে ভয় ঢুকেছে। বিকেলে সুমনকে বলে, এসব কী হচ্ছে সুমন? সুমন উত্তর দেয়, কী হচ্ছে তা কি আমি জানি? সুমনকে বুকের সঙ্গে জড়িয়ে ধরে হোসনে আরা বলেন, সত্যিই তো, এসব তোর জানার কথা না।

মন খারাপের ভেতর একটা ভালো খবর আসে ১৭ সেপ্টেম্বর।

১৯৭৪ সালের এই দিনে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের ১৩৬তম সদস্যপদ পায় বাংলাদেশ। ২৫ সেপ্টেম্বর বঙ্গবন্ধু সাধারণ পরিষদে বাংলা ভাষায় ভাষণ দেন। বাঙালির পাতে প্রথম আন্তর্জাতিক সম্মান পড়ল। বিশ্বনেতাদের সামনে বঙ্গবন্ধু উচ্চারণ করলেন, 'মানবজাতির অস্তিত্ব বজায় রাখতে শান্তি ছাড়া পথ নেই। এটিই হচ্ছে পৃথিবীব্যাপী মানব-মানবীর গভীরতম আকাঙ্ক্ষা।' শান্তির এই বাণী বিশ্ববাসীর অন্তর ছুঁয়ে গেল।

আমেরিকার এ কোন আচরণ? সবাই হতবাক।

সে দেশের প্রথা হলো, কোনো রাষ্ট্রপ্রধান যদি প্রথমবার জাতিসংঘে ভাষণ দিতে আসেন, তাহলে আমেরিকা সরকার হোয়াইট হাউসে আমন্ত্রণ জানায়। বঙ্গবন্ধুর বেলায় তা হলো না। কোনো অভ্যর্থনা জানায়নি। বিদেশ দফতর কেবল ১৫ মিনিটের জন্য হোয়াইট হাউসে প্রেসিডেন্ট ফোর্ডের সঙ্গে সাক্ষাতের ব্যবস্থা করে।

হেনরি কিসিঞ্জার পররাষ্ট্রমন্ত্রী। সম্মানিত বিদেশি অতিথির সঙ্গে সব ধরনের বৈঠকে পররাষ্ট্রমন্ত্রীর থাকার কথা। কিসিঞ্জার ছিলেন না। তা-ই নয়, অতিথির সম্মানে মার্কিন রাষ্ট্রপতি এবং পররাষ্ট্রমন্ত্রী কেউ ভোজসভার আয়োজন করলেন না। একজন নিম্নপদস্থ সাধারণ কর্মকর্তা ভোজসভার আয়োজন করেন। ভীষণ অপমানিত বোধ করলেন বঙ্গবন্ধু। বর্জন করলেন ভোজসভা।

মধ্যদুপুর। অফিসে বসে আছেন বঙ্গবন্ধু। মন ভালো নেই।

ফোনের রিসিভার হাতে নিয়ে ডায়াল করলেন। ওপার থেকে ভারি কণ্ঠস্বর ভেসে এল, কে বলছেন?

স্যার আমি মুজিব।

কেমন আছ জানতে চাই না। দেখতেই তো পাচ্ছি কেমন আছ।

স্যার আপনি ভালো আছেন?

শরীর ভালো। মন ভালো রাখা যাচ্ছে না। খবরের কাগজে যা দেখছি!

আপনাকে একটা অনুরোধ করব?

বলো?

দয়া করে আমার অফিসে একবার আসবেন?

তুমি দয়া শব্দটা বলছ কেন? তোমার প্রতি আমার বিশ্বাস টলেনি।

সাইদুর রহমানকে অত্যন্ত সম্মান করতেন বঙ্গবন্ধু। কলকাতা ইসলামিয়া কলেজে পড়ার সময় তিনি ছিলেন এই কলেজের অধ্যাপক এবং বেকার হোস্টেলের তত্ত্বাবধায়ক। কড়া শিক্ষক বলে ছাত্ররা তাঁকে ভয় করত। আট নম্বর স্মিথ লেনের স্ট্রিটের বেকার হোস্টেলে থাকতেন বঙ্গবন্ধু।

ওই সময় মুসলিম রাজনীতি চর্চার ক্ষেত্র হিসেবে ইসলামিয়া কলেজ এক নম্বরে। ছাত্রদের অনেকে মুসলিম লীগের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করতেন। বেকার হোস্টেল এবং বঙ্গবন্ধুকে জড়িয়ে সাইদুর রহমানের অনেক স্মৃতি। ছাত্ররা যেন ভালোভাবে খেতে পারে, সেজন্য সিস্টেম চালু হয়।

প্রত্যেকের জন্য তরকারির আলাদা পেয়ালা। কোনো দিন মাংস। কোনো দিন মাছ। কারো খাবারে টান পড়লে ডিম দিয়ে তাকে বুঝ দেয়া হতো।

সাইদুর রহমান প্রতিদিন অভিযোগ পেতেন, মুজিব এক পেয়ালার বদলে দুই পেয়ালা নিয়ে খেয়ে ফেলে। তাই প্রতিদিন কারো না কারো টান পড়ে। একদিন পিয়নকে দিয়ে মুজিবকে ডাকলেন।

তুমি নাকি দুজনের তরকারি একাই খেয়ে ফেলো?

জি—

তুমি কি জানো না এটা একটা অপরাধ?

জানি, কাজটা ঠিক নয়। কিন্তু কী করব? এক পেয়ালাতে আমার পোষায় না।

স্পষ্ট এবং বিনয়ী জবাব। সাইদুর রহমান আর কোনো কথা বললেন না। তাঁর মনে পড়ল আমেরিকার প্রথম প্রেসিডেন্ট জর্জ ওয়াশিংটনের কথা। নিঃসংকোচে পিতার কাছে স্বীকার করেছিলেন, চেরিগাছ কাটার কথা। অনেকদিন পর এসব মনে পড়ল সাইদুর রহমানের।

পরদিন বিকেলে সাইদুর রহমান বঙ্গবন্ধুর অফিসে এলেন। দেখামাত্র চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। অফিস ঘরের একপাশে সোফা পাতা। শিক্ষক ছাত্র পাশাপাশি বসলেন।

স্যার কী খাবেন?

কিছু না।

অন্তত এক কাপ চা।

মন্দ হয় না, বলো কেন ডেকেছ?

কোনো কথা না বলে দীর্ঘশ্বাস ছাড়লেন। দুজনই নিশ্চুপ। বেশ কিছুটা সময় গড়ায়। শিক্ষকের আরো কাছে এসে বসলেন। বিপদের দিনে বাবার কাছে যেমন সন্তান গা ঘেঁষে বসে, সে রকম।

স্যার, কোনো কিছুই তো ঠিকঠাক করতে পারছি না।

দেখতেই তো পাচ্ছি। তোমার চারপাশে নষ্ট মানুষের দল।

এদের তাড়ানো যাচ্ছে না। কাজটা শক্ত। তবে পারবই। আপনি দোয়া করবেন।

মন বলছে তুমি পারবে।

একটা উপকারের জন্য আপনাকে স্মরণ করেছি।

সেটা কী?

আমাকে একশ জন ভালো মানুষের তালিকা দেন।

দেশে ভালো মানুষের কি বড়ই আকাল মুজিব?

নিশ্চুপ বঙ্গবন্ধু।

আচ্ছা তখন কি ভালো মানুষের আকাল ছিল? না, তা ছিল না। তবে নষ্টদের ভিড়ে ভালো মানুষদের খুঁজে পাওয়া ছিল শক্ত কাজ। তাই কোনো উদ্যোগ ঠিকঠাক করতে না পেরে কষ্টে পুড়ছিলেন। সে কারণে ১৯৭৪ সালের জুলাই থেকে ১৯৭৫-এর ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত কোনো জনসভায় দাঁড়ালেন না।

১৯৭৪ সালের জুলাই মাস।

বেঙ্গল ল্যান্সারের স্কোয়াড্রন নিয়ে নারায়ণগঞ্জের ডেমরায় এলেন ফারুক। সরকারি নির্দেশ। পরিচ্ছন্ন অভিযানে অংশ নিতে এখানে পোস্টিং হয়েছে। এসেই ঝটিকা আক্রমণ। আশপাশের ডাকাত ও সন্ত্রাসীদের আটক করেন। এদের ভেতর অনেকেই আওয়ামী লীগের নেতা। শাসক দল থেকে চাপ আসে। একই ঘটনা ঘটে সারা দেশের বিভিন্ন জায়গায়। চোরাকারবারি, মজুদদার, খুনি আটক হওয়ার কিছুক্ষণ পর ঢাকা থেকে ফোন আসে। আটক করা লোকদের ছেড়ে দিতে হয়। এমন সময় একটা লিখিত নির্দেশ পায় ফারুক। এতে লেখা, 'কোনো অঘটন ঘটে গেলে তার জন্য তার রেজিমেন্টাল কমান্ডার কিংবা ব্রিগেড কমান্ডার কেউ দায়ী হবে না।' এই নির্দেশ বলে দেয়, পরিচ্ছন্ন অভিযান আর দরকার নেই। এরকম সময়ে ঢাকা ক্যান্টনমেন্টে ডালিমের সঙ্গে দেখা হয় ফারুকের। দুজনেই বেশ উত্তেজিত।

এখনো সন্ধ্যা হয়নি। পাখিরা কিচির মিচির করতে করতে ঘরে ফেরেনি।

ক্যান্টনমেন্টের টেনিস গ্রাউন্ডে কথা হয়।

ফারুক বললেন, চলো আজই মুজিবকে খুন করি।

ডালিম নিশ্চুপ।

ফারুক বললেন, তোমার কি মনে পড়ে, যেদিন তিনি পাকিস্তানের কারাগার থেকে মুক্ত হয়ে দেশে ফিরলেন, সেদিন আমরা সবাই খুশিতে কেঁদেছিলাম। সারা দেশের মানুষ পাগল হয়ে যায়। তাঁকে তো আমরা দেবতার আসনে বসিয়েছিলাম। তাহলে আজ কেন দেশের এই অবস্থা? আরো কিছু বলবেন, এমন সময় কয়েকজন লোক সামনে চলে আসে। কথা আর এগোলো না। এই সময় কয়েকজন সেনা কর্মকর্তার সঙ্গে আলোচনা করলেন ফারুক।

সরকার উৎখাতের পরিকল্পনা পাকা হতে থাকে।

ফারুকের সবচেয়ে নিকটজন মেজর রশিদ এখন ঢাকায় নেই। সব একা সামাল দিতে হচ্ছে। রশিদ গেছেন বোম্বের কাছাকাছি দেওলালিতে। ১৪ মাসের ট্রেনিংয়ে। কথা হয়েছে, কর্নেল আমীন আহম্মদ, মেজর হাফিজ, মেজর সেলিম, মেজর নাসির, মেজর গাফ্‌ফার এবং স্কোয়াড্রন লিডার লিয়াকতসহ আরো কয়েকজনের সঙ্গে। বঙ্গবন্ধু সরকার উৎখাতের পরিকল্পনায় সবাই একমত। তবে

সবাই চায় একটু ধীরে এগোতে। ফারুকের অপেক্ষা সহ্য হয় না। এই সময়ের দিনলিপি জানতে ফারুকের স্ত্রী ফরিদার সঙ্গে দেখা করেছে সুমন।

২০১৪ সালের মাঝামাঝি।

ঢাকার মোহাম্মদপুর এলাকার স্যার সৈয়দ রোডের এক বাসায় ফরিদার সঙ্গে সুমনের দেখা হয়। পরিণত বয়সেও তরতাজা সুন্দরী। শরীর-মন এখনো নড়বড়ে হয়নি। প্রথমে সুমন জানতে চায়, ১৯৭৫ সালের আগস্টে কি রশিদ খুব অস্থির হয়ে পড়েছিলেন?

খুবই অস্থির। রাতেও ঘুমাত না।

কী করতেন?

বই পড়ত বেশিরভাগ সময়।

ব-ই-ই!

চমকে উঠলে কেন?

না এমনি বলছিলাম, উত্তেজনার সময় বই পড়া সম্ভব?

বই পড়ত অন্য কারণে।

কেমন?

বই পড়ে দেশের জন্য কী করা যায় তাই ভাবত।

কী ধরনের বই পড়তেন?

চে গুয়েভারার ডায়েরি, মাও সেতুং আর কার্ল মার্ক্স পড়েছিল।

এদের মধ্যে কে প্রভাব ফেলেছিল?

কেউ না।

তাহলে?

এক রাতে আমাকে বলল, বাংলাদেশের জন্য মার্ক্সবাদ কোনো সমাধান দিতে পারবে না।

তাহলে বিকল্প কী ভাবলেন?

ইন্দোনেশিয়ার সুকর্নর উৎখাতের ঘটনা পড়ে এর সঙ্গে মিলিয়ে পরিকল্পনা করে।

এসব নিয়ে আপনার সঙ্গে কথা বলতেন?

সব সময় না, মাঝেমধ্যে।

কথায় কথায় ফরিদা বলেন, ওই সময় লেখা ফারুকের একটা নোটবুক আছে আমার কাছে। এ কথা শোনার পর সুমন শিউরে ওঠে।

কৌতূহল চেপে রেখে নরম করে বলে, একবার কি ওই নোটবুক একটু দেখতে পারি?

ফরিদা বললেন, দাঁড়াও দেখছি। এ কথা বলে ভেতরের রুমে চলে যান। একটু পর আসেন একটা পুরোনো নোটবুক নিয়ে।

লাল সিল্কের কাপড়ে জড়ানো। এতক্ষণ ছিল সুমনের উল্টোদিকের সোফায়, এবার পাশে এসে বসলেন। নোটবুক জড়ানো রেশমের কাপড় খুলতে খুলতে বললেন, দুই-একটা পাতা দেখাব।

সুমন মাথা নেড়ে বললেন, জি।

প্রথম যে পাতা বের করলেন তাতে কিছু বোঝা গেল না। হিজিবিজি কাটাকুটি। ব্লু কালির বলপেন আর পেনসিলের অসংখ্য আঁচড়। মাঝেমধ্যে এই আঁচড়ের ভেতর থেকে উঁকি দিচ্ছে ইংরেজি বর্ণমালা। এসব অক্ষর কী বলতে চাইছে তা বোঝা যাচ্ছে না। পরে আরো দুটো পাতার চেহারা একই রকম। চতুর্থ পাতা দেখে সুমনের চোখ আটকে যায়।

এই পাতায় লেখা অক্ষরগুলো স্পষ্ট। কেবল অক্ষর না, নাম লেখা। ওপরে ইংরেজিতে তারিখ লেখা, 17th December 1974। এর একটু নিচে লেখা Target. এর তলায় লেখা মুজিব, সৈয়দ নজরুল ও মনসুর আলী। এরপর পাশে লেখা মেজর জেনারেল সফিউল্লাহ্, মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমান এবং ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশাররফ। নামগুলো লাল কালিতে কাটা।

এরপর আরেকটা ছোট তালিকা। মুজিব, মনি, রব সেরনিয়াবাত। এই তিন নামের পাশে পেনসিল দিয়ে টিক চিহ্ন দেয়া। সুমনের বুঝতে অসুবিধা হয় না প্রথম তালিকায় ছয় জনের নাম। পরে তিন জনকে টার্গেট করা হয়।

কিছুটা সময় নিশ্চুপ থেকে ফরিদা বললেন, ইউ আর গুড লুকিং ইয়াংম্যান। একটু থেমে বলেন, 'সুমন আজ আর না, বেঁচে থাকলে হয়তো আবার কোনো একদিন দেখা হবে। ভালো থেকো। এবার উঠি।'

সোফা ছেড়ে সুমন উঠে দাঁড়ায়। মোহাম্মদপুরের বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসে। পকেট থেকে মোবাইল ফোন বের করে তাকায়। এখন দশটা ছয় বাজে। মানে বেশি রাত না। হাঁটতে হাঁটতে ক্রিসেন্ট লেকের পাড়ে গিয়ে বসে। ফরিদার কথাগুলো মনে ভাসছে। এই লেকের পাড়ে গণভবন। এখানে রাসেলের হাসু আপা থাকেন। তিনি এখন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী। সুমনের ইচ্ছা হয়, এখান থেকে চিৎকার করে ডাক দিই। তাঁকে একবার দেখে আসি। তা কি সম্ভব? প্রধানমন্ত্রীর বাড়িতে ইচ্ছা করলেই যাওয়া যায় না।

১৯৭৪ সালের নভেম্বরে অস্ত্রের গর্জন বেড়ে যায়।

২৪ তারিখ রাতে যাত্রাবাড়ীর গফুর মেম্বারের বাড়িতে তিনজন ব্যস্ত সময় পার করছেন। দুজনেই প্যান্ট পরা, খালি গা। শীতের মধ্যেও সবাই ঘেমে অস্থির।

এদের নাম নিখিল রঞ্জন সাহা, গোলাম মোরশেদ নয়ন এবং কাইয়ুম। তিনজনের এই দলের প্রধান নিখিল।

সম্প্রতি বুয়েট থেকে পাস করে সেখানে লেকচারার পদে যোগ দিয়েছেন। ক্ষেতমজুর পরিবারের মেধাবী ছাত্র নিখিল দুই সহযোগীকে নিয়ে আজ বোমা বানাচ্ছেন। মাত্র দুই দিন পর জাসদের হরতাল, তাই অনেক বোমা লাগবে। এদিন অনেক মানুষ মারতে হবে। না হলে আতঙ্ক ছড়াচ্ছে না।

বোমা বানানোর কৌশল ভালো করে আয়ত্ত করেছেন নিখিল। পড়াশোনায় ভালো মানে তার মুখস্থবিদ্যা বেশ শক্তিশালী। মাথাটা বেশ মোটা। সোজা বাংলায় আমরা যাদের গাঁড়ল বলি, নিখিল তাই। তার বোমা বানানোর কৌশল আধুনিক না। পাতলা মার্কিন কাপড় চিনি মেশানো পানিতে ভিজিয়ে শক্ত করতেন নিখিল। এর ভেতরে রাখতেন ধাতব স্প্লিন্টারের সাথে পটাশিয়াম ক্লোরেট। এরপর সেটা একটা জ্যাকেটের ভেতর ঢুকিয়ে দেয়া হতো। জ্যাকেটের ভেতর কয়েকটা ফোকর বা গর্ত। এসব ফোকরে অ্যাম্পুলের ভেতর রাখা হতো সালফিউরিক অ্যাসিড। এটা ডেটোনেটরের কাজ করত। অ্যাম্পুলগুলো থাকত কনডমের মধ্যে। জ্যাকেটের মুখে রাখা হতো সলতে। এতে আগুন দিয়ে ছুড়ে মারলেই কয়েকজন পড়ে যাবে।

নিখিল মন দিয়ে বোমা বানাচ্ছেন। বেশ কয়েকটা বোমা বানানো হয়েছে। এরই মধ্যে একটা বোমা ফেটে যায়। একটা ফাটার কারণে পাশেরগুলোও ফাটতে শুরু করে, কাইয়ুম মারা যায়। নিখিলের শরীর ঝলসে যায়। বোমা ফাটার সময় নয়ন ছিল বাথরুমে। সে বেঁচে যায়। বোমার শব্দে এলাকার লোকজন চিৎকার করতে থাকে।

নিখিলকে কাঁধে নিয়ে পোস্তগোলার দিকে চলে যায় নয়ন। এখানে একটা অ্যাম্বুলেন্স জোগাড় করে নিখিলকে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে আসে। পরদিন সকালে নিখিলের সঙ্গে দেখা করতে আসেন ঢাকা নগর গণবাহিনীর নেতা বাদল খান।

নিখিল তাকে জানায়, 'আমার ডায়েরি সম্ভবত পুলিশের হাতে চলে গেছে। বাড়িতে থেকো না।' এ কথা শোনার পর আর দাঁড়ায় না বাদল। একদিন পর মানে ২৬ নভেম্বর হরতালের বোমার কারিগর নিখিল মারা যায়।

নীলক্ষেতের পাশে পলাশী কলোনিতে থাকত কাইয়ুম। তার বাবা সরকারি চাকরি করতেন। রেডিওর খবর শুনে কাইয়ুমের মা যাত্রাবাড়ী যান, একা একা। ছেলের লাশ দেখে চিনতে পারেন। নিজেকে সামলে নিয়ে চলে আসেন বাসায়। বোমাবাজ ছেলের জন্য এক ফোঁটা চোখের পানি ফেললেন না। ঢাকা মেডিক্যাল কলেজের মর্গে পাঁচ দিন পড়ে থাকার পর কাইয়ুমের লাশ বেওয়ারিশ হিসেবে দাফন করা হয়।

এই সময় কুষ্টিয়ায় গুলি চালায় জাসদ।

এলাকার গণবাহিনীর নেতা মারফত আলী দলের হাইকমান্ডের কাছে প্রস্তাব পাঠায়, কুমারখালী-খোকসা এলাকার সংসদ সদস্য গোলাম কিবরিয়াকে মেরে ফেলা হোক। জাসদের ভাষায়, সে ভালো লোক না। এ দেশের যাকেই খারাপ লোক মনে হবে, তাকেই মেরে ফেলার দায়িত্ব এখন জাসদ গণবাহিনীর হাতে। মারফতের প্রস্তাব আসে দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের নেতা নূরে আলম জিকুর কাছে।

দলের হাইকমান্ডের সঙ্গে কথা বলে মারফতের কাছে খামে ভরে একটা চিরকুট পাঠান জিকু। খাম খুলে মারফত দেখে একটা ছোট্ট কাগজে লেখা 'হ্যাঁ'। তার মানে গোলাম কিবরিয়ার মৃত্যু পরোয়ানা চলে এসেছে। দলের লোকজনকে রেডি করে মারফত। গণবাহিনী সিদ্ধান্ত নেয়, দিনের বেলায় অনেক মানুষের মধ্যে কিবরিয়াকে খুন করতে হবে। এতে এলাকার লোকজন গণবাহিনীর শক্তি টের পাবে। গোলাম কিবরিয়া ছিলেন বঙ্গবন্ধুর অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। তিনি মিয়াভাই ডাকতেন।

বঙ্গবন্ধুর মিয়াভাইকে খুন করে জাসদ গণবাহিনী বোঝাতে চায়, তারা যা ইচ্ছা তা-ই করতে পারে। মারফতের মাথায় এল, গণবাহিনীর আরো কিছু অস্ত্র দরকার। এলাকায় রক্ষীবাহিনীর ক্যাম্পে আক্রমণ করে অস্ত্র নিয়ে আসতে হবে। পরিকল্পনামতোই কাজ। রাতের অন্ধকারে মারফত দলবল নিয়ে ছাতারপাড়া গ্রামে মরা নদীর পাড়ে জড়ো হয়। রাতের আকাশে ভরা চাঁদ। চারদিক স্নিগ্ধ আলোয় টলমল করছে।

রক্ষীবাহিনীর কাছে এই খবর চলে যায়, আজ রাতে মারফতের লোকজন ক্যাম্প আক্রমণ করবে। মরা নদীর পাড়ে মারফতের লোকজনকে ঘিরে ফেলে রক্ষীবাহিনী।

শুরু হয় গোলাগুলি। আড়াই ঘণ্টা যুদ্ধ চলে।

এতে গণবাহিনীর নেতা শামসুল হাদীসহ সাত জন প্রাণ হারায়। রক্ষীবাহিনীর বড় ক্ষতি হয়ে যায়। প্রাণ হারায় ১৭ জন। এলাকার দুজন কৃষক প্রাণ হারায়। ছাতারপাড়ার ঘটনায় সারা দেশ স্তম্ভিত হয়ে যায়। জাসদ গণবাহিনী গোলাম কিবরিয়াকে খুন করার পরিকল্পনা পাকাতে থাকে।

২৫ ডিসেম্বর, কোরবানির ঈদ।

শীতের সকাল।

কুমারখালী থানার সামনের বড় ঈদগাহে লোকজন আসতে শুরু করেছে। পাশের আমবাগানে গরু, খাসি জড়ো করা হচ্ছে। নামাজ পড়ে কোরবানি দেয়া হবে। জাসদ গণবাহিনীর ৪৩ জন সদস্য হাজির হয় ঈদগাহের সামনে। লুঙ্গি পরা, গায়ে শার্ট। কয়েকজন চাদর জড়িয়ে আছে। ঈদ-জামাতের সামনের লাইনে আছেন সংসদ সদস্য গোলাম কিবরিয়া।

আচমকা লুঙ্গি পরা কয়েকজন কিবরিয়ার সামনে এসে দাঁড়ায়। চাদরের তলা থেকে রাইফেল বের করে কিবরিয়ার বুকে নল ঠেকিয়ে গুলি করে। মাটিতে পড়ে যান কিবরিয়া। এই বীভৎসতা দেখে তার দেহরক্ষী আজম খান জ্ঞান হারিয়ে পড়ে যান। নামাজের আগ মুহূর্তে রক্তে ভেসে যায় ঈদগাহ।

নামাজ পড়তে আসা লোকজন যে যেদিকে পারেন দৌড়ে পালিয়ে যান। গণবাহিনীর সদস্যরা কিবরিয়াকে খুন করে গড়াই নদী পার হয়ে সোনাদিয়া বাজারের দিকে চলে যায়। মিশে যায় লোকজনের মধ্যে। প্রিয় মানুষ গোলাম কিবরিয়াকে হারিয়ে শোকস্তব্ধ বঙ্গবন্ধু।

এদিন বিকেলে সাইদুর রহমানকে ডেকে বঙ্গবন্ধু বললেন, সিরাজুলকে আমার কাছে নিয়ে এসো। ওর সঙ্গে কথা বলতে চাই। সাইদুর পুরান ঢাকায় ব্যবসা করতেন। অনেক আগে থেকে বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। এই বার্তা নিয়ে সাইদুর যান সিরাজুলের কাছে। আজিমপুর চায়না বিল্ডিংয়ের গলির ভেতর। বেশ কিছুদিন থেকে এখানে সিরাজুল আলম খান বাস করছেন। বঙ্গবন্ধুর বার্তা পেয়ে খুশি সিরাজুল।

পরদিন সন্ধ্যার পর গণভবনে বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে দেখা হলো।

অনেকদিন পর গুরু-শিষ্যের মিলন। দুজন দুজনকে জড়িয়ে ধরলেন। সিরাজ তুই সবাইকে নিয়ে চলে গেলি? ফিরে আয়, একটা জাতীয় দল গঠন করি, দেশে এত দলের দরকার নাই। বঙ্গবন্ধুর কথায় রাজি হয় না সিরাজুল। বললেন, না, তা হয় না। বরং সব দল থাকুক, আমরা জাতীয় সরকার গঠন করি।'

তার মানে আবার কোয়ালিশন সরকার? '৫৬ সালের অভিজ্ঞতা তোর মনে নেই? এবার নিশ্চুপ সিরাজুল। কী বলবেন ভেবে পাচ্ছেন না। পাইপের তামাক জ্বালিয়ে নিয়ে টান দিয়ে বঙ্গবন্ধু বললেন, সবাইকে নিয়ে দল করতে চাই। রব, জলিলকে তুই আমারে দে।'

বঙ্গবন্ধুর এই প্রস্তাব নিয়ে সকালে নাজিমউদ্দিন রোডে যান। এখানে কেন্দ্রীয় কারাগারের 'বিশ সেলে' আটক আছেন আ স ম রব। তার সঙ্গে আছেন মোহাম্মদ শাজাহান, মির্জা সুলতান, এম এ আউয়ালসহ অনেকে। সেলের ভেতর চিরকুট পাঠালেন সিরাজুল। জানতে চাইলেন, বঙ্গবন্ধুর এই প্রস্তাব কি আমরা মানতে পারি? আমাদের করণীয় কী? ভেতর থেকে রব উত্তর পাঠালেন আলোচনা চালিয়ে যান। এদিন রাতে বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে আবার দেখা করলেন সিরাজুল। বললেন, আশা করছি সবাইকে নিয়ে দল গঠন করা সম্ভব হবে। সবাই এখন অনেক নরম। বঙ্গবন্ধু স্বস্তির শ্বাস ফেলে বললেন, '৭২ সালে তোরা তো এটাই চেয়েছিলি।

বেশ কিছুক্ষণ কথা বলে বেরিয়ে আসার সময় সিরাজুল বললেন, আপনার নিরাপত্তা বাড়ান, অঘটনের আভাস পাচ্ছি।

হো হো করে হেসে সিরাজুলের কথা উড়িয়ে দিলেন বঙ্গবন্ধু। বললেন, 'আমার কথা তোর ভাবতে হবে না বরং তোকে নিয়ে আমার দুশ্চিন্তা হয়, পারলে অন্য কোথাও চলে যা।'

জাসদের সঙ্গে সমঝোতা প্রায় কাছাকাছি। এমন সময় বঙ্গবন্ধুর ভাগনে শেখ মনি বেঁকে বসলেন। মামাকে জানিয়ে দিলেন, জাসদের সঙ্গে সমঝোতা কোনোভাবেই সম্ভব নয়। মনির কথা টিকে গেল।

কথা ছিল, দোসরা জানুয়ারি বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে বসবেন সিরাজুল। এদিন চূড়ান্ত হবে জাসদের সঙ্গে সমঝোতা। মনির কারণে তা হলো না। তার আগেই ২৮ ডিসেম্বর সারা দেশে জরুরি অবস্থা জারি করা হয়। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের প্রেস নোটে বলা হয়, 'দায়িত্বপ্রাপ্ত কোনো সরকারই এইরূপ কোনো পরিস্থিতিতে নীরব দর্শক হইয়া থাকিতে পারে না। আর এই পরিস্থিতিতে দেশে জরুরি অবস্থা ঘোষণা ছাড়া সরকারের হাতে আর কোনো বিকল্প নাই।' জরুরি অবস্থা জারির পরদিন গোপনে ভারতে চলে যান সিরাজুল।

জরুরি অবস্থা জারি হওয়ার পর খুনের পরিকল্পনা বদলাতে হয়। এই তো, মাত্র কয়েকদিন আগে ফারুক সিদ্ধান্ত নেন, হেলিকপ্টারের ভেতরে খুন করা হবে। বঙ্গবন্ধু মাঝেমধ্যে হেলিকপ্টারে টুঙ্গিপাড়ায় যেতেন। ফারুকের ঘনিষ্ঠ স্কোয়াড্রন লিডার লিয়াকত তখন ফ্লাইট কন্ট্রোল অফিসার।

সন্ধ্যার পর সেনানিবাসের ক্যাফেটেরিয়ায় মুখোমুখি বসে আছেন ফারুক ও লিয়াকত। ফারুক বললেন, 'পিস্তল নিয়ে হেলিকপ্টারে উঠবে। রেডিও যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করে গুলি করবে। এরপর কোনো একটা সুবিধাজনক জায়গায় নদীতে লাশ ফেলে দিতে হবে। এরপর তুমি টুঙ্গিপাড়া রওনা হবে। আমি ও অন্যরা প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেব।'

লিয়াকত বলেন, 'একটু ভেবে দেখি, এরপর তোমায় জানাচ্ছি।'

হেলিকপ্টারে খুন করা সুবিধাজনক মনে করলেন ফারুক। তবে কোনো এক অজানা কারণে এই পরিকল্পনা বাদ হয়ে যায়। এরপর নতুন পরিকল্পনা শুরু করেন।

বঙ্গবন্ধুর ৬৭৭ নম্বর বাড়ির সামনে রিকশায় ফারুক বসে আছেন। ছদ্মবেশে। পরনে লুঙ্গি। গায়ে ময়লা শার্ট। চেহারায় শ্রমিকের ছাপ মেরে নিয়েছেন। না খাওয়া মানুষের মুখ। দেখে যেন কেউ চিনতে না পারে। ফারুকের সতর্ক চোখ ভালো করে বুঝে নিতে চায়, বাড়ির আশপাশের পরিবেশ।

লিয়াকতের সাড়া না পেয়ে ফারুক আর কাউকে বিশ্বাস করতে পারছেন না। তাই নিজেই বঙ্গবন্ধুর গতিবিধি, বাড়ির চারপাশের মানুষজন এবং নিরাপত্তাব্যবস্থা

দেখতে থাকলেন। বাসায় ফেরেন মধ্যরাতে। ঘুম আসছে না, ব্যালকনিতে অস্থির পায়চারি করছেন। আকাশে আধফালি চাঁদ। একটার পর একটা সিগারেট পুড়ে ছাই হচ্ছে। ফরিদা এসে বললেন, ঘুমাবে না? কী ভাবছ? কোনো সমস্যা?

সমস্যা না, একটা মানচিত্র দরকার।

কীসের মানচিত্র।

পরিকল্পনা ঠিক করতে ঢাকা সিটির মানচিত্র লাগবে।

সমস্যা কী জোগাড় করো?

একটাই মানচিত্র। তা থাকে হেডকোয়ার্টারে।

গিয়ে দেখা যায় না?

দেখা যাবে, তবে কারো সন্দেহ বাড়তে পারে।

তাহলে?

সেজন্যই তো ভাবছি।

একটু পরেই ফরিদা বলেন, একটা উপায় আছে।

ফারুক বললেন, কী সেটা?

শহরের টুরিস্ট গাইড বই জোগাড় করো, এতে মানচিত্র আছে। বাসায় একটা থাকতেও পারে।

এ কথা বলে বাসার শেলফ তন্নতন্ন করে খুঁজে দেখলেন ফরিদা। পাওয়া গেল না। পরদিন সকালে পর্যটন অফিস থেকে একটা ট্যুর গাইড বই নিয়ে এসে দেখতে থাকেন। মানচিত্র দেখতে দেখতে কখন যে সন্ধ্যা গড়িয়ে দিনটা রাতের পেটের ভেতর প্রবেশ করছে টের পাননি।

অস্থির সময় কাটছে ফারুকের।

এখন শীতকাল। গরম কাপড় না পরেই দিন চলে যাচ্ছে। রাতেও কম্বল দরকার হচ্ছে না। টেনশনে ঘুম আসছে না। বারবার বাথরুমে যেতে হচ্ছে। বারান্দায় অস্থির পায়চারি করছেন। চিকিৎসককে ফোন করে ঘুমের ওষুধের নাম জেনে নিয়েছেন ফরিদা। ফাইভ মিলিগ্রামের তিনটা ভ্যালিয়াম খেলে একটু ঘুম হয়। এই ঘুম যথেষ্ট নয়। পরদিন সকালে ফোন করলেন রশিদকে।

মেজর রশিদ ফারুকের ভায়রা ভাই। তিনি এখন ভারতের বোম্বে ট্রেনিং করছেন। ফোনের ওপর প্রান্ত থেকে রশিদ জানায়, এখানকার ট্রেনিং শেষ প্রায়, কাল আবেদন করছি এখান থেকে সিঙ্গাপুর বা মালয়েশিয়া যাওয়ার জন্য। এ কথা শুনে পেছনে শিং মাছের কাঁটা ফোটার মতো চমকে উঠলেন ফারুক।

বলো কী? ঢাকায় কী ঘটছে তার কিছুই জানো না? তাড়াতাড়ি চলে এসো। এই সময় তোমাকে সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন। রশিদ বললেন, ডোন্ট ওরি, আই উইল কাম ব্যাক ভেরি সুন।

ঝটিকা সফরে দক্ষিণ এশিয়া ঘুরে গেলেন মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী হেনরি কিসিঞ্জার।

মাত্র আট ঘণ্টার জন্য ঢাকায় এলেন। বঙ্গভবনের সামনে দেশি-বিদেশি অসংখ্য সাংবাদিক গিজগিজ করছেন। আড়াই মিনিট কথা বললেন সাংবাদিকদের সঙ্গে। কোনো প্রশ্নের উত্তর দিলেন না। সাদামাটা কথা বলে একগাল হেসে ঢাকা থেকে বিদায় নিলেন কিসিঞ্জার।

এসব ঘটনার ভেতর দিয়ে শুরু হলো নৃশংসতার বছর, ১৯৭৫ সাল।

সারা দেশ যেন লোহার কড়াইয়ের ভেতর ফুটন্ত তেলে ভাসছে আর ডুবছে। ৩ জানুয়ারি, ঢাকায় ছয়টি হত্যাকাণ্ড ঘটল। দুই দিন পরে সংসদ সদস্য মোতাহারউদ্দিন খুন। এরপর দুই ফেব্রুয়ারি যশোরের প্রাক্তন এমসিএ মোশাররফ হোসেন হত্যা। পরদিন সাংসদ মঈনুদ্দিন খুন। ২৩ ফেব্রুয়ারি নেত্রকোনার সাংসদ আবদুল খালেককে হত্যা।

এসব করে আইনশৃঙ্খলা শব্দটা ফুঁ দিয়ে উড়িয়ে দিল জাসদ। খুন আর লুটপাটের আলোচনা সবখানে, হাসিঠাট্টার কথা বন্ধ হয়ে যায়। হোসনে আরার অফিস ক্যান্টিনে আলোচনার ধরন বদলে গেছে।

দুই বছর আগেও যারা বঙ্গবন্ধুর প্রশংসা করতেন, তারা এখন নোংরা ভাষায় গালিগালাজ করেন।

ক্যান্টিনে বসে দুপুরের খাবার খেতে খেতে সব কানে পড়ে। দু-একবার এসব কথার প্রতিবাদ করেছেন। লাভ হয়নি বরং মন্দ কথা শুনতে হয়েছে।

সহকর্মী মর্জিনা পারভিন বলে বেড়ায়, হোসনে আরা তো আওয়ামী লীগের দালাল। এই কথার প্রতিবাদ করেন একটা বাক্য বলে, 'যে দলের কারণে বাংলাদেশের স্বাধীনতা, তার দলের দালাল হওয়াটাও গর্বের।' এ কথার পর আর কিছু বলেনি মর্জিনা। এরপর থেকে বিশেষ প্রয়োজন না হলে মর্জিনার সঙ্গে কথা বলেন না। এভাবে অফিসের সবার সঙ্গেই হোসনে আরার দূরত্ব বাড়ে।

বাতাসে ভাসতে থাকে নানা রঙের গুজব।

এসব গুজবের দুই-চারটা জনমনে সত্যে পরিণত হয়। আবার বেশিরভাগ গুজব বাতাসে মিশে যায়। হোসনে আরার বস মনিরুল ইসলাম অফিসে বললেন, রক্ষীবাহিনীর হাতে নাকি জাসদের ৩০ হাজার কর্মী খুন হয়েছে?

আমিও শুনেছি। সত্য-মিথ্যা বলতে পারব না।

এ রকম বললে হবে?

যা জানি, তা-ই বললাম।

বিমা অফিসে কাজ করেন, অঙ্কটা জানা দরকার।

বসের কথা শুনে হোসনে আরা বললেন, স্যার অঙ্কটা কেমন?

একটা কাগজ নিয়ে মনিরুল লিখতে থাকলেন। সব গণিতের সংখ্যা। পিয়ন চা দিয়ে যায়। চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিয়ে আরো আড়াই মিনিট ধরে চলল সংখ্যার কাটাকাটি। এবার একটা সিগারেট জ্বালিয়ে মনিরুল বললেন, যদি জাসদের এই সংখ্যা সত্য হিসেবে ধরে নেয়া হয়, তাহলে প্রতিদিন গড়ে ৪১ জন খুন হয়েছেন, তা কি হয়েছে?

হোসনে আরা বললেন, এই সংখ্যা তো অনেক। তাহলে বলুন, এই গুজবের মানে কী? হোসনে আরা মানে খুঁজে পান না।

মনিরুল বললেন, পাকিস্তানের কারাগার থেকে মুক্ত হয়ে বঙ্গবন্ধু দেশে ফেরার দিন থেকে গণকণ্ঠ গুজব ছড়াতে থাকে। ফিরে এসে যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশে কাজ শুরুই করতে পারলেন না, অথচ শুরু হলো বিরোধিতা। এসব ভাবতে হবে হোসনে আরা, এসব ভাবতে হবে।

এসব বলে মনিরুল সিগারেটে আগুন দেন।

হোসনে আরা বললেন, স্যার আমার মনে হয়, সবকিছুর পেছনে আমেরিকা। এক গাল হেসে মনিরুল বললেন, সত্য বলেছ।

মুক্তিযুদ্ধে পাকিস্তানের পরাজয়কে নিজের পরাজয় ভাবতেন হেনরি কিসিঞ্জার।

ব্যক্তিগত ডায়েরির পাতায় 'বিদেশি শত্রু' নামে তিনজনের নাম লেখা। চিলির সালভাদর আলেন্দে, দক্ষিণ ভিয়েতনামের নগুয়েন ভ্যান থিউ এবং বাংলাদেশের শেখ মুজিবুর রহমান। ওয়াশিংটন ফিরে যাওয়ার পর রজার্স মরিস তার সাক্ষাৎকার নেয়ার সময় প্রথম প্রশ্ন করলেন, শেখ মুজিব আমেরিকার শত্রু কেন?

এ কাইন্ড অব অবট্রিপারস হু ওয়াজ নট বিহেভিং ইন প্রপার ওয়ে। এবার রজার্স বলেন, বঙ্গবন্ধু আমেরিকার অপ্রিয় হওয়ার কারণ কী? কিসিঞ্জার বললেন, মুজিবের কারণে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় আমাদের নীতি অত্যন্ত চ্যালেঞ্জের মুখে পড়ছে। তাই বাংলাদেশ সরকারের বদল চায় আমেরিকা।

হেনরির কথা ভালো করে বুঝতে কিছুদিন আগে সুমনের কাছে জানতে চেয়েছিলাম। সুমন বলে, বঙ্গবন্ধুর সব কাজই ছিল সাম্রাজ্যবাদবিরোধী। মার্কিননীতি

উপেক্ষা করে দক্ষিণ ভিয়েতনামের অস্থায়ী সরকারকে প্রথম স্বীকৃতি দেয়াটা আমেরিকা ভালোভাবে নেয়নি। তাই নয়, বাংলাদেশে মিশন খোলার অনুমতিও পায় ভিয়েতনাম। আবার প্যালেস্টাইন লিবারেশন অরগানাইজেশনকে বাংলাদেশে মিশন অফিস খোলার অনুমতি দিয়েছিলেন বঙ্গবন্ধু। একই সঙ্গে ইসরায়েলে মিশন স্থাপনের জন্য মার্কিন নীতি প্রত্যাখ্যান করে বাংলাদেশ।

এটাই কি একমাত্র কারণ?

সুমন বলে, কিউবার সঙ্গে বাণিজ্য চুক্তি আর আলজিয়ার্সে জোটনিরপেক্ষ সম্মেলনে সাম্রাজ্যবাদের বিরোধিতা করায় আমেরিকার চোখের কাঁটা হয়ে যান বঙ্গবন্ধু। সিআইএ মরিয়া হয়ে ওঠে। তখনই ছদ্মবেশে প্রতিনিধি পাঠায়। প্রশ্ন করি—কীভাবে জানা গেল?

পিটার কাসটারাস প্রথম সিভিলিয়ান ছদ্মবেশী। তার আসল পরিচয় জানা যায় অনেক পরে।

১৯৭৬ সালের ২২ সেপ্টেম্বর সংবাদপত্রে বড়-বড় অক্ষরে ছাপা হলো, 'সরকার উৎখাত ষড়যন্ত্র মামলায় একজন বিদেশিসহ সাতজনের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেয়া হয়েছে'।

পিটার জাসদকে সহযোগিতা করার পাশাপাশি 'সর্বহারা ঐক্য আন্দোলন' নামে একটি গোপন রাজনৈতিক সংগঠন প্রতিষ্ঠায় কাজ করেন, সিরাজ শিকদারের সর্বহারা পার্টি এবং জাসদ গণবাহিনীর ভেতর ঐক্য গড়ে তোলার মিশন নিয়ে বাংলাদেশে এসেছিলেন।

কে এই সিরাজ শিকদার?

লেখাপড়ায় ইঞ্জিনিয়ার। একসময় মার্কিন সাহায্য সংস্থায় চাকরি করতেন। এরপর ১৯৬৯ সালে গণ-আন্দোলনে সারা দেশ যখন টালমাটাল তখন চাকরি ছেড়ে গঠন করেন সর্বহারা দল। মুক্তিযুদ্ধ শুরুর আগে চলে যান লন্ডন। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর ফিরে এসে হয়ে যান বিপ্লবী এবং মার্ক্সবাদী চীনাপন্থি কমিউনিস্ট। গঠন করেন পূর্ব বাংলার সর্বহারা পার্টি। শুরু হয় 'শ্রেণিশত্রু খতম' অভিযানের নামে স্থানীয় জোতদার আর রাজনৈতিক নেতাকর্মীদের খুন। বিভিন্ন থানা আর পুলিশ ফাঁড়িতে হামলা করে, অস্ত্র লুট করে অল্পদিনের মধ্যে আতঙ্কের নামে পরিণত হয় সর্বহারা পার্টি।

দেশে তখন সাম্যবাদী দলসহ বেশ কিছু রোগা আকারের চীনাপন্থি দল ছিল। আলোচনায় ছিল আবদুল হকের পূর্ব পাকিস্তানের কমিউনিস্ট পার্টি। অনেকের কাছে আবদুল হক রহস্য মানুষ বলে পরিচিত। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর অনেকদিন

নিজ দলের নামের সঙ্গে 'পূর্ব পাকিস্তান' শব্দটি লাগিয়ে রেখেছিলেন। পাকিস্তানপ্রীতি ছাড়তে পারছিলেন না আবদুল হক।

সিরাজের সর্বহারা পার্টি দ্রুত বড় হয় পিটার কাসটারাসের মাধ্যমে। হাতে পায় সিআইএর টাকা। সিরাজের শেষ পরিণতি তিনি চট্টগ্রামে ধরা পড়েন ১৯৭৪ সালের ৩১ ডিসেম্বর। তার দলের একজন ধরিয়ে দেয় নারীঘটিত কারণে। সিরাজের দুই জন স্ত্রী আবার কয়েকজন নারীবন্ধু ছিল। রবিন তার দলের একজন। তার সুন্দরী প্রেমিকার ওপর নজর পড়ে সিরাজের।

প্রেমিকা সাড়া দেয় না, উল্টো রবিনকে সব বলে দেয়। এ কথা শোনার পর উত্তেজিত হয়ে ওঠে রবিন। প্রতিজ্ঞা করে সিরাজের ক্ষতি করার। সিলেটে পার্টির কাজে এসেছিল রবিন এবং সিরাজ শিকদার। কাজ সেরে রবিন রওনা দেয় ঢাকায়, সিরাজ চলে যায় চট্টগ্রামে।

রবিন আগে থেকেই পুলিশের সঙ্গে যোগাযোগ করেছিল। পুলিশকে জানিয়ে দেয়, আজ সিরাজ শিকদার চট্টগ্রাম যাচ্ছেন। পুলিশ পিছু নেয়। অর্ধেক পথ এসে সিরাজকে হারিয়ে ফেলে। চট্টগ্রাম স্টেশনে নামার পর সিরাজ একটা বেবিট্যাক্সি ভাড়া করে উঠে পড়েন। রেল পুলিশকে আগে থেকে জানানো হয়েছিল। তারা সন্দেহজনক ব্যক্তি হিসেবে সিরাজকে আটক করে। কিন্তু তারা বুঝতে পারে না, আটক ব্যক্তি সিরাজ কি না?

পুলিশের সন্দেহ যায় না। ঢাকা থেকে রবিনকে প্লেনে করে নিয়ে আসা হয় চট্টগ্রামে। রবিন শনাক্ত করে দেয়, আটক ব্যক্তি সিরাজ শিকদার। এই কাজের পুরস্কার পায় রবিন। কয়েক দিন পর প্রেমিকাসহ তাকে কানাডায় যাওয়ার ব্যবস্থা করে দেয় সরকার।

পুলিশ কর্মকর্তা মারুফুল তাকে আটক করে চোখ বেঁধে বিমানে করে ঢাকায় নিয়ে আসেন। তেজগাঁও বিমানবন্দরে বিমান থেকে সিরাজকে নিয়ে যাওয়া হয় মালিবাগ স্পেশাল ব্রাঞ্চ অফিসে। অতিরিক্ত নিরাপত্তার কারণে সিরাজ শিকদারকে নিয়ে আসা হয় শেরেবাংলানগর রক্ষীবাহিনীর ক্যাম্পে।

খবর ছড়িয়ে পড়ে সিরাজকে আটক করায় সর্বহারা পার্টি ভারতীয় হাইকমিশনার এবং আমেরিকার রাষ্ট্রদূতকে আক্রমণ করবে। তটস্থ পুলিশ দূতাবাস এলাকার নিরাপত্তা জোরদার করে। আবার সিরাজকে কেড়ে নেয়ার ভয় ছিল। তাই নিরাপদ জায়গা রক্ষীবাহিনীর দফতরে তোলা হয়।

পহেলা জানুয়ারির সকাল। রক্ষীবাহিনীর উপপরিচালক আনোয়ার উল আলম এবং সারোয়ার হোসেন মোল্লা অফিসে চা পান করছেন। এমন সময় জানতে পারেন, মধ্যরাতে সিরাজকে তাদের অফিসার্স মেসে নিয়ে আসা হয়েছে। দুজনের

মাথা গরম হয়ে ওঠে। আনোয়ার বললেন, না না আমাদের এখানে কেন? সিরাজ শিকদারকে এখানে রাখা ঠিক হবে না।

চা পান শেষ না করে দুজন পরিচালক নুরুজ্জামানের অফিসে ঢুকে পড়েন। প্রথমেই আনোয়ার বললেন, এখানে সিরাজকে রাখা ঠিক হবে না। ওকে আটক করেছে পুলিশ, তাই পুলিশের হেফাজতেই রাখা হোক। নুরুজ্জামান বললেন, স্পেশাল ব্রাঞ্চের ডিআইজি ই এ চৌধুরীর অনুরোধে এখানে রাখার অনুমতি দেয়া হয়েছে। না বলার অবস্থা ছিল না।

সারোয়ার বলেন, তিনি যা-ই বলুন না কেন। এখানে রাখা ঠিক কাজ হচ্ছে না। নুরুজ্জামান বললেন, ওকে আমি ই এ চৌধুরীকে বলব, তারা যেন অতিদ্রুত সিরাজকে এখান থেকে সরিয়ে নেন। এ কথা শোনার পর দুজনেরই মাথা একটু শীতল হয়। কৌতূহলবশে তারা অফিসার্স মেসে যান, সিরাজকে একনজর দেখতে।

মাঝারি আকারের ঘর। দরজার সামনে দুজন পাহারা দিচ্ছেন। তাদের ঘাড়ে ঝুলছে থ্রি-নট থ্রি রাইফেল। ঘরের ভেতর একটা কাঠের টেবিল। মেঝেতে বিছানা পাতা। এই ঘরে কোনো চেয়ার নেই। মেঝের ওপর সিরাজ বসে আছেন। চোখ হালকা লাল। বাম চোখের পাশে রক্ত জমা দাগ। টেবিলের ওপর নাশতা। চারটা পরোটা, আলু-পেঁপের ভাজি, একটা ডিম সেদ্ধ আর রোগা আকারের দুইটা সাগর কলা।

কিছুক্ষণ আগে নাশতা দিয়ে যাওয়া হয়েছে। সিরাজ খাচ্ছেন না। দরজার সামনে এসে সারোয়ার একজন পিয়নকে ডেকে তিনটা চেয়ার দিতে বললেন। আনোয়ার সিরাজকে বললেন, চেয়ারে বসেন। সিরাজ উঠে বসেন। সারোয়ার বললেন, সিগারেট খাবেন? মাথা নেড়ে সম্মতি জানান। ম্যাচসহ একটা সিগারেট এগিয়ে দেন সারোয়ার। আগুন জ্বালান, জোরে টান দিয়ে উঠে দাঁড়ান সিরাজ। চেয়ারে বসে সিগাটের টানতে থাকেন। জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে কয়েকবার একই কথা উচ্চারণ করলেন, আই নো মাই ফেট ইজ ডিসাইডেড।

আনোয়ার নাশতা করতে বললে সিরাজ চেয়ারটা টেনে টেবিলের কাছে এসে নাশতা করতে থাকেন। পরোটা ছিঁড়ে মুখে দেয়ার সময় একটু থামলেন। ১৫ মিনিট পর ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন আনোয়ার আর সারোয়ার। সন্ধ্যার পর জিজ্ঞাসাবাদের দায়িত্ব দেয়া হয় পুলিশ সুপার মাহবুব আলমকে।

পরদিন সাভারে বড় রাস্তার পাশে গুলিবিদ্ধ সিরাজের লাশ পাওয়া যায়। পুলিশ দাবি করে, সিরাজ শিকদার মানিকগঞ্জের দিকে তার একটা গোপন আস্তানা দেখিয়ে দিতে চাইলে, পুলিশ তাকে সেখানে নিয়ে যাচ্ছিল। পথে সাভারের কাছে গাড়ি থেকে লাফিয়ে পালানোর চেষ্টা করেন। তখন বাধ্য হয়ে পুলিশ গুলি ছোড়ে। ছয়টি গুলির চিহ্ন ছিল গায়ে।

লাশ তার মা-বাবার কাছে হস্তান্তর করে পুলিশ। ঢাকার মোহাম্মদপুরে তাজমহল রোডের জামে মসজিদের গায়ে লাগানো গোরস্তানে পুলিশ পাহারায় লাশ দাফন করা হয়। সিরাজ শিকদারের মৃত্যুর পর সর্বহারা দল নিস্তেজ হয়ে পড়ে। তবে ভাইয়ের মৃত্যুতে ক্রোধের আগুনে পুড়তে থাকলেন সিরাজের বোন শামীম শিকদার। সর্বহারা দল থেকে পাওয়া একটা গুলি ভরা পিস্তল নিয়ে ঢাকার রাজপথে ঘুরতে থাকেন শামীম। ভাই হত্যার বদলা নিতে তিনি বঙ্গবন্ধুকে খুন করতে চান। উদ্‌ভ্রান্তের মতো ঢাকা শহরের এদিক-ওদিক ঘুরে বেড়ান।

শামীম বিশ্বাস করেন, বঙ্গবন্ধুকে তিনি একদিন অবশ্যই গুলি করার দূরত্বে পেয়ে যাবেন। ছয়বার বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে দেখা করার আবেদন জানান। সাড়া মেলে না। পরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে চারুকলা বিভাগে তার ভাস্কর্যের প্রদর্শনীতে আমন্ত্রণ জানানো হয়। বঙ্গবন্ধু এই আমন্ত্রণ গ্রহণ করলেন, তবে অনুষ্ঠানের সময় কাছাকাছি আসতে পারলেন না বেপরোয়া হয়ে ওঠা শামীম।

রহস্য মানুষ মেজর জলিল।

সুমনের ভাষায়, মোশতাকের মতো তার রক্তেও বিশ্বাসঘাতকতা। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর ধরা পড়েন। কাছে পাওয়া যায় অনেক গোপন নথি। সব মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থা সিআইএর নির্দেশ। মুক্তিযুদ্ধের সময় ৯ নম্বর সেক্টর কমান্ডারের দায়িত্ব পালন নিয়েও অনেক প্রশ্ন।

মুক্তিযুদ্ধের সময় উনিশ জনকে নিয়ে এক অপারেশনে যান জলিল। দলের সবাই পাকিস্তানি সেনাদের হাতে ধরা পড়েন। পরে সবার প্রাণ যায়। শুধু জলিল বের হয়ে আসেন নিরাপদে। স্বাধীন দেশের শুরুতে গ্রেপ্তার হন গুপ্তচরবৃত্তির অভিযোগে। তার সঙ্গে গ্রেপ্তার হন একই সেক্টরের মুক্তিযোদ্ধা এবং আগরতলা মামলায় অভিযুক্ত নৌবাহিনীর সাবেক লিডিং সিম্যান সুলতানউদ্দিন আহমেদ এবং মোহাম্মদ খুরশিদ। আটকের পর গুপ্তচরবৃত্তির অভিযোগ থেকে সুলতান এবং খুরশিদ ছাড়া পেলেও জলিলকে সামরিক আদালতে বিচারের মুখোমুখি করা হয়।

এই আদালতের প্রধান বিচারকের দায়িত্বে ছিলেন লেফটেন্যান্ট কর্নেল আবু তাহের। বিচারের রায়ে জলিল নির্দোষ প্রমাণিত হন। সব মিলিয়ে এক বছর পর জেলের গারদ থেকে বেরিয়ে আসেন। বেরিয়ে সেনাবাহিনী থেকে পদত্যাগ করে উদ্দেশ্যহীনভাবে এখানে-সেখানে চলাফেরা শুরু করেন।

আগে থেকেই যোগাযোগ ছিল সুলতানউদ্দিনের সঙ্গে। মতিঝিলে সুলতানের অফিসে সিলিংয়ের তলায় কাঠের পাটাতন বানানো হয়। অনেকটা দোতলা খাটের মতো। এখানে রাতে ঘুমাতেন। ঢাকায় তার থাকার জায়গা ছিল না। কিছুদিন পর ক্যান্টনমেন্টের ভেতরের এক বাড়িতে ওঠেন, এই বাড়ি থেকে বের করে দেয়া হয়।

এসবের ভেতর দিয়ে জলিল বুঝে গেলেন, সেনাবাহিনীতে তার জায়গা নেই। উৎসাহী হয়ে উঠলেন রাজনীতির প্রতি। প্রথম বক্তৃতা করলেন মহাখালীর সাবেক জিন্নাহ কলেজে। আজকের তিতুমীর কলেজের আগের নাম ছিল জিন্নাহ কলেজ। এই কলেজের ছাত্রনেতা কামালউদ্দিনের বড় ভাই সুলতান। মতিঝিল অফিসে তাদের পরিচয় হয়েছিল। এভাবে শুরু হয় জলিলের রাজনৈতিক জীবন। প্রথমে জাসদে ভিড়ে যান, পরে যোগ দেন কট্টর মৌলবাদী দলে। পিটার কাসটারাসের সঙ্গে জলিলের যোগাযোগ ছিল।

ছদ্মবেশী পিটার কাসটারাস সম্পর্কে সুমন জানায়, বাংলাদেশে এসে বিভিন্ন এলাকা ঘুরে বেড়ান। বাংলাদেশ ব্যবহারিক শিক্ষা সংস্থা নামে একটি সেবামূলক সংগঠনের নামে ছাত্র-যুবকদের সশস্ত্র ক্যাডার হিসেবে গড়ে তোলেন পিটার।

এসব অভিযোগ প্রমাণিত হয়। বিচারে কাসটারাসের যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের রায় হলে অস্বস্তিতে পড়ে আমেরিকা।

১৯৭৬ সালের ২৩ সেপ্টেম্বর নিউ ইয়র্ক টাইমসে লেখা হয়, 'গোপন সামরিক আদালতে পিটার কাসটারাসকে সরকার উৎখাত ষড়যন্ত্রের অভিযোগে ১৪ বছর কারাদণ্ড দেয়া হয়েছে। সাত জন অভিযুক্তকে অব্যাহতি দেয়া হয়েছে এবং হল্যান্ড সরকার পিটারকে নিজ দেশে ফেরত পাঠানোর জন্য বাংলাদেশ সরকারকে সম্মত করানোর জন্য চেষ্টা করছে।' পরদিন টাইমস পত্রিকায় ছাপা হয়, 'পিটার কাসটারাসকে হল্যান্ডে পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে।' এই খবরটি আর আমাদের দেশের সংবাদপত্রে ছাপা হয়নি।

ম্যাজিস্ট্রেট এ আর মজুমদারকে দেয়া জবানবন্দিতে পিটার বলেন, '১৯৭৩ সালের ২৫ জানুয়ারি আমি ঢাকা আসি। জাসদ, মস্কোপন্থি ছাত্রলীগ ও ছাত্র ইউনিয়নের সঙ্গে আমার বিশেষ আলাপ-আলোচনা হয়। তারা তৎকালীন আওয়ামী লীগ সরকারের কার্যকলাপের নিন্দা করে। ঢাকায় জাসদ নেতা মেজর জলিল, আ স ম আবদুর রব, মমতাজ বেগম প্রমুখ নেতার সঙ্গে রাজনৈতিক আলাপ-আলোচনা হয়। ১৯৭৪ সালের নভেম্বরের মাঝামাঝি মমতাজউদ্দিন খান ঢাকায় এলে তাকে সঙ্গে নিয়ে ডক্টর আখলাকুর রহমানের বাসায় যাই। এর দুই থেকে তিন দিন পর মমতাজউদ্দিন আমাকে সিরাজুল আলম খানের বাসায় নিয়ে যান।

'এদিন সিরাজুল আলম খান বলেন, কৃষকদের মনে ঘৃণার সৃষ্টি করতে হবে এবং এই লাইনে কাজ করলে তার দল জাসদ সহযোগিতা করতে প্রস্তুত আছে। ১৯৭৪ সাল সম্ভবত ২৮ নভেম্বর আনুমানিক বেলা একটার সময় আমি সিরাজুল আলম খানের বাসায় যাই। সেখানে তার সঙ্গে জাসদ দলের খসড়া থিসিস এবং সিরাজ শিকদার সম্পর্কে আলোচনা হয়। এরপর কয়েকবার কর্নেল তাহেরের সঙ্গে আমার দেখা হয়

এবং আলাপ হয়। তিনি আর্মস ক্যাডার তৈরি করার জন্য ক্যাডারদের সামরিক শিক্ষার ব্যবস্থা করবেন, সেজন্য তাকে ৫০ হাজার ডলার দিতে হবে বলে দাবি করেন।

'পরবর্তী সময়ে আমি কর্নেল তাহেরকে আমার মিশনে সাহায্য করার জন্য বিভিন্ন সময়ে বাহার এবং আনোয়ারের মাধ্যমে ৬০ হাজার টাকা দিই। কর্নেল তাহের সর্বহারা পার্টির লোকদের সঙ্গে দেখা করতে চাইলে ১৯৭৪ সালের ডিসেম্বরে কোনো এক রোববার জলিলকে সঙ্গে নিয়ে তাহেরের বাসায় যাই। তাহের সাহেব জলিলের নিকট ক্যাপ্টেন আলতাবের বিষয়ে জানতে চাইলে জলিল তাকে বলেন, আলতাব সাহেব সুন্দরবন এলাকায় আছেন এবং তার সঙ্গে যোগাযোগ করা সম্ভব নয়। কর্নেল তাহের রাজনৈতিক আলাপ-আলোচনা করেন, পরে আমরা চলে আসি।

'কর্নেল তাহের সাহেবকে আমি পূর্বে যে ৬০ হাজার টাকা প্রদান করি, তা রক্ষীবাহিনীর বিরুদ্ধে সশস্ত্র আক্রমণের জন্য এবং রাজনৈতিক প্রচারণার জন্য, যা ব্যবহৃত হবে বলে প্রফেসর আনোয়ার আমাকে জানান। ১৯৭৫ সালের মার্চ মাসের মাঝামাঝি আমি ডক্টর আখলাকুর রহমান সাহেবের সঙ্গে তার মোহাম্মদপুরের বাসায় দেখা করি। তিনি আমাকে জানান, কর্নেল তাহেরকে আমি যে টাকা দিয়েছি, তা তিনি শুনেছেন। তিনি আমাকে বিদেশ থেকে অস্ত্র আনার ব্যবস্থা করতে বলেন, যাতে দশ বছরের মধ্যে বিপ্লব সংগঠিত করা যায়। ডক্টর আখলাকুর রহমানের গুলশানের বাড়ি দেখে আমার ধারণা জন্মে, গণ-অভ্যুত্থান তাদের ব্যক্তিগত লাভ ও ক্ষমতা লাভের জন্য। জনগণের স্বার্থে নয়। ১৯৭৫ সালের ১৬ আগস্ট সন্ধ্যার সময় এলিফ্যান্ট রোডে কর্নেল তাহেরের ভাই আবু ইউসুফের বাসায় কর্নেল তাহেরের সঙ্গে দেখা করি। তিনি মতপ্রকাশ করেন, শিগগিরই তার পক্ষে ক্ষমতা দখল করা সম্ভব হবে।'

গণবাহিনী গঠনের হোতা পিটার কাসটারাস।

১৯৭৫ সালের ২০ জানুয়ারি এবং ৮ ফেব্রুয়ারি সাধারণ ধর্মঘটের ডাক দেয় জাসদ। ধর্মঘটের নামে গুলি চালায়। বোমা ফাটায়। জাসদ হাইকমান্ড সারা দেশে নির্দেশ পাঠায়, সশস্ত্র প্রতিরোধ গড়ে তোলো। সুযোগ বুঝে গণবাহিনীর সঙ্গে যোগ দেয় মুক্তিযুদ্ধে পরাজিতরা।

উঠে দাঁড়ায় চীনাপন্থিরা। সাম্যবাদী দলের নেতা তোয়াহা এবং সহযোগী আবদুল হক পাকিস্তানের অখণ্ডতা ফিরিয়ে আনা পবিত্র কর্তব্য বলে ঘোষণা করলেন। সমাজ বদলের নামে আঠারো মাসে দুই হাজার ৩৫ জনকে হত্যা, ৩৩৭ জন অপহরণ, ১৯০ জন নারী ধর্ষণ এবং চার হাজার ৯০৭টি ডাকাতির ঘটনা ঘটে।

জাসদের কর্মীরা স্বপ্নের জগতে ভাসতে থাকলেন। নেতাদের আদর্শ বলে কিছু ছিল না। পরবর্তী সময়ে জাসদ উদ্যোক্তা আ স ম আবদুর রব আওয়ামী লীগ এবং শাজাহান সিরাজ বিএনপির মন্ত্রী হয়েছেন। বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের ঝান্ডা বাহকদের কয়েকজন আওয়ামী লীগের নৌকা প্রতীক নিয়ে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হয়েছেন। যা-ই হোক ২৬ জানুয়ারি রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব গ্রহণ করলেন বঙ্গবন্ধু। পরদিন ক্যাপ্টেন মনসুর আলীকে প্রধানমন্ত্রী করে ১৭ সদস্যের মন্ত্রিসভা গঠন করলেন।

এরপর ২৪ ফেব্রুয়ারি নতুন রাজনৈতিক দল গঠন করা হয়। বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি, ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (মোজাফফর) একসঙ্গে হয়ে নতুন দলের জন্ম হলো। বাংলাদেশ কৃষক শ্রমিক আওয়ামী লীগ, সংক্ষেপ 'বাকশাল'। সংবিধানের চতুর্থ সংশোধনী এনে নতুন দল বাকশালকে জাতীয় দল হিসেবে ঘোষণা করা হয়।

মার্চের শুরু।

ভারত থেকে ঢাকায় ফিরে আসেন সিরাজুল আলম খান।

এবার তার অন্য চেহারা। দাড়ি-গোঁফ নেই। একেবারে ক্লিন শেভ। এই চেহারায় কাছের মানুষরাও তাকে চিনতে পারছেন না। সবাই মুখ ভরা দাড়ি আর ঠোঁটের ওপরে ঝুলে থাকা গোঁফের সিরাজুলকে চেনেন। পোশাকও বদলে ফেলেছেন। এর আগে সব সময় পরতেন খদ্দরের পাঞ্জাবি আর পাজামা, এখন পরে আছেন পুরু কাপড়ের প্যান্ট আর শার্ট। স্যান্ডেলের বদলে কেডস।

এই চেহারায় হাজির হলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক আবু জায়েদ শিকদারের বাসায়। সিরাজুলকে চিনতে বুদ্ধিমান জায়েদের অসুবিধা হয়নি। এই বাসায় আসার কারণ, এখানে নিয়মিত আসেন ছাত্রনেতা রফিকুল ইসলাম। তাকেই সিরাজুলের দরকার। দুপুরের পর রফিকুল এসে যান। লাইব্রেরি ঘরে দুজনের অনেকক্ষণ কথা হয়।

গণবাহিনী সম্পর্কে বেশ কিছু নির্দেশনা দিলেন সিরাজুল। কয়েক দিনের মধ্যে ঢাকা মহানগর কমিটি গঠন হয়ে যায়। কর্নেল তাহেরের ছোট ভাই আনোয়ার হোসেন কমান্ডারের দায়িত্ব পেলেন। দায়িত্ব পাওয়ার পর ব্যস্ত হয়ে উঠলেন আনোয়ার। শুরু হয় দল গোছানোর কাজ। রাজনৈতিক দায়িত্ব থাকা রফিকের সঙ্গে কোনো কথা না বলে ঢাকাকে কয়েকটি অঞ্চলে ভাগ করেন। এই অঞ্চলকে আলাদা আলাদা ইউনিটের ওপর দায়িত্ব দেয়া হয়। গণবাহিনীর কেন্দ্রীয় কমান্ড থাকলেও ঢাকা নগর কমিটির ওপর কোনো নিয়ন্ত্রণ ছিল না। নগর কমিটি চলত আনোয়ারের নির্দেশে।

ঢাকার প্রতিটি ইউনিট অস্ত্রভাণ্ডার গড়ে তোলে। ডিএমজি বা ডাকাত মারার গান হলো কাটা রাইফেলের নাম, গণবাহিনীর প্রিয় অস্ত্রের নাম। এ ছাড়া স্টেনগান, পয়েন্ট থ্রি রিভলবার, পয়েন্ট টু টু রিভলবার এবং সেভেন পয়েন্ট সিক্স পিস্তলের যথেষ্ট বড় মজুদ গড়ে উঠতে থাকল। গুলি সংগ্রহ করা হতো পিলখানার বিডিআর সদস্যদের থেকে।

ছদ্মনামে গোপনে চলাফেরা করতেন জাসদ গণবাহিনীর নেতারা। বদলে গেল ঢাকার নেতাদের নাম।

আনোয়ার হোসেন হয়ে গেলেন কাইয়ুম। রফিকুলের পোশাকি নাম শামীম, বাহারকে ডাকা হতো আসাদ বলে। কেন্দ্রীয় নেতাদেরও নাম পাল্টে যায়। কাজী আরেফ আহমেদের ছদ্মনাম ছিল আনিস। আহাদ বলে ডাকা হতো শরীফ নুরুল আম্বিয়াকে। সিরাজুল ইসলাম খানকে সবাই দাদা ডাকতেন।

সিরাজুল ভারতে চলে যাওয়ার কয়েক দিন পর বোম্বে থেকে ঢাকায় ফিরলেন মেজর রশিদ।

এতে এক লাফে ফারুকের শক্তি বহুগুণ বেড়ে যায়। রশিদ ফিরে আসার দিন থেকে প্রতিদিন একটু একটু করে পাকা হতে থাকে খুনের পরিকল্পনা। এবার ফারুক-রশিদ ভাবলেন, এমন একজন লোককে আমাদের দরকার, যাকে ক্ষমতায় বসানো যাবে, আর তার পেছনে থেকে আমরা কলকাঠি নাড়ব।

রশিদ বললেন, আমার প্রথম পছন্দ জিয়া। তার ওপর আমাদের আস্থা আছে। ফারুক বললেন, তোমার প্রস্তাবটা ভালো। তবে একজন উপপ্রধান এবং মেজর জেনারেলকে কীভাবে এই প্রস্তাব করা যায়? সরাসরি কিছু বললে ঝামেলা হতে পারে।

রশিদ বললেন, সরাসরি না বলে একটু ঘুরিয়ে-পেঁচিয়ে বলো। বলার আগে মনের ভাবটা বুঝে নাও। আর একজন আছেন, আমি তার সঙ্গে কথা বলছি।

কে তিনি?

খন্দকার মোশতাক আহমদ।

তাঁর সঙ্গে আমার এক ধরনের যোগাযোগ হয়েছে।

কীভাবে? কার মাধ্যমে?

করিমের সাহায্যে।

নামটা চেনা, তবে এই মুহূর্তে মনে পড়ছে না। কে বলো তো?

পাকিস্তান সেনাবাহিনীতে ছিলেন, এখন রিটায়ার্ড।

ও ও ও, মনে পড়েছে।

কীভাবে পরিচয় হলো?

করিম সাহেব ক্যান্টনমেন্ট এলাকায় এসে খুঁজে বের করেছেন।

তাকে বিশ্বাস করা যায়?

অবশ্যই। আমি বাজিয়ে দেখেছি। তোমার ফিরে আসার কথা বলেছি। দু-এক দিনের মধ্যে তোমার সঙ্গে কথা হবে।

ফারুকের কথা শুনে স্বস্তি পান রশিদ।

নবোদ্যমে শুরু হলো যোগাযোগ।

এখন মার্চ মাস।

এই মাসের শেষ প্রান্তে বন্যায় ক্ষতিগ্রস্তদের উন্নয়ন পরিকল্পনা কর্মসূচির চট্টগ্রাম বিভাগীয় সম্মেলনের আয়োজন হয়েছে কুমিল্লার বার্ডে। এই কর্মসূচির দায়িত্ব পেয়েছেন মাহবুবুল আলম চাষী। সম্মেলনে যোগ দিয়েছেন খন্দকার মোশতাক, তাহেরউদ্দিন ঠাকুর, অধ্যাপক নুরুল ইসলাম, অধ্যাপক খুরশিদ আলম এবং মাহবুবুল আলম চাষীসহ অনেকে। সবার পেছনের উদ্দেশ্য ভিন্ন।

সম্মেলনের দ্বিতীয় দিনের বিকেলে একটা জিপ এসে দাঁড়ায় বার্ড অফিসের রেস্টহাউসের সামনে। নেমে এলেন রশিদ। সঙ্গে আরো একজন। রশিদের গায়ে হালকা নীল রঙের হাফ শার্ট। পুরু কাপড়ের প্যান্ট। দুজন হনহন করে ঢুকে পড়লেন মোশতাকের রুমে। তিনি গেস্টহাউসে বিশ্রামে। কিছুক্ষণ পর তাহেরউদ্দিন ঠাকুর ও মাহবুবুল আলম চাষী এই রুমে প্রবেশ করেন। ভেতর থেকে ছিটকানি আটকে দেয়া হয়। তাহেরউদ্দিন ঠাকুর জানালার পর্দা টেনে দিলেন। মোশতাক বললেন, আমি তোমার কথা শুনেছি। সরকার বদল করতে তোমাদের মতো সাহসী মানুষের বড়ই অভাব। রশিদ বললেন, আপনার মতো মানুষই বা কয়জন আছে এই দেশে? মোশতাক বললেন, তোমরা একজনের সমর্থন নাও।

কে তিনি?

জিয়াউর রহমান।

এই নাম আমরাও ভেবেছি।

তার সঙ্গে কথা হয়েছে?

এখনো হয়নি।

ওর সমর্থন নাও। মোশতাকের শেষ কথা।

এই ঘরের ভেতর পায়চারি করছেন তাহেরউদ্দিন। বললেন, আপনাকে রাষ্ট্রপ্রধান দেখতে চাই। মুচকি হেসে মাথা নাড়লেন মোশতাক। আলোচনার শেষে মোশতাক বললেন, 'আবারও বলছি সবার আগে জিয়ার সঙ্গে কথা বলো।' সবাই মাথা নাড়লেন। এমন সময় মাগরিবের আজান ধ্বনি ভেসে এল। রুম থেকে বেরিয়ে

এলেন রশিদসহ সবাই। বাইরে এসে সবাই হাঁটতে শুরু করলেন অপরিচিতের মতো, যেন কেউ কাউকে চেনেন না।

জিপের কাছে এসে দাঁড়ালেন রশিদ। এদিক-ওদিক তাকালেন। বাজপাখির দৃষ্টি। ভালো করে বুঝে নিলেন আশপাশের কেউ দেখে ফেলেছে কি না? সন্ধ্যা শুরুর সময় জিপ ছুটে চলল ঢাকার পথে। রাতে একসঙ্গে হলেন রশিদ ও ফারুক। সাড়ে এগারোটার কিছুক্ষণ পর। আলোচনার বিষয়, কীভাবে জিয়ার সমর্থন পাওয়া যাবে? ঘণ্টাখানেক কথা হলো। কোনো সমাধানসূত্র বেরিয়ে এল না।

তিন দিন পর খণ্ড খণ্ড বৈঠক হলো আগামসি লেনে মোশতাকের বাড়িতে।

আলোচক করিম, ফারুক, রশিদ এবং তাহেরউদ্দিন ঠাকুর। পারিবারিক কাজে ব্যস্ত থাকায় আসতে পারেননি মাহবুবুল আলম চাষী। আলোচনার শুরুতে মোশতাক বললেন, সবার আগে জিয়ার সমর্থন দরকার। একই কথা উঠছে বারবার। ঠিক হলো ফারুক যাবেন জিয়ার সঙ্গে দেখা করতে ৩০ মার্চ বৃহস্পতিবার।

এখনো সন্ধ্যা নামেনি।

দিনের আলো নুয়ে পড়েছে ক্যান্টনমেন্টের বড় বড় গাছগুলোর ওপর। জিয়াউরের বাংলোর সামনে ফারুক। সিকিউরিটি স্যালুট জানালেন। লম্বা বারান্দায় বেতের চেয়ার পাতা। সিকিউরিটির দায়িত্বে থাকা সেনা বললেন, এখানে বসুন, স্যারকে খবর দিচ্ছি।

কিছুক্ষণ পর ভেতর থেকে জিয়া বেরিয়ে এলেন। স্যালুট দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকলেন ফারুক। জিয়া বললেন, বসো। শুরু হয় কথাবার্তা। ফারুক বললেন, দেশে দুর্নীতি বেড়েই চলেছে। সবকিছু চলছে ভুল পথে। এসবের বদল দরকার।

চারদিকে তাকিয়ে দেখলেন জিয়া।

সতর্ক চোখ। দেখে নিলেন আশপাশে কেউ আছে কি না?

না, কেউ নেই।

বললেন, চলো লনে গিয়ে কথা বলি।

এ কথা শুনে দম পায় ফারুক। বাংলোর বাইরে বিরাট লন। সবুজ ঘাসে ভরা। চারপাশে ফুলের গাছ। নানা রঙের ফুল ফুটে আছে। মুখোমুখি বসলেন দুজন।

কথা তুললেন ফারুক, আমরা পেশাদার সৈনিক। কোনো ব্যক্তির না। দেশের এই অবস্থার পরিবর্তন দরকার। আমরা জুনিয়র অফিসাররা একটা পরিকল্পনা করেছি। আপনার সহযোগিতা চাই।

জিয়া বললেন, নিজেকে জড়াতে চাই না। তোমরা যদি কোনো ছক করেই থাকো, সেটা তোমাদেরই পূরণ করতে হবে। আমাকে বাইরে থাকতে দাও।

নিজেকে সরাসরি জড়াতে চাইলেন না জিয়া। নাছোড় ফারুক। সমর্থন চান। কথা আর এগোলো না। মৌন সমর্থন নিয়ে ফারুক চলে এলেন আগামসি লেনে। আগে থেকে এখানে রশিদ বসে আছেন। সবাই ফারুকের অপেক্ষায়। ভেতরের ঘরে মোশতাক। বেরিয়ে এসে বললেন, সব ঠিক আছে তো? ফারুক বললেন, অল আর ওকে।

কয়েক দিন আগে পরিকল্পনা হয়েছে ৩০ মার্চ রাতে বঙ্গবন্ধুর ধানমন্ডির বাড়ি আক্রমণ করা হবে। আজ সেই দিন। বেশিক্ষণ না বসে রশিদ আর ফারুক বেরিয়ে এলেন মোশতাকের বাড়ি থেকে। পরিকল্পনায় ছিল কয়েকজন সেনা ধানমন্ডি এলাকা ঘিরে থাকবে। বিমান থেকে বোমা ফেলবে স্কোয়াড্রন লিডার লিয়াকত।

ডিনার শেষ করে বিছানায় শুয়ে পড়লেন ফারুক। ঘুম আসছে না, উঠে পড়লেন। একটার পর একটা সিগারেট ছাই হতে থাকে। ফোনের অপেক্ষা করছেন। বারবার চোখ যাচ্ছে ফোনের ওপর।

ফরিদা বললেন, কী হয়েছে তোমার? কোনো উত্তর দিলেন না। রাত শেষে সকালের আলো ফুটেছে। এখনো কোনো ফোন এল না। তার মানে রাতে বোমা হামলা হয়নি? কেউ কি ফাঁস করেছে পরিকল্পনা? ফারুকের মাথার গরম নামছে না। কিছুক্ষণ পর পর গোসল করছেন। ঘুমের ওষুধে কাজ হচ্ছে না। এরপর দুই দিন ঘর থেকে বের হলেন না। ফোনে আড়িপাতা হতে পারে, এই ভয়ে কোথাও ফোন করলেন না। দুই দিন পর বাসায় এলেন রশিদ। ফারুক বললেন, কী খবর?

ব্লাডি লিয়াকত সাহস পায়নি।

তাহলে কি ফাঁস হয়ে গেছে সব?

না, তা হয়নি।

এখন কী করব?

নতুন পরিকল্পনা করতে হবে।

ফারুক সাহস ফিরে পায়।

দুই দিন পর দুপুরে রশিদের সঙ্গে বাসায় লাঞ্চ করলেন। এরপর দুজন একটা ঘরের ভেতরে বসলেন। দরজা বন্ধ। সতর্ক দৃষ্টি। কোনোভাবেই যেন কথা বাইরে না যায়। জানালা আটকে দিতে দিতে ফারুক বললেন, মহড়ার দিন আমার ও আপনার বাহিনীর ৬০০ সেনার যদি অর্ধেকও পাওয়া যায় তাহলে অপারেশন সাকসেস। পাকা হতে থাকে পরিকল্পনা। ৩০ মার্চের পরিকল্পনা ভেস্তে যাওয়ার

কারণে ফারুক এখন অনেক বেশি সতর্ক। কেউ যেন কিছু বুঝতে না পারে, সেজন্য সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় অনুষ্ঠানে যাওয়া বাড়িয়ে দিলেন।

বিরোধীদের নৈরাজ্যে কেঁপে উঠছে দেশ। দুর্ভিক্ষের ক্ষত এখনো শুকায়নি।

নিত্যপণ্যের দাম মগডালে বসে পা দোলাচ্ছে। এসবের দিকে কোনো চোখ নেই ফারুক দম্পতির। সেজেগুজে ঘুরে বেড়াচ্ছেন নানা জায়গায়, কেউ যেন মনের অবস্থা বুঝতে না পারে। রাত হলে নোটবুক নিয়ে বসেন। পাকা হতে থাকে পরিকল্পনার ছক।

৩০ মার্চে হামলা করতে না পারার পর ফারুক ভেবেচিন্তে এগোচ্ছেন। পরিকল্পনায় কোনো ফাঁক রাখতে চান না। নির্ঘুম রাত কাটছে। ঘুমের ওষুধে কাজ হচ্ছে না। ফরিদা বললেন, তুমি একবার আন্ধা বাবার সঙ্গে দেখা করে এসো। দেখো, তিনি কী বলেন?

আন্ধা বাবা মানে চট্টগ্রামের হালিশহরে বাস করা একজন পীর। অন্ধ বলে তিনি আন্ধা হাফেজ নামে পরিচিত। ফারুক এবং ফরিদার পরিবারের সবার আস্থা এই পীরের ওপর। তাঁর ভবিষ্যদ্বাণী মিলে গেছে অনেকবার। সবার বিশ্বাস, তিনি ভবিষ্যৎ দেখতে পান, দোয়া করলে তা ফলে যায়।

ফরিদার প্রস্তাব মনে ধরে। ফারুক বলে, দু-চার দিনের মধ্যে যাওয়া যাক। কাকতালীয়ভাবে সুযোগটা হাতে এসে যায়। ২ এপ্রিল চট্টগ্রামের হাটহাজারীর কাছে ট্রেনিং পড়ল। রেঞ্জ ফায়ারিংয়ের শিডিউল। এপ্রিল মাসের ঠাটা গরম। কোনো গাছের পাতা দুলছে না। কীটপতঙ্গ চেঁচামেচি করছে। দুর্যোগের অভাস পায় এরা। তখন এ রকম চিৎকার করে। আজ দিনের বেলায় ঝিঁঝি পোকা ডাকছে।

ফারুকের গায়ে কালো পোশাক। ঘামে ভিজে যাচ্ছে। আকাশে মেঘের দল এল আবার ভেসে চলেও গেল। বৃষ্টি হচ্ছে না। হাটহাজারীর জঙ্গলে মাঝারি পাল্লার কামানে দুই দফা ফায়ার করে জোয়ানরা ক্লান্ত। একটা বড় গাছের তলায় ফারুক দলবল নিয়ে বিশ্রাম করছেন।

এমন সময় একজন জোয়ান বললেন, স্যার আপনি কি ক্লান্ত? ফারুক বললেন, সৈনিকরা কখনো ক্লান্ত হয় না। তারা সব সময় মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত থাকে। এ তো কোনো কষ্টই না, মুক্তিযুদ্ধের সময় অনেক কষ্ট করেছি। এই গরম সেই অনুপাতে কিছুই না।

ওই জোয়ান মাথা নাড়ায়।

ফারুক বললেন, জানো মুক্তিযুদ্ধের সময় একজন পাকিস্তানি অফিসারকে ধরেছিলাম। ওই জোয়ান এর আগে অনেক বার এই গল্প শুনেছে। তবুও এখন না-শোনার ভান করল। শুনেছি বললে স্যার অসন্তুষ্ট হতে পারেন। তাই কৌতূহল নিয়ে বলল, স্যার বলেন তো শুনি।

নামটাই তো মনে করতে পারছি না। আজকাল নাম মনে থাকছে না ফারুকের। কিছুক্ষণ পর নামটা মনে পড়ে। ওই পাকিস্তানির নাম ছিল ক্যাপ্টেন শামস। অল্প বয়স। অসাধারণ দেখতে। ধবধবে ফরসা। আমাদের দেশে এ রকম চেহারার মানুষ দেখা যায় না। পাকিস্তানিদের চেহারা আরব দেশের লোকদের মতো। তারা লম্বা ও সুন্দর হয়।

এ কথা শুনে ওই জোয়ান বললেন, ধরা পড়ার পর কী হলো?

তাকে হত্যা করা হয়। আমি হত্যা করেছি।

মৃত্যুর আগে ক্যাপ্টেন শামস কিছু বলেনি?

ফারুক বললেন, বলেছিল। সে চা-কফির সাথে সিগারেট খেতে চেয়েছিল।

দিয়েছিলেন? জোয়ানের কৌতূহলী প্রশ্ন।

চা, কফি কিছুই দিতে পারিনি। একটা সিগারেট দিয়েছিলাম। কী সিগারেট দিয়েছিলাম? এই নাম মনে নেই। সম্ভবত কে-টু সিগারেট।

ক্যাপ্টেন শামসকে মারার জন্য কী আপনার মন খারাপ হয়?

না, তা হবে কেন? আমি নিজের হাতে পাখির মতো গুলি করে মেরেছিলাম। এ কথা বলে নিজের ডান হাত একটু ওপরে তুলে তাকালেন ফারুক। কৌতূহলী জোয়ানকে বললেন, এই হাতে অনেক পাকিস্তানিকে মেরেছি। না মারলে কি আর দেশে স্বাধীনতা আসত?

না, আসত না। স্বাধীনতার জন্য অনেক রক্ত লাগে।

ফারুক বললেন, ঠিক কথা বলেছ। একটা গাড়ি রেডি করো। আমি হালিশহর যাব। একজনের সঙ্গে দেখা করতে হবে। আবার রাতেই ফিরে আসব।

স্যার কার কাছে যাবেন?

একজন পীরের কাছে যাব। নাম আন্ধা হাফেজ। তিনি চোখে দেখেন না। কিন্তু ভবিষ্যৎ সম্পর্কে অনেক কিছু বলতে পারেন। পরে সব মিলে যায়। এই আন্ধা হাফেজের অনেক ক্ষমতা। এ রকম ক্ষমতা সবার হয় না। পীর সাহেবরা এ রকম বলতে পারেন। তুমি কি জানো? আমিও পীর বংশের।

জানি না স্যার।

ফারুক বললেন, ভেরি স্যাড। তোমার জানা দরকার ছিল। ও-কে, জানো না এবার জেনে নাও। আমি যে পীর বংশের সন্তান সেই হিসেবে এখন আমার গদিনসীন থাকার কথা। অথচ দেখো আমার কোনো গদি নেই। আমার হাতে রাইফেল, পিস্তল। তসবির বদলে গুলি।

স্যার এতে কি আপনার আফসোস হয়?

না হয় না, সৈনিকদের আফসোস থাকতে নেই।

ফারুক আরো কিছু বলতে যাবেন, এমন সময় মিলিটারি পিকআপভ্যান সামনে চলে আসে। ফারুক উঠে বসলেন সামনের সিটে। গাড়ি এগিয়ে চলল হালিশহরের দিকে। এই রাস্তাটা ভালো না, বেশিরভাগ জায়গায় ছাল ওঠা। দুই ঘণ্টা লাগল আন্ধা হাফেজের আস্তানায় পৌঁছতে।

টিনের ঘর। ওপরে টিন আবার বেড়াও টিনের। গরমে টিন ঝকমক করছে। মনে হচ্ছে টিনের গায়ের সঙ্গে মরীচিকা খেলা করছে। গাড়ি থেকে নেমে ভেতরে গেলেন ফারুক। সালাম জানিয়ে বসলেন।

মাঝারি আকারের ঘরের এক কোনায় নরম বিছানা পাতা। এর ওপর আন্ধা হাফেজ বসে আছেন। গায়ে সাদা আলখেল্লা। মাথায় সবুজ পাগড়ি। বড় দাড়ি। বড় চোখ। তবে এই চোখে দৃষ্টি নেই। আতরের সুবাস ছড়িয়ে আছে চারদিকে। গণ্যমান্য কোনো অতিথি এলে পীর বাবার সঙ্গে একা একা কথা বলেন। তখন কোনো খাদেম বা দর্শনার্থী কাছে থাকেন না। ফারুক আসার পর সবাই ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

আন্ধা হাফেজ ডান হাতটা জাগিয়ে তুললেন। ফারুক ডান হাত এগিয়ে দিলেন। কবজির কাছে শক্ত করে ধরলেন হাফেজ। শরীরের ভেতর গরম-কাঁপুনি উঠল। শরীরের ভেতর দিয়ে হাই ভোল্টেজ বিদ্যুৎ বয়ে যায়। ফারুকের মনে হলো, তার শরীর অবশ হয়ে যাচ্ছে। এভাবে বেশ খানিকটা সময় গড়িয়ে যায়। মাথার ওপর ফ্যান ঘুরছে। তা-ও গরম যাচ্ছে না। ফ্যানটা পুরোনো। মাঝেমধ্যে খটখট শব্দ করছে।

আন্ধা হাফেজ উর্দু ভাষায় কথা বলেন। তিনি বাংলা জানেন না। বিহারিরা পরিষ্কার উচ্চারণে উর্দু বলতে পারেন না। হাফেজ বললেন, আপনি একজন সৈনিক মানুষ। আমার কাছে আসবেন জানতাম। কেন এসেছেন তাও জানি। তবে আপনি বলুন কী করতে পারি আপনার জন্য।

আমি যে সৈনিক তা কী করে বুঝলেন?

আন্ধা হাফেজ ঠোঁট চেপে হাসলেন।

ফারুক কাছে এসে বসেন। কিছুক্ষণ পর হাফেজ বললেন, 'একটা ভয়ংকর কিছু করতে যাচ্ছ। করতে চাও করো। তবে আমি যা বলব তা অবশ্যই পালন করবে। না হলে ধ্বংস হয়ে যাবে।' এ কথা বলে ফারুককে তিনটি নীতি মেনে চলার পরামর্শ দিলেন।

ব্যক্তিগত লাভের জন্য কিছু করবে না।

শক্তি অর্জন করো এবং সঠিক সময় বেছে নাও।

সঠিক সময় বুঝব কী করে?

তিন মাস অপেক্ষা করো।

এ কথা শোনার পর ফারুক ভাবলেন এই নির্দেশ তাদের কাছে স্বর্গীয় বার্তা। মনে আর কোনো ভয় থাকল না। এবার নির্ভয়ে এগিয়ে যাওয়া। বেরিয়ে আসার আগে কাপড়ে মোড়ানো একটা প্যাকেট হাফেজের হাতে দিলেন। বললেন, আপনার জন্য সামান্য কিছু। বেশ মোটাসোটা প্যাকেট। এতে টাকা।

ফারুক অনুমতি চাইলেন। চলে আসতে চান। আন্ধা হাফেজ হাত তুলে বললেন, আপনার জন্য সামান্য উপহার। পাথরের একটা তসবি এগিয়ে ধরে বললেন, এই উপহার হয়তো আপনার কোনো কাজে আসবে না, তবু। ফারুক লজ্জা পেলেন। না না এমন করে বলবেন না, আপনার স্মৃতিধন্য তসবি কেন, যে-কোনো জিনিসই মহামূল্যবান।

হাফেজ হাসলেন।

ফারুক বেরিয়ে আসার সময় দুইটা বেড়াল এসে কাছে বসে। ফারুক ভাবলেন, এই বিড়ালরাও অন্ধ। হাফেজের আস্তানা থেকে বেরিয়ে এলেন ফারুক। গাড়ি ছুটে চলল হাটহাজারীর দিকে। সারা দিনের ভ্যাপসা গরম শেষে সন্ধ্যার আগে আকাশে উড়ে এসেছে মেঘের দল। ঘন ঘন বিজলি চমকাচ্ছে।

একদিন সুমনের কাছে জানতে চাই। এই আন্ধা হাফেজ কে? তিনি কি অলৌকিক শক্তিধর?

সুমন বলে, এই লোকটি পাকিস্তান গোয়েন্দা সংস্থার চর।

১৯৭৫ সালের এপ্রিল মাস।

কমনওয়েলথ সম্মেলনে যাওয়ার আগে প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে দেখা করেছেন 'র'-প্রধান কাউ। বললেন, ঢাকায় বড় কিছু ঘটতে চলেছে। একটু থেমে কাউ বললেন, শেখ সাহেবকে বলবেন, তিনি যেন সচেতন থাকেন। আপনারা ওঁকে কোনো বার্তা দেননি, বললেন ইন্দিরা।

দিয়েছি, তিনি বিশ্বাস করেন না।

বিশ্বাস সব সময় মঙ্গল করে না, বিপদ ডেকে আনে।

কিংস্টনে আপনার সঙ্গে নিশ্চয়ই দেখা হবে, ওনাকে সতর্ক করবেন।

আচ্ছা, বলব।

দেশ-বিদেশের গুরুত্বপূর্ণ অতিথির ভিড়ে কিংস্টনে এখন চাঁদের হাট।

কমনওয়েলথ সম্মেলন উপলক্ষে বিদেশি সাংবাদিকরা গিজগিজ করছেন। আশপাশের সবার চোখ এড়িয়ে বঙ্গবন্ধুকে কিছু কথা বলতে চান ইন্দিরা। সম্মেলন

কেন্দ্রের লবিতে সুযোগ তৈরি হলো। কুশল জানতে না চেয়ে বললেন, বাংলাদেশে অঘটন ঘটতে চলেছে, আপনি সাবধান হোন।

বঙ্গবন্ধু হেসে বললেন, ম্যাডাম, এর প্রমাণ কোথায়?

আমি শুধু বলতে পারি, সাবধান হোন।

না, না, সবাই আমার সন্তান।

এরপর কিছু একটা বলতে যাবেন, এমন সময় দুজন বিদেশি সাংবাদিক কাছে চলে আসায় আর কিছু বলতে পারলেন না। কথা বন্ধ করে সরে গেলেন ইন্দিরা। সম্মেলন শেষে দেশে ফিরে এসে বঙ্গবন্ধু চিন্তিত হয়ে পড়লেন। এদিকে সমাজের শরীরে দুর্নীতির ভাইরাস ছড়িয়ে পড়ছে। সংকট উত্তরণের পথ খুঁজতে গিয়ে ভুলে যান নিজের নিরাপত্তার কথা।

দেশে ফিরে আসার পর বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে দেখা করার চেষ্টা করলেন ব্রিগেডিয়ার রউফ। তার কাছে খবর ছিল, ট্যাংক বাহিনীর কয়েকজন অফিসার যে-কোনো সময় গণ্ডগোল করতে পারে। এই খবর জানার পর ট্যাংক রেজিমেন্টের কমান্ডিং অফিসার ব্রিগেডিয়ার মোমেনের সঙ্গে দেখা করেন রউফ। সব খুলে বললেন। ষড়যন্ত্রের মূলে ট্যাংক রেজিমেন্টের দ্বিতীয় প্রধান মেজর ফারুক। মোমেন বললেন, বিষয়টা গোপনে প্রেসিডেন্টকে জানানো দরকার।

দেখা করার শিডিউল পাওয়া যাচ্ছিল না। আরো দুই দিন চলে গেল। চট্টগ্রাম ডিভিশনের ব্রিগেডিয়ার গোলাম দস্তগীরকে সঙ্গে নিয়ে রউফ এলেন ধানমন্ডির বাড়িতে। রাত দশটার পর, পড়ার ঘরে দেখা হলো। রউফ বললেন কিছুসংখ্যক সেনা কর্মকর্তা সরকার বদলের ষড়যন্ত্র করছে। এসব শুনে বঙ্গবন্ধুর মনের অবস্থার বদল হলো না। চিন্তিত বা উদ্বিগ্ন দেখা গেল না। পাইপ টানতে টানতে বললেন, আমি সব জানি।

এই বৈঠকের পর রউফ চলে যান লন্ডন। তিন মাসের ট্রেনিংয়ে।

১৩ মে সন্ধ্যায় মার্কিন দূতাবাস কর্মকর্তা গ্রেসামের বাসায় ডোরবেল চাপলেন ফারুক। ভেতর থেকে দরজা খুলে দিলেন সাদা চামড়ার একজন। পরিপাটি বসার ঘর। জানালা দরজায় ভারি পর্দা ঝুলছে। দেয়ালে মার্কিন প্রেসিডেন্টের ছবি। ঘরে অল্প আলো। ক্যাসেট প্লেয়ারে মিউজিক বাজছে। বিদেশি মিউজিক। শিল্পীর নাম ফারুক জানেন না। সংগীত নিয়ে তার কোনো আগ্রহ নেই।

বসার ঘরে বসে আছেন গ্রেসাম। এর আগে একবার ফারুক এসেছিলেন। সন্ধ্যা গড়ানোর পর সবেমাত্র হুইস্কি নিয়ে বসেছেন। সামনে রাখা জ্যাগডিনিয়াল হুইস্কির বোতল। একটা পাত্রে বরফ-টুকরো। এমন সময় ফারুক এলেন।

মিউজিক বন্ধ করে দেব?

ফারুক বললেন, না ভালোই তো লাগছে।

হুইস্কির গ্লাস দেখিয়ে বললেন, চলবে?

চলবে।

দুই গ্লাসে হুইস্কি ঢালা হলো। পানপাত্র হাতে নিয়ে দুজন একসঙ্গে বললেন চিয়ার্স।

কথা তুললেন ফারুক 'সরকারের প্রতি সেনাবাহিনী খুবই অসন্তুষ্ট। দুর্নীতিগ্রস্ত আওয়ামী লীগ নেতাদের গ্রেপ্তার করতে দিচ্ছে না, নিষেধ করে সেনাবাহিনীকে।'

আপনি এখানে এসেছেন, সিনিয়র কেউ কি তা জানেন?

উচ্চপর্যায়ের কর্তার নির্দেশ পালন করতে এসেছি।

একথা-সেকথা বলে ফারুক বললেন, সরকার উৎখাত করলে যুক্তরাষ্ট্র কীভাবে নেবে? গ্রেসাম বললেন, 'এটা বাংলাদেশের নিজেদের বিষয়। বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে যুক্তরাষ্ট্র হস্তক্ষেপ করবে না।'

আগেরবার গ্রেসামের বাসায় এসে ফারুক বলেছিলেন, সাঁজোয়া বাহিনীর কোনো সাঁজোয়া যান নেই। বাংলাদেশ কিনতে চায়। গ্রেসাম ভেবে পায় না, মেজর পর্যায়ের একজন কর্মকর্তা এই ধরনের প্রস্তাব নিয়ে আসে কী করে? ফারুক নানাভাবে গ্রেসামের সঙ্গে সম্পর্ক গড়তে চান।

গণ্যমান্য মানুষের সঙ্গে ফারুক পরিবারের সম্পর্ক অনেক পুরোনো। পুরো নাম দেওয়ান ইশরাতুল্লাহ সৈয়দ ফারুক রহমান। রাজশাহীর বিশিষ্ট পীর বংশের সন্তান সৈয়দ আতাউর রহমান ফারুকের বাবা। সেনাবাহিনীর চিকিৎসক ছিলেন। তিন ভাইবোনের মধ্যে ফারুক সবার বড়। মা ছিলেন জামালপুর এলাকার জমিদার পরিবারের।

পারিবারিক সূত্রে অনেকের সঙ্গে সম্পর্ক। পূর্ব পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী আতাউর রহমান, সৈয়দ নজরুল ইসলাম এবং বঙ্গবন্ধু সরকারের একসময়ের অর্থমন্ত্রী এ আর মল্লিকসহ অনেক পরিবারের সঙ্গে সম্পর্ক ছিল।

কিশোর বয়সে বিমান চালানোর ঝোঁক বাড়ে। সতেরো বছর বয়সে ফ্লাইং ক্লাব থেকে বিমান চালানোর লাইসেন্স পান। ইচ্ছা ছিল বিমানবাহিনীতে যোগ দেবেন, তা পারেননি। তখন ব্রিস্টল বিশ্ববিদ্যালয়ে অ্যারোনটিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং পড়তে ভর্তি হন। সবকিছু ঠিকঠাক আর দুই মাস পর দেশ ছাড়বেন।

এমন সময় ১৯৬৫ সালে কচ্ছের রান এলাকা নিয়ে পাকিস্তান-ভারত উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। যে-কোনো সময় যুদ্ধের আশঙ্কা। সেনাবাহিনীতে অফিসার পদে লোক নেয়ার বিজ্ঞপ্তি চোখে পড়ে। ফারুক পরীক্ষায় বসেন এবং নির্বাচিত হন। চলে যান পাকিস্তান সেনাবাহিনীতে।

পাকিস্তানের রিসালপুর মিলিটারি একাডেমিতে প্রশিক্ষণের পর চূড়ান্ত পরীক্ষায় ৪০০ ক্যাডেটের মধ্যে ফারুক চতুর্থ হয়েছিলেন। ওই সময় একাডেমির প্রশিক্ষক ছিলেন মেজর জিয়াউর রহমান এবং মেজর খালেদ মোশাররফ। তখন থেকে এই দুজনের সঙ্গে সম্পর্ক। ব্যক্তিজীবনে খালেদ মোশাররফ ফারুকের মামা। রিসালপুর একাডেমিতেই পরিচয় হয়েছিল রশিদের সঙ্গে।

পাঞ্জাব আর পাঠান ক্যাডেটের মধ্যে দুজন বাঙালি। তাই গলাগলি ভাব। বিকেলে বা সন্ধ্যার পর ক্যাফেটারিয়ায় ফারুক-রশিদের আড্ডা জমে উঠত। রশিদের বাড়ি কুমিল্লা-দাউদকান্দি সড়কের মাঝামাঝি এলাকা ছয়ফরিয়া গ্রামে। বাবা প্রাইমারি স্কুলশিক্ষক। ১৯৬৫ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়া শেষ না করে সেনাবাহিনীতে যোগ দেন।

ফারুক-রশিদ ভায়রা ভাই। পাকিস্তান রিসালপুরের ট্রেনিং শেষে ফারুক শিয়ালকোটে চলে আসেন। ১৯৭০ সালে ২৪ বছর বয়সে ক্যাপ্টেন পদে উঠে আসেন। এবং এই সময় সাঁজোয়া কোর্সে প্রথম হওয়ার ফলে সেনাজীবনে উন্নতির দুয়ার খুলে যায়। এ বছর চলে যান আবুধাবি; আর্মড রেজিমেন্টের স্কোয়াড্রন কমান্ডার হয়ে। আবুধাবির সঙ্গে পাকিস্তানের সেনা প্রশিক্ষণের চুক্তি ছিল। সেখানে খুব বেশি কাজ ছিল না। বিকেলটা ফাঁকা থাকত।

১৯৭১ সালের জুন মাসের শুরুর দিকে। ফারুক এদিন ব্রিটিশ অফিসার্স মেসে। হাতে নিলেন সানডে টাইমস পত্রিকা। সাংবাদিক অ্যান্থনি মাসকারেনহাসের লেখা প্রতিবেদন পড়ে দেশে ফেরার সিদ্ধান্ত নিলেন। ভাবনা মতো গুছিয়ে উঠতে একটু সময় লাগল। শখের গাড়িটা ছেড়ে ১২ নভেম্বর চলে আসেন দুবাই বিমানবন্দর। এরপর বাংলাদেশে।

১৯৭০ সালে কিছুদিনের জন্য খুলনায় বদলি হয়ে আসেন রশিদ। পূর্ব পাকিস্তান রাইফেলস প্রতিনিধি। কয়েক দিন পর এক লাখ টাকাসহ একজন সাধারণ সেনাকে আটক করেন। এ কারণে রশিদকে আবার ফিরিয়ে নেয়া হয় আর্টিলারি ইউনিটে। মুক্তিযুদ্ধের সময় মা অসুস্থ বলে স্ত্রী-কন্যাকে নিয়ে ঢাকা চলে আসেন।

স্ত্রীকে চট্টগ্রাম রেখে সোজা চলে যান আগরতলা। সিলেট সীমান্ত দিয়ে দেশে ফেরেন। এবং জিয়াউর রহমানের জেড ফোর্সের হয়ে মুক্তিযুদ্ধে যোগ দেন। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর দ্বিতীয় ফিল্ড আর্টিলারি রেজিমেন্ট হিসেবে উন্নীত করা হয়। মেজর খন্দকার আবদুর রশিদ কমান্ডিং অফিসার নিযুক্ত হন।

এবার যাব কুমিল্লায়।

সেখানে এখন চক্রান্তের আসর বসেছে।

১৯৭৫ সাল। জুন মাসের গরম। এর আগে মার্চে একবার কুমিল্লার বার্ড গেস্টহাউসে গোপন বৈঠক করার পর আবার কয়েক জন একসঙ্গে হয়েছেন। আজকের ভেন্যু আলাদা। বসার জায়গা দাউদকান্দি মোশতাকের গ্রামের বাড়ি।

পুরো এলাকা সরগরম।

স্থানীয় ফুটবল টুর্নামেন্টের আজ ফাইনাল খেলা। এলাকার লোকজন সবাই খেলা নিয়ে ব্যস্ত। খেলার ট্রফি বিতরণ অনুষ্ঠান তড়িঘড়ি শেষ করে বাড়িতে ফিরে আসেন মোশতাক। ভেতরের ঘরে বৈঠক। মোশতাক, তাহেরউদ্দিন ঠাকুর এবং শাহ মোয়াজ্জেম বসেছেন। চায়ের পেয়ালায় একবার চুমুক দিয়ে মোশতাক বললেন, দেশটা যে রসাতলে যাচ্ছে মোয়াজ্জেম, দেখতে পাও না? মোয়াজ্জেম ফিসফিস করে বললেন, একটা কিছু করুন।

সেটাই তো ভাবছি।

এদিকে দেশে ৬০ জেলা ঘোষণা করার প্রস্তুতি চলছে।

১৯ জুন প্রত্যেক জেলায় একজন করে গভর্নর নিয়োগের সিদ্ধান্ত নেন। তিন দিন পর জেলা প্রশাসনিক কাঠামো ঘোষণা হলো। এদিন প্রধানমন্ত্রী মনসুর আলী জাতীয় সংসদে নবগঠিত দল বাকশালের সংসদীয় দলের নেতা নির্বাচিত হন।

দলের গঠনতন্ত্র এবং সাংগঠনিক কাঠামো ঘোষণা করা হলো ৭ জুন। ১৯৭৫ সালের ১৯ জুন, বাকশাল কেন্দ্রীয় কমিটির প্রথম বৈঠক। মনসুর আলী দলের সেক্রেটারি জেনারেল। সেক্রেটারির দায়িত্বে তিন জন। জিল্লুর রহমান, শেখ ফজলুল হক মনি ও আবদুর রাজ্জাক।'

বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র স্লোগান দেয়া তরুণ যুবাদের সঙ্গে রক্ষীবাহিনীর সংঘর্ষ হয়। হতাহত অনেকে। তরুণ যুবারা জানতেন না, তথাকথিত রিলিফ কর্মী পিটার কাসটারাসদের সঙ্গে জাসদ গণবাহিনীর সম্পর্ক কী?

জাসদ গণবাহিনীর সঙ্গে রক্ষীবাহিনীর লড়াইটা ছিল মূলত সিআইএর সঙ্গে বাংলাদেশের শান্তিরক্ষা বাহিনীর লড়াই। কারণ, আমেরিকার নিক্সন সরকার, চীন ও পাকিস্তান চায়নি বাংলাদেশ ভালো থাকুক।

পাকিস্তান-প্রত্যাগত সেনাসদস্যরা ছিলেন ভারতবিদ্বেষী এবং মুসলিম বিশ্বের অনুগত। রক্ষীবাহিনী গঠন এবং অফিসারদের প্রথমে সাভার এবং পরে ভারতের দেরাদুনে পাঠানো হলে সেনাবাহিনীর ভেতর ক্ষোভের জন্ম হয়। ভারতবিদ্বেষী কর্মকর্তাদের মনোভাব বঙ্গবন্ধুবিরোধী হয়ে ওঠে।

পাকিস্তান-প্রত্যাগত সেনারা পাকিস্তানের বন্দিশিবিরে অনেকেই ১৮ মাস বন্দি ছিলেন। তারা ওই সময়ের বেতন-ভাতা নেয়ার দাবি করেন। বঙ্গবন্ধু বললেন, দেশের এই অবস্থায় তা সম্ভব নয়।

দ্বিতীয় কারণ, সরকার জাতীয় পে-কমিশন গঠন করে কমিশনকে সমাজতান্ত্রিক সমাজ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে বেতনের স্কেল নির্ধারণের পরামর্শ দেয়। তিন সদস্যের প্রতিনিধিদল বুলগেরিয়া, যুগোশ্লোভিয়া ও পূর্ব জার্মানিতে যায় সে দেশের পে-পলিসি পর্যবেক্ষণ ও ধারণা নেয়ার জন্য। দলের অন্যতম সদস্য জিয়াউর রহমান ফিরে এসে বললেন, 'Bangladesh should have pay policy involving of hardship in an equiyable manner. পে-কমিশনের প্রভাবশালী সদস্য জিয়াউর রহমান সেনাবাহিনীর জন্য যে সুপারিশ করেন, তা প্রকাশ হওয়ার পর অসন্তোষ বাড়ে।

পুরান ঢাকার টিভি ফ্রিজ মেরামতের দোকান।

শেরি এন্টারপ্রাইজ।

দোকান মালিকের নাম মেজর শাহরিয়ার। এখানে বেশ গুরুত্বপূর্ণ লোকজন আসে। সব সময় সরগরম থাকে। তবে আশপাশের কেউ জানে না, তারা এখানে কেন আসে? এসে কী করে? তারা অবাক চোখে দেখে। কারো মনে প্রশ্ন জাগে। আবার বেশিরভাগের মনে প্রশ্ন উঁকি দেয় না। তবে বুঝতে পারে, এরা সবাই সেনা অফিসার।

প্রতিদিন সন্ধ্যায় আসে ডালিম, নূর চৌধুরী, আজিজ পাশা এবং বজলুল হুদা। দোকানের এক কোনায় পাতা বেতের চেয়ারে বসে শুরু হয় ফিসফাস আলোচনা। কিছুক্ষণ পর গালিগালাজ। তাদের আলোচনার বিষয়, আওয়ামী লীগ সরকারকে কীভাবে ফেলে দেয়া যায়।

মহা উৎসাহে সরকারি কর্মচারী পরিষদের তিন লাখ পঞ্চাশ হাজার সদস্য বাকশালে যোগ দেয় ১০ আগস্ট ১৯৭৫। ক্ষমতাসীন দলের সদস্য হয়ে যাওয়ায় রাজনীতির সঙ্গে আটকে যায় প্রশাসন। সাধারণ মানুষের ভেতর নানা ধরনের প্রশ্ন ঘুরপাক খেতে থাকে। দ্বিধাদ্বন্দ্বে মানুষ। সচ্ছল মানুষের টেনশন বাড়ল। তারা ভাবলেন, সমাজতন্ত্র হলে সম্পদ কি হাতছাড়া হয়ে যাবে?

সেনা অভিযানে কুমিল্লা থেকে কয়েকজন গ্রেপ্তার হয়। এই ঘটনা নিয়ে দলে বেশ হইচই হয়। দলীয় সভায় সিদ্ধান্ত হয়, সেনাবাহিনী যেন আওয়ামী লীগের নেতাদের আটক না করে। দলীয় শৃঙ্খলাভঙ্গের কারণে আওয়ামী লীগের সাংসদ বেগম মমতাজকে বরখাস্তের আদেশ অনুমোদন করা হয়। দলের দুর্নীতিগ্রস্তরা শঙ্কায় পড়ে যায়। একই সঙ্গে শঙ্কা বাড়ে পাকিস্তানের শিল্পপতি পরিবারে।

সারা পাকিস্তানের ৪৩টি পরিবারের হাতে ছিল সকল ব্যবসা-বাণিজ্য। এই তালিকার ২৯ নম্বরে এ কে খান পরিবার। তার হাতে চৌদ্দটি বিমা কোম্পানির ৭৫ ভাগ এবং চৌদ্দটি বড় কোম্পানির দুই ভাগ। ব্যবসার পাশাপাশি রাজনীতি ও ক্ষমতার প্রাঙ্গণে ছিল খানের অবাধ চলাফেরা। আইয়ুব সরকারের আমলে পাকিস্তানের মন্ত্রী ছিলেন এবং মুক্তিযুদ্ধের সময় পাকিস্তানি সৈন্যদের নানাভাবে সহযোগিতা করেছেন। তাদের একজন এ কে খানের ভাই এম এস খান। তার দুই জামাই। রশিদ ও ফারুক।

জুলাইয়ের প্রথম দিন। রশিদের বাসায় দুজন একসঙ্গে বসলেন।

নোটবই বের করে টেবিলের ওপর রাখলেন ফারুক। বললেন, আক্রমণ বাস্তবায়নের জন্য অন্তত ৮০০ সেনা দরকার। কারণ ধানমন্ডি ৩২ নম্বরসহ তিনটি বাড়িতে আক্রমণ।

রক্ষীবাহিনী ঠেকানো এবং যে-কোনো ধরনের প্রতিরোধ এলে তার মোকাবিলা।

এই তিন ধরনের কাজে যে পরিমাণ সেনা দরকার, তা নেই। নোটবইয়ের পাতায় কাটাকুটি চলছে। অঙ্ক শেষে দাঁড়াল, ৩০০ সেনার কমে কোনোভাবেই অপারেশন সাকসেস করা যাবে না। রশিদকে জানান ফারুক। রশিদ বললেন, আমাদের দুজনের দলে যে সেনা আছে তা প্রায় ৩০০ জন। কাজেই অপারেশনে সেনা চাহিদা থাকছে না।

শুনে ফারুকের মাথা থেকে দুশ্চিন্তার বোঝা নেমে যায়। ১৯৭২ সাল থেকে ফার্স্ট বেঙ্গল ল্যান্সারের কিছু সেনাকে কমান্ডো হিসেবে তৈরি করেছেন। বাছাই করা সেনাদের নিয়ে নিয়মিত ট্রেনিং করাতেন।

এই দলে ১৫০ জন। এদের ফারুক ডাকতেন 'হান্টার কিলার টিম' বলে। এই টিমের সবাই প্রবল সাহসী এবং সবাই বিশ্বস্ত। হান্টার কিলার টিমকে আরো মজবুত বানানোর কাজ চলছে পুরোদমে। তবে টিমের কেউ জানে না, তাদের কোন কাজে লাগানো হবে? এমন সময় বিনা মেঘে বজ্রপাতের মতো একটা খবর এল, রশিদকে যশোরে বদলি করা হয়েছে।

কারণ, ভারতের গানারি স্টাফ কলেজ থেকে কোর্স করায় তাকে যশোরের গানারি স্কুলে বদলি করা হয়েছে। ফারুকের মাথা আবার তেতে উঠতে থাকে। রশিদ বললেন, ভেবো না। একটা উপায় বের করছি। পরদিন বদলির আদেশ থামিয়ে দেয়া হলো। এক মাসের ছুটিতে গেলেন রশিদ।

ঢাকা ব্রিগেড কমান্ডার কর্নেল শাফায়াত জামিল। তার মতামত জানা দরকার। সঙ্গে না থাকলেও যেন বিরোধিতা না করেন। এই ভাবনায় দেখা করতে গেলেন রশিদ।

দুপুরের আগে ব্রিগেড কমান্ডারের কাছে ছুটি নিতে এসে রশিদ বললেন, স্যার দেশের অবস্থা ভালো না, নৈরাজ্য চারদিকে, কিছু একটা তো হওয়া দরকার। শাফায়াত জামিল বললেন, হ্যাঁ তা তো বুঝলাম, আমরা কী করব?

'আপনার নির্দেশ ছাড়া কি আমি কিছু করতে পারব? আপনি আমার ব্রিগেড কমান্ডার।' রশিদের এ কথা শুনে আর কোনো উত্তর দিলেন না শাফায়াত। কথা আর এগোল না। অফিস থেকে ফিরে এসে বিকেলে দেখা করলেন ফারুকের সঙ্গে। প্রথম কথাই বললেন, সাবধান, কোনো অফিসারকে বিশ্বাস করবে না। এখানে এমন অনেকে আছেন যারা দ্বৈত ভূমিকায় কাজ করতে পারেন। তখন আমাদের বিপদ হবে।

ছুটি কাটানো শেষে রশিদ যশোর সেনানিবাসে যোগ দেন। কিছুদিন পরে অপ্রত্যাশিতভাবে কর্নেল শাফায়াত জামিল তাকে ঢাকায় বদলি করে নিয়ে আসেন, ১৯৭৫ সালের এপ্রিলে। দুই ভায়রা মিলে পরিকল্পনা বাস্তবায়নের পথে এগোতে থাকলেন।

রশিদের ফিল্ড আর্টিলারিতে আছে ছয়টি হাউইটজার, বারোটি যুগোশ্লোভিয়ার তৈরি ১০৫ মিমি হাউইটজার, এবং ৬০০ সেনা। ফারুকের দলে তিরিশটি টি-ফিফটি ট্যাংক এবং ৮০০ সেনা।

ফারুক বললেন, কারো মনে কোনো সন্দেহ না জাগিয়ে যদি তোমার-আমার সেনাদের সঙ্গে নিয়ে মুভ করি, তাহলে কোনো সমস্যা হবে না। এক করার উপায়টা কী? রশিদ বললেন, এটা নিয়ে ভেবো না, উপায় আছে। ফারুক বললেন, যা করার তাড়াতাড়ি করো।

১৩ জুলাই।

নোট বইয়ের পাতায় ফারুক বড় বড় অক্ষরে লাল কালির কলমে লিখে রাখলেন, কাজ শুরু।

এই কাজ শুরু সম্পর্কে অ্যান্থনি মাসকারেনহাসকে ফারুক বলেছেন, এরই মধ্যে আমি স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছে গিয়েছিলাম, মুজিবের মৃত্যু অনিবার্য। আজ বা কাল কিংবা পরশু। এটা কোনো ব্যাপারই না। আমার রণকৌশল তৈরি শেষ। আমার সৈন্য-সামন্তও প্রস্তুত। যে-কোনো পরিস্থিতিতেই হোক, আমি ১৩ জুলাই থেকে চূড়ান্তভাবে প্রস্তুত ছিলাম। আমার জীবন থেকে অতীত, বর্তমান সবই মুছে ফেলেছিলাম। আমার সামনে তখন একটাই উদ্দেশ্য, মুজিবকে খতম করতেই হবে এবং সেই কাজে কোনোভাবেই ১৫ আগস্টের বেশি দেরি করতে পারব না বলে মনে মনে ঠিক করে রেখেছিলাম।

পরদিন হন্তদন্ত হয়ে রশিদের বাসায় ঢুকল ফারুকের বোন। দুপুরের খাবারের পর বিশ্রামে রশিদ। এসেই বলল, টিএসসিতে কিছু কথা শুনলাম। রশিদ বললেন, কী শুনেছ?

দেশে নাকি খুব শিগগিরই একটা সামরিক অভ্যুত্থান ঘটতে যাচ্ছে। এই দলের নেতৃত্বে আপনার নাম শুনলাম।

এ কথা শুনে চিন্তিত হয়ে পড়লেন রশিদ। বুকের ভেতর ধক করে ওঠে। ভাবলেন, নিজেদের কেউ হয়তো পরিকল্পনা ফাঁস করে দিয়েছে। দুশ্চিন্তার মেঘ ঘন হতে থাকে। এমন সময় ফোনের রিং বেজে ওঠে। ব্রিগেড কমান্ডারের অফিস থেকে ফোন করেছেন কর্নেল শাফায়াত জামিল, 'এখুনি আমার সঙ্গে অফিসে দেখা করুন।'

ইউনিফর্ম পরে ঝড়ের বেগে বাসা থেকে বেরিয়ে যান রশিদ। তখন প্রায় বিকেল। মাথার ওপর থেকে সূর্য একটু হেলে পড়েছে। অফিসে বসে আছেন কর্নেল জামিল। চোখে-মুখে বিষণ্নতা। স্যালুট জানিয়ে সামনে দাঁড়ালেন রশিদ। কর্নেল জামিল বললেন, তোমার নাম জড়িয়ে অভ্যুত্থানের কথা শোনা যাচ্ছে।

রশিদ নিশ্চুপ।

জামিল বললেন, এ ব্যাপারে তো কোনো একটা ব্যবস্থা নিতে হয়। এ কথা শোনার পর মুখ খুললেন রশিদ, 'যদি আমার ওপরে কোনো ব্যবস্থা নেয়া হয়, তাহলে আপনাকেও আমি ছাড়ছি না।' গরম উচ্চারণের কথা শোনার পর জামিল নড়েচড়ে বসলেন। কিছু বলার আগেই রশিদ বললেন, 'আমার ওপর যদি কিছু চাপানো হয়, তাহলে আপনাকেও আমি ছাড়ছি না। আপনাকে দলনেতা বলে জড়িয়ে দেব। বলব, যা করেছি সব আপনার নির্দেশে এবং আমার কাছে তার প্রমাণ আছে।'

কী প্রমাণ আছে তোমার কাছে? উত্তেজিত জামিল।

'আমি তো যশোরে বদলি হয়েছিলাম, আপনার সুবিধার জন্য অন্যায়ভাবে আমাকে আবার ঢাকায় নিয়ে এসেছেন।'

রশিদ এ কথা বলার পর শাফায়াত জামিল চুপ হয়ে যান। বেলুন ফুটো হয়ে যাওয়ার পর যেমন হয়। জামিল চুপসে গেলেও রশিদ বুঝতে পারলেন, যে-কোনো সময় বিপদ। এখান থেকে বেরিয়ে সোজা চলে এলেন ফারুকের বাসায়। এখন বিকেল। ফারুক বিছানায় শুয়ে বই পড়ছেন। বাসার ভেতর রশিদের কথা শুনতে পেয়ে বেডরুম থেকে উঠে এলেন ফারুক। রশিদের মুখে টানটান উত্তেজনার ছাপ। ঘামে ভেজা হাফ শার্ট গায়ে।

ফারুক বললেন, টেনশন কেন?

কেউ হয়তো আমাদের পরিকল্পনা ফাঁস করেছে।

কী বলো?

এখন শাফায়াত জামিলের কাছ থেকে এলাম, সে জেনেছে।

বলো কী?

আমাদের পেছনে ফেরার পথ নেই। দ্রুত কাজ শেষ করতে হবে। চলো আগামসি লেন থেকে ঘুরে আসি।

সন্ধ্যার পর দুজন রওনা দেন মোশতাকের বাড়িতে। হত্যা-ষড়যন্ত্রে আক্রমণের দায়িত্ব ফারুক-রশিদের। রাজনৈতিক এবং বিদেশি শক্তি সামলাবেন, খন্দকার মোশতাক। তিনি এখন বঙ্গবন্ধু সরকারের বাণিজ্যমন্ত্রী। নবগঠিত বাকশালের তিন নম্বর সদস্য। কুমিল্লার দাউদকান্দি এলাকায় পীর সাহেব বলে পরিচিত খন্দকার কবিরউদ্দিন আহমদের সন্তান খন্দকার মোশতাক বাংলাদেশের রাজনৈতিক আকাশে ভিলেন বলে পরিচিত। ছোটখাটো আকার। কালো টুপি আর শেরওয়ানি পরলে পেঙ্গুইন পাখির মতো দেখায়। রশিদের গায়ে নকশা করা সাদা পাঞ্জাবি। মাথায় সাদা রঙের টুপি। রশিদ বললেন, আপনাকে একটা প্রশ্ন করেছিলাম, উত্তর পাইনি।

কী? আবার বলো তো।

সংকট সময়ে আপনাকে আমরা পাশে পাব তো?

আমরা মানে কারা?

আমরা মানে সেনাবাহিনী। এ কথা শুনে আর কিছু না বলে কথা ঘুরিয়ে ফেললেন মোশতাক। বললেন, বাড়িতে আজ মোরগ-পোলাও রান্না হয়েছে। তোমরা দুজন খেয়ে যাবে।

চালাক রশিদ অন্য প্রসঙ্গ তুললেন। গল্প বলতে শুরু করেন, 'একদিন সকালে নাশতার টেবিলে শেখ মুজিব বললেন, গত রাতে আমি একটা অদ্ভুত ধরনের স্বপ্ন দেখেছি। আপনি নাকি জানতে চাইলেন, কী সেই স্বপ্ন? তিনি বললেন, স্বপ্নে দেখলাম আমি কোরবানির নির্দেশ পেয়েছি। এরপর আমার ঘুম ভেঙে যায়। সেদিন থেকে ভাবছি, সবচেয়ে প্রিয় প্রাণীকে কোরবানি করতে হয়। ভাবলাম আমার সবচেয়ে প্রিয়জন কে? সবার আগে খন্দকারের নাম মাথায় এল। তাই ভাবছি এবার তাকেই কোরবানি দেব।'

রশিদের মুখে এই কথা শুনে মুখ শুকিয়ে যায় মোশতাকের। বিরক্তি ফুটে উঠল চেহারায়। শুকনো ঠোঁটে বললেন, 'লোকটার কোনো রসবোধ নেই। মজা করে আনন্দ পান, আমরা তাকে আনন্দ দেয়ার জন্য সব সময় রেডি থাকি। এটাই কপাল। বুঝলে রশিদ, এটাই কপাল।'

রশিদ বললেন, এই গল্পটা তাহলে সত্যি?

না, না এটা ডাহা মিথ্যা গল্প। মিথ্যা গল্প শুনতে নাই। এতে গুনাহ হয়।

কয়েক দিন পর ঢাকা সেনানিবাসে বিদ্রোহের উসকানি দেয়া একটি লিফলেটসহ ধরা পড়ে একজন জোয়ান। পুরো লিফলেটে রক্ষীবাহিনীকে গালিগালাজ। এর সঙ্গে লেখা হয়, সেনাবাহিনীর বিকল্প হিসেবে রক্ষীবাহিনী নামে একটি প্যারামিলিটারি তৈরি করা হয়েছে। এর ফলে সেনাবাহিনীর অনেকেই চাকরি হারাবে।

উদ্বিগ্ন সেনাপ্রধান সফিউল্লাহ্। এই লিফলেট নিয়ে প্রতিরক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলামের সঙ্গে দেখা করলেন। এরপর তাকে নিয়ে গেলেন বঙ্গবন্ধুর অফিসে। মোটা আকারের ফাইল দেখছেন বঙ্গবন্ধু। কালো ফ্রেমের চশমা। চোখের তলায় কালো ছাপ। ঘুম কম হলে যেমন হয়। মুখে বিষণ্নতার ছাপ ফুটে উঠেছে। দুজন দাঁড়িয়ে আছেন। বঙ্গবন্ধু বললেন, বসো। কিছু সময় কেউ কোনো কথা বললেন না।

কথা তুললেন সফিউল্লাহ্। ক্যান্টনমেন্টে এই লিফলেটসহ একজনকে আটক করা হয়েছে। এ কথা বলে লিফলেট টেবিলের ওপর রাখলেন। বাতাসে উড়ে যেতে পারে এই ভয়ে পেপার ওয়েট দিয়ে চাপা দিলেন। বঙ্গবন্ধু চোখ মেলে তাকিয়ে দেখলেন না। চোখ এখন ফাইলের ওপর। একটু পর সফিউল্লাহ্ বললেন, ব্রিগেডিয়ার রউফ কি এসব আপনাকে জানিয়েছেন? উত্তর না দিয়ে ফাইলের ওপর থেকে মুখ তুলে বললেন, রউফ কি তোমাদের ইন্টেলিজেন্স অ্যাফেয়ার্স সম্পর্কে কোনো খবর দেয় না?

সফিউল্লাহ্ বললেন, না।

এই সময় সেনাবাহিনীর সংগঠিত ইন্টেলিজেন্স উইং ছিল না। ডিরেক্টর অব ফোর্সেস ইন্টেলিজেন্স বা সংক্ষেপে ডিএফআই সরাসরি তিন বাহিনীপ্রধানের কাছে রিপোর্ট জমা দিতেন। হঠাৎ এই নিয়ম বদলে যায়। ডিএফআইকে সরাসরি সরকারপ্রধানের কাছে রিপোর্ট জমা দিতে বলা হয়। এর ফলে তিন বাহিনীপ্রধানের সঙ্গে ডিএফআই-এর দূরত্ব বাড়তে থাকে।

বড় দুই ছেলে কামাল ও জামালের বিয়ে।

পরিবারে এর আগে বড় সন্তান হাসুর বিয়ের সময় বঙ্গবন্ধু ছিলেন জেলের ভেতর। এবার বেগম মুজিব চাইলেন, দুই ছেলের বিয়েটা একটু জাঁকজমকভাবে হোক। প্রস্তাবে প্রথমে রাজি না হলেও পরে সায় দিয়ে বললেন, বিয়েতে অতিথিরা কেবল আশীর্বাদ করতে পারবেন। কোনো উপহার নেয়া চলবে না।

অর্থমন্ত্রী এ আর মল্লিককে ফোনে বললেন, 'একটু আসুন, আপনাকে দশ মিনিট রাখব।'

তড়িঘড়ি গণভবনের অফিসে এলেন মল্লিক।

বঙ্গবন্ধু বললেন, আপনার ভাবি টুঙ্গিপাড়া থেকে ফিরে এসে বলেছেন, তাঁর কাছে ৬৫ হাজার টাকা আছে। সবই ১০০ টাকার নোট। আমি তাঁকে বলেছি, অর্থমন্ত্রী ঘোষণা দিয়ে ১০০ টাকার নোট বাতিল করেছেন। আমি বলেছি এখন কারো সাধ্য নাই এই টাকাগুলো ভাঙানোর।

এ কথা শুনে বেগম মুজিবকে ফোন করলেন মল্লিক।

হ্যালো ভাবি, আমি মল্লিক।

সর্বনাশ করেছেন ভাই।

কেন কী করলাম?

ছেলেদের বিয়ে দেব কী করে? যে টাকা রেখেছিলাম, তা তো বাতিল করেছেন।

আগে কিছু জানতেন না?

জানলে কি আর এই বিপদে পড়ি?

আপনি রাষ্ট্রপতির স্ত্রী। আর এই ঘটনা উদাহরণ হয়ে থাকুক। তবে ঘোষণা করার সময় শেখ সাহেবকে বিশ্বাস করলেন না কেন?

কী করে করব? টাকাটা তাঁর কাছে পাঠিয়ে দিলে খরচ করে ফেলতেন।

এখন এই টাকা বেঁধে রেখে দিন। বাজেটের সময় আমাকে দেবেন। টেবিলের ওপর রেখে সকলকে দেখাব। রাষ্ট্রপতির স্ত্রীও টাকা জমা দিতে পারেননি।

টেলিফোনে দীর্ঘশ্বাসের শব্দ পেলেন মল্লিক। এরপর আর কোনো কথা হলো না।

বঙ্গবন্ধু বললেন, বেঁচে গেলাম ভাই। আপনার ভাবি তো টাকা রেখেছিলেন ছেলে-মেয়েদের বিয়ের খরচ হিসেবে। ভালোই হলো। উদাহরণ হয়ে রইল। বঙ্গবন্ধুকে সপরিবারে হত্যা করার পর ওই ৬৫ হাজার টাকা পাওয়া যায় টেবিলের ড্রয়ারে। খবরের কাগজে জড়িয়ে কাপড়ে বাঁধা ছিল।

দুই ছেলে কামাল, জামালের বউসহ বঙ্গবন্ধুর হাসিমুখের ছবি ছাপা হলো সংবাদপত্রে। এই ছবির নিচে ছাপা হয়, দুর্ভিক্ষে না খাওয়া মানুষের ছবি। এই দুই ছবি নিয়ে কথা হলো সারা দেশে। জুলাই মাসের শেষ সপ্তাহে তাজউদ্দীনের কাছে খবর এল, যে-কোনো সময় সরকারের ওপর আঘাত আসতে পারে।

উদ্বিগ্ন তাজউদ্দীন এই খবর জানাতে চলে আসেন ধানমন্ডির বাড়িতে। রাত এগারোটার পর, লুঙ্গি গেঞ্জি পরে হেঁটে এলেন ধানমন্ডির বাড়িতে। বঙ্গবন্ধু এই সময় ঘুমানোর প্রস্তুতি নিচ্ছেন। তাজউদ্দীন বললেন, খবরটা সঠিক, সেনাবাহিনী আর গোয়েন্দা বিভাগের ওপর নজর বাড়াতে হবে।

স্বভাবসুলভ ভঙ্গি বঙ্গবন্ধুর। হেসে বললেন, না সমস্যা হবে না।

এদিকে চিন্তা মাথা ছাড়ছে না তাজউদ্দীনের।

তাজউদ্দীনের শোনা খবরটা সত্যি হয়ে উঠছে। বঙ্গবন্ধুকে খুনের পরিকল্পনার বেলুনে 'ফুঁ' দিতে থাকে যুক্তরাষ্ট্র।

এখন প্রশ্ন হলো আমেরিকার কী স্বার্থ? 'হেনরি কিসিঞ্জার ও মার্কিন ফরেন পলিসি' নামের বইয়ে এই প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যায়। এই বইটি লিখেছেন রজার্স মরিস। তিনি মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থার সাবেক কর্মকর্তা এবং ন্যাশনাল সিকিউরিটি কাউন্সিলে কিসিঞ্জারের স্টাফ অ্যাসিস্ট্যান্ট হিসেবে কয়েক বছর দায়িত্ব পালন করেছেন।

জোটনিরপেক্ষ আন্দোলনে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ এবং শোষণনীতির বিরোধিতা করায় মার্কিন নীতির চোখের-কাঁটা হয়ে যান বঙ্গবন্ধু। তাই কাঁটা সরানোর কাজ নিয়ে সিআইএর বড় কর্মকর্তা জর্জ গ্রিফিন এলেন কলকাতা। ১৯৭৫ সালের আগস্টের শুরুতে। পাকিস্তান গোয়েন্দা সংস্থার মাধ্যমে বঙ্গবন্ধুবিরোধীদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন।

২ আগস্ট।

সন্ধ্যা সাতটার পর খন্দকার মোশতাকের সঙ্গে দেখা করতে তার বাড়িতে এলেন ফারুক ও রশিদ। প্রথমে রশিদ জানতে চাইলেন, এই মুহূর্তে সরকার বদল করলে কেমন হয়? মোশতাক বললেন, ভালোই হবে।

কিছুক্ষণ কথা বলে বেরিয়ে আসার সময় মোশতাক বললেন, 'গ্রিফিন কলকাতায় এসেছে। তোমরা কেউ এখন ওর সঙ্গে দেখা করে এসো। তুমি, ফারুক বা ডালিম, কেউ একজন যাও। গোপনে যেতে হবে। কাউবয়রা যেন টের না পায়। বেরিয়ে এসে ফারুক-রশিদ সিদ্ধান্ত নেন গ্রিফিনের সঙ্গে দেখা করতে ডালিম যাক। পরিকল্পনামতো কলকাতায় রওনা হয়ে যান ডালিম। ফিরে এসে ফারুককে জানালেন, গ্রিফিন আমাদের সব রকমের সাহায্য করবে।

ডালিমের কথা শুনে ফারুকের মনের শক্তি বেড়ে যায়।

রশিদ সেনা সদরে প্রস্তাব পাঠালেন, আর্টিলারি এবং বেঙ্গল ল্যান্সারের এক সঙ্গে ট্রেনিং করার সুযোগ দেয়া হোক। রাতের অন্ধকারে অস্ত্র হাতে শত্রুর মোকাবিলা করতে শিখবে সেনারা।

তিন দিন পর সেনা সদরের অনুমতি মিলল। মানে ফারুক-রশিদের সেনারা একসঙ্গে মহড়া করতে পারবে। এই খবর চলে যায় ভারতীয় গোয়েন্দা অফিসে।

উদ্বিগ্ন 'র'-প্রধান। চলে এলেন ঢাকায়। রাতে দেখা করলেন বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে। প্রথমেই বললেন, আপনাকে হত্যার পরিকল্পনা চলছে।

বঙ্গবন্ধু বললেন, কী যে সব বলেন আপনারা?

পরদিন সন্ধ্যা সাতটার সময় খন্দকার মোশতাকের বাড়িতে এলেন রশিদ ও ফারুক। এখানে আগে থেকেই বসে ছিলেন মাহবুবুল আলম এবং করিম।

রশিদ বললেন, পহেলা সেপ্টেম্বর সারা দেশে বাকশাল প্রশাসন চালু হচ্ছে। তার আগেই কাজটা সেরে ফেলতে হবে। কারণ বাকশাল প্রশাসন চালু হলে সোলজার সারা দেশে ছড়িয়ে দেয়া হবে।

মোশতাক বললেন, তার আগেই কাজটা শেষ করা দরকার। এরপর কথা উঠল, সরকার বদলের পর ক্ষমতায় কে বসবে? রশিদ কথা শেষ করতেই তাহেরউদ্দিন ঠাকুর বললেন, খন্দকার সাহেব এই দেশের জন্য একমাত্র যোগ্য ব্যক্তি। ফারুক বললেন, আমাদের ইচ্ছাও তাই। এ কথা শোনার পর মোশতাকের চোখে আনন্দ ফুটে উঠল।

ফারুক জানতে চাইলেন, আমেরিকা পাশে থাকবে তো?

পাশে থেকে তাহেরউদ্দিন ঠাকুর বললেন, ওদের পছন্দের এক নম্বর মানুষ খন্দকার সাহেব।

এ কথা শুনে নিশ্চিন্ত হলেন ফারুক ও রশিদ।

বঙ্গবন্ধুকে খুন করার পরিকল্পনায় সবার আলাদা স্বার্থ। এই আলাদা স্বার্থ এক বিন্দুতে মিলে যায়।

এই বিন্দুতে পৌঁছতে শুরু হয়েছে সময়ের কাউন্টডাউন।

৩ আগস্ট সারা দিন ভ্যাপসা গরম ছিল ঢাকায়। সন্ধ্যায় এক পশলা বৃষ্টি হয়েছে।

এখন রাত সাড়ে এগারোটা।

পরনে লুঙ্গি। গায়ে পুরু কাপড়ের ছেঁড়া-ফাটা পোশাক। শ্রমিকের ছদ্মবেশ। শার্টের তলায় বেল্টে বাঁধা গুলি ভরা দুটো পিস্তল। কয়েক দিন শেভ করেননি। মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়ি নিয়ে ধানমন্ডি এলাকা ঘুরছেন ফারুক। দুই বার চক্কর দিলেন বঙ্গবন্ধুর বাড়ির সামনের রাস্তায়।

বাড়ির পাহারায় থাকা হাবিলদার কুদ্দুস দেখতে পেলেন এক ছায়ামূর্তি ঘুরে বেড়াচ্ছে। ভাবলেন, এত রাতে ওখানে কে?

উঁকি মেরে দেখার চেষ্টা করলেন। আবার বৃষ্টি শুরু হয়। ঋতু বদলের সময় এ রকম আচমকা বৃষ্টি নামে নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলে। বাংলাদেশ নাতিশীতোষ্ণ দেশ।

ঝিরঝিরে বৃষ্টির পানিতে ধুয়ে যাচ্ছে লেকের পাড়ের গাছগুলো। একটা ছাতা মাথায় দিয়ে ছায়া-মানুষকে ধরতে এগিয়ে যায় কুদ্দুস। গেটের কাছে আসতেই

বিকট শব্দের বিজলি চমকায়। শব্দে কানের পর্দা ফেটে যাওয়ার দশা। গেট পার না হয়ে ফিরে আসে কুদ্দুস।

এদিকে রাঙামাটির খামারে দেখা যাচ্ছে না মাহবুবুল আলম চাষীকে।

গা-ঢাকা দিয়ে কোথায় তিনি?

কেউ জানে না।

একই অবস্থা করিমের। তাকেও দেখা যাচ্ছে না।

৬ আগস্ট।

'র'-প্রধান কাউ এলেন ধানমন্ডির বাসায়।

গায়ে চেক শার্ট। ক্লিন শেভ। ছয় ফুটের বেশি লম্বা।

পড়ার ঘরে বসতে দেয়া হলো। কাউয়ের সঙ্গে বেগম ফজিলাতুন্নেছার আগে দুবার দেখা হয়েছে। বঙ্গবন্ধু এখন বাসায় নেই। কাউয়ের হাসিখুশি চেহারায় আজ বিষণ্নতার ছাপ। তাকে উদ্বিগ্ন দেখাচ্ছে। এই ঘরে এখন আর কেউ নেই। পিয়ন-ভৃত্যদের সরিয়ে দেয়া হয়েছে।

কথা বলার আগে এক গ্লাস পানি খেলেন। এরপর আড়াই মিনিট নীরব। বেগম মুজিব বললেন, ভাই একটু মিষ্টিমুখ করেন।

টেবিলের ওপর তিনটি পিরিচে তিন পদের মিষ্টি রাখা। ছানার সন্দেশ, রসগোল্লা আর চমচম। বাংলাদেশের মিষ্টি কাউয়ের অনেক পছন্দের। কিন্তু এখন খেতে ইচ্ছা করল না।

এই বাড়িটা আপনাদের জন্য নিরাপদ নয়।

তাহলে বলেন আমরা এখন কোথায় থাকব?

বঙ্গভবনে থাকুন।

আমার আপত্তি নেই। তবে আমি যাব না। তিনি যখন জেলে থেকেছেন, তখন বাচ্চাদের নিয়ে আমাকে এবাড়ি-ওবাড়ি করতে হয়েছে। থাকার নির্দিষ্ট জায়গা ছিল না। অনেক কষ্টে এই বাড়িটা করেছি। এখান থেকে সরব না। উনি বঙ্গভবনে সুরক্ষিত থাকুন। মাঝেমধ্যে এখানে এলেই চলবে।

খুনের পরিকল্পনা পাকানো শেষ। এখন সময়ের অপেক্ষা।

১২ আগস্টের রাতে ঢাকা গলফ ক্লাবে জমকালো অনুষ্ঠান চলছে। আজ বেঙ্গল ল্যান্সারের অধিনায়ক মেজর ফারুকের বিয়েবার্ষিকী। পুরো সামরিক কায়দার অনুষ্ঠানে অনেক অতিথি।

ফারুক-ফরিদা সবার সঙ্গে কুশল বিনিময় করছে। টেবিলের ওপর নানা পদের খাবার সাজানো। জিভে পানি আসা খাবারের গন্ধের সঙ্গে মিশে গেছে সবার গায়ের কড়া পারফিউমের সুবাস।

তিন বছর আগের এই দিনে ফারুক-ফরিদার বিয়ে হয়েছিল। ফরিদার বড় বোন টিঙ্কু মেজর রশিদের স্ত্রী। অনেক মান্য অতিথির ভেতর আছেন ফারুকের মামা জেনারেল স্টাফপ্রধান ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশাররফ এবং প্রেসিডেন্টের মিলিটারি সেক্রেটারি ব্রিগেডিয়ার মাসহুরুল হক।

সবার সঙ্গে কথা বললেও ফারুকের মনের ভেতর অন্য বুদ্ধি দৌড়ে বেড়াচ্ছে। তিনি এখন দেশের ইতিহাস বদলের খেলার চূড়ান্ত পর্যায়ে। কাউকে কিছু বুঝতে দিলেন না। ভাবনায় দোলা দিচ্ছে ইতিহাসে নাম লেখার উত্তেজনা।

কাছে এসে দাঁড়ালেন টিঙ্কু। একটু দূরে রশিদ। কয়েকজনের সঙ্গে কথা বলছেন। ফারুকের চোখ গেল সেদিকে। রশিদের কাছে এগিয়ে গিয়ে ফারুক বললেন, কথা আছে।

ফাঁকা জায়গায় সরে আসে ফারুক আর রশিদ।

১৫ তারিখে সরিয়ে দিচ্ছি। দিনটা কেমন? এই দিনটা ফারুকের বিশেষ পছন্দের। জন্মদিন আবার বিয়ের দিন।

ফারুকের কথা শুনে বিদ্যুতের শক খাওয়ার মতো ধাক্কা খেলেন রশিদ। আশপাশে তাকালেন। কেউ শুনে ফেলল না তো? না কেউ নেই।

একটু দম নিয়ে রশিদ বলেন, এত তড়িঘড়ি করার কী দরকার? একটু সময় নিয়ে করা হোক।

কথাগুলো বলে সিগারেটে জোরে টান দিয়ে ধোঁয়ার কুণ্ডলী ছাড়েন রশিদ।

ফারুক বলেন, এটাই আমার শেষ সিদ্ধান্ত। ইচ্ছা করলে তুমি সরে যেতে পারো। তবে মনে রেখো, আমি ব্যর্থ হলে তোমাকেও ফাঁসিতে ঝোলানো হবে।

ফারুকের এসব কথা শুনে কী বলবে। ভেবে পান না রশিদ। তিনিও সিগারেট টানছেন। এমন সময় দূর থেকে রশিদের স্ত্রী টিঙ্কু চিৎকার করে বলেন, একটু এদিকে এসো। রশিদ ঘাড় ঘুরিয়ে বলেন, আসছি।

মিনিট খানেক নীরব।

একটু ভেবে নিয়ে রশিদ বলে, ঠিক আছে। এদিন যদি করতেই হয়, হোক। তবে আমার আরেকটা কথা।

বলো।

আরো কিছু অফিসার আমাদের সঙ্গে রাখতে হবে।

ফারুক বলেন, সে ব্যবস্থা করে রেখেছি। এ কথা শোনার পর স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে টিঙ্কুর দিকে এগিয়ে যান রশিদ। এদিক-ওদিক চেয়ে দেখলেন তার বস শাফায়াত জামিল এসেছেন কি না। না, তাকে দেখা গেল না। ভাবছেন, ফারুক কি তাকে আমন্ত্রণ জানায়নি?

গলফ ক্লাবের অনুষ্ঠানের পরদিন ১৩ আগস্টে গণভবনে গার্ড বদলের প্যারেড অনুষ্ঠিত হলো। দলপতি ফারুক। প্যারেডে বঙ্গবন্ধুকে গার্ড অব অনার দেয়া হয়। অনুষ্ঠান শেষে চা চক্রের আয়োজন। বিভিন্ন রকম ফল, চা কফি আর শিঙাড়া সমুচা। বঙ্গবন্ধু চায়ের পেয়ালা নিয়ে অতিথিদের সঙ্গে কথা বলছেন, এমন সময় এগিয়ে আসেন ফারুক। বঙ্গবন্ধু বললেন, রেগুলার প্রেসিডেন্সিয়াল গার্ড রেজিমেন্ট তৈরি করতে হবে।

ফারুক বললেন, স্যার এ দায়িত্ব কি আমাকেই দিতে চান?

হুম তোমাকেই দিতে চাই।

আমি পাঁচ ফুট সাত ইঞ্চি লোক নেব।

লম্বা লোক কই পাবে? পাঁচ ফুট পাঁচ নিয়ো।

ফারুক হাসল।

বিকেলে বঙ্গবন্ধুর বাড়িতে এলেন খন্দকার মোশতাক। অফিস সেরে এসেছেন। বসার ঘরে সোফায় বসে আছেন মোশতাক।

রাসেলকে কাছে ডাকলেন, আব্বাজান আমার কাছে এসো।

রাসেল কাছে এসে বসে। মাথায় হাত রেখে আদর করলেন। বললেন, আব্বাজানের মতো তুমিও বড় হও। দোয়া করি। দোয়া শেষে রাসেল উঠতে চাইলে মোশতাক বলেন, আমার কাছে আর একটু বসেন। আপনি-তুমি বলে বেশ কিছুটা সময় রাসেলকে আদর করলেন।

১৩ আগস্ট সন্ধ্যায় মাকে ফোন করলেন হাসিনা। ফজিলাতুন্নেছা বললেন, দ্রুত দেশে ফিরে এসো।

কী হয়েছে মা?

তোমার আব্বার তোমাদের খুব প্রয়োজন। সব কথা ফোনে বলা সম্ভব নয়।

মায়ের এই কথা শুনে চিন্তিত হাসিনা। ব্রাসেলস থেকে টেলিফোনে কথা বলার সময় ছেলে জয় ফোনের তার ধরে টান দেয়। হাসিনা বকা দেন। এই কথা শুনতে পান তার মা। নাতিকে বকা দেয়া শুনতে পেয়ে সহজ মানুষ ফজিলাতুন্নেছা কেঁদে ফেলেন।

কাঁদতে কাঁদতে বললেন, 'তুমি কোনোদিন জয়কে বকবে না, আমার নিষেধ থাকল।' কথা শেষ করেও কান্না থামল না। মায়ের কান্না শুনে হাসিনার চোখেও পানি।

আজ ১৪ আগস্ট। কাল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন অনুষ্ঠানে বঙ্গবন্ধু আসবেন।

গমগম করছে পুরো ক্যাম্পাস। সবখানে এখন উৎসবের রং। নানা সাজে সেজে উঠেছে বিশ্ববিদ্যালয়ের আশপাশের এলাকা। কর্তৃপক্ষ আমন্ত্রণপত্রে লিখল, 'জাতির জনক, মহামান্য রাষ্ট্রপতি ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় চ্যান্সেলর বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সাহেব, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে শুভাগমন উপলক্ষে আগামী ১৫ আগস্ট ১৯৭৫ বেলা ১১টায় ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্রে আয়োজিত অনুষ্ঠানে ভিসি ও সিন্ডিকেট সদস্যবৃন্দ আপনাকে সাদর আমন্ত্রণ জানাচ্ছেন।'

৪২ সদস্যের অভ্যর্থনা কমিটির ছোটাছুটি চোখে পড়ার মতো। স্বেচ্ছাসেবী ব্রিগেড সদস্যরা বুক চিতিয়ে এদিক-ওদিক ঘোরাফেরা করছে। সুন্দরী মেয়েদের সামনে এরা বেশি ঘুরঘুর করছে। ডাকসু অফিসে ছাত্রদের জটলা। ক্যাম্পাসের সার্বিক দায়িত্বে শেখ কামাল।

ক্যাম্পাসে তৈরি হয়ে গেছে বঙ্গবন্ধুর হাস্যোজ্জ্বল মুখের বারো ফুট উঁচু প্রতিকৃতি। চারুকলার কয়েকজন ছাত্র দেয়ালে লিখছেন, এক নেতা এক দেশ, বঙ্গবন্ধুর বাংলাদেশ।

টিএসসি চত্বরে তৈরি হয়েছে ষোল ফুট উঁচু স্বাগত তোরণ। কলা ভবনের মূল সিঁড়ির দুই পাশে করা হয়েছে বঙ্গবন্ধুর দুটি ম্যুরাল। দেয়াল লিখন, ব্যানার ফেস্টুন আর বড় আকারের তোরণে ভরে উঠল বিশ্ববিদ্যালয় এলাকা।

পরিকল্পনা ছিল, বঙ্গবন্ধু প্রথম যাবেন জগন্নাথ হলে। সেখান থেকে কেন্দ্রীয় শহিদ মিনার হয়ে আসবেন টিএসসি চত্বরে। এই চত্বরে করা হয়েছে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতি। ভেতরের মিলনায়তনের মঞ্চ সাজানো হয়েছে রিলিফওয়ার্ক দিয়ে। বেশিরভাগ অংশে ব্যবহার করা হয়েছে সাদা রং। সবকিছু সাজানো-গোছানো প্রায় শেষ। হঠাৎ ক্যাম্পাসে শক্তিশালী বোমা ফাটানো হলো। প্রথম বোমা ফাটল লাইব্রেরি চত্বরে। এরপর দুপুর দুইটা ছাব্বিশ মিনিটে আরেকটা শক্তিশালী বোমা ফাটানো হলো বিজ্ঞান ভবনের সামনে।

পুলিশ জানল না, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে 'নিখিল বোমা' ফাটিয়েছে গণবাহিনীর সদস্যরা। চুয়াত্তরের নভেম্বরে বোমা বানাতে গিয়ে নিহত নিখিলের স্মরণে এখন যেসব বোমা বানানো হয়, তার নাম দেয়া হয়েছে 'নিখিল বোমা'। এই বোমা এখন আরো অনেকগুণ শক্তিশালী। গণবাহিনীর ঢাকা কমান্ডার আনোয়ার হোসেন অক্লান্ত

পরিশ্রম করে বোমার শক্তি বাড়িয়েছেন। 'নিখিল বোমা' তারই দেয়া নাম এবং তার নির্দেশে গণবাহিনীর ক্যাডাররা বিশ্ববিদ্যালয়ে বোমা ফাটায়।

বোমার ঘটনায় অফিসে ব্যস্ত কর্নেল জামিল। এমন সময় তার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন ব্রিগেডিয়ার রউফ। জরুরি কিছু কাগজপত্র বুঝিয়ে দিতে এসেছেন। লন্ডনে ট্রেনিং শেষে দেশে ফিরে আসার আগে রউফের জায়গায় কর্নেল জামিলকে নিয়োগ দেয়া হয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বোমা ফাটার ঘটনায় উদ্বিগ্ন জামিল। রউফ আসার কিছুক্ষণ পর অফিসে আসেন শেখ কামাল। তাকে সঙ্গে নিয়ে জামিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে রওনা দেন। চারদিকে ফিসফাস শোনা যাচ্ছে ক্যাম্পাসে মাইন পুঁতে রাখা আছে।

ফরিদার মনে ভয় ঢুকেছে। সে এখন চট্টগ্রামে।

আন্ধা হাফেজের সঙ্গে দেখা করে ফারুকের জন্য দোয়া নিতে যাচ্ছেন। হাফেজের আস্তানার কাছাকাছি এসে বেবিট্যাক্সির স্টার্ট বন্ধ হয়ে যায়। আশপাশে কোনো বাহন দেখতে পেলেন না। ড্রাইভার জানায়, স্টার্ট নিচ্ছে না, ইঞ্জিন নষ্ট। বাধ্য হয়ে ফরিদা হেঁটে চললেন, ২৫ মিনিট লাগল।

চেক লুঙ্গি। গায়ে স্যান্ডো গেঞ্জি। জলচৌকির ওপর বসে আছেন আন্ধা হাফেজ। কাছে গিয়ে কদমবুসি করে দাঁড়ালেন ফরিদা। হাফেজ বললেন, বসো। পাশে কয়েকজন বসে আছে। এদের ভেতর দুই জন নারী। তারা হাফেজের পা টিপে দিচ্ছিলেন।

সবাই চলে যান, এখন ফরিদা ও আন্ধা হাফেজ ছাড়া আর কেউ নেই।

বলো মা, বলল হাফেজ।

ফরিদা বললেন, কাল ১৫ তারিখে কাজটা সেরে ফেলতে চান ফারুক। আপনার কাছে শুনতে চেয়েছেন, তিনি কি এখন ঠিক রাস্তায় চলছেন? নাকি ভুল রাস্তায়? আপনার দোয়া চেয়েছেন। ব্যস্ত থাকার কারণে তিনি আসতে পারেননি, তার বদলে আমি এসেছি।

জানি। সব জানি। তার সময় ফুরিয়ে এসেছে।

এ কথা বলে নিশ্চুপ হয়ে গেলেন আন্ধা হাফেজ। বেশ কিছুটা সময় পর কথা শুরু করলেন, 'ফারুককে বলবে দুটি সূরা দিলাম। সে ও তার সাথিরা যেন অনবরত পাঠ করতে থাকে।'

এবার জলচৌকির ওপর রাখা বালিশের তলায় হাত দিলেন। সরু কাগজ টুকরো বের করে ফরিদার হাতে দিলেন। জাফরান কালিতে লেখা দুটি সূরা।

আরবি ভাষা রপ্ত থাকায় কাগজ পড়তে অসুবিধা হলো না। মোড়া থেকে উঠে আবার পা ছুঁয়ে সালাম করলেন ফরিদা। বিদায় নেয়ার সময় বললেন, সবার জন্য দোয়া করবেন।

'চিন্তা কোরো না, আমি তাদের আল্লাহর হাতে সঁপে দিয়েছি। তিনি তাদের রক্ষা করবেন।' আন্ধা হাফেজের এ কথা শুনে মনের ভয় সরে যায়। আস্তানা থেকে বেরিয়ে একটা গাছের তলায় এসে আকাশের দিকে তাকালেন। সূর্যটা হেলে পড়েছে পশ্চিমে। আস্তানার সামনে বেশ কয়েকটা বেবিট্যাক্সি দাঁড়ানো। একটায় উঠে বসলেন। তাড়া আছে ফরিদার। সময় নষ্ট করতে চান না।

ঢাকায় ফোন করে ফারুককে সব জানাতে হবে। বাবার বাড়িতে ফিরে আসতে ঘণ্টাখানেক সময় লাগল। অনেকক্ষণ রিসিভার ঘুরিয়ে ঢাকায় লাইন পাচ্ছিলেন না। মাথার ওপরে ফ্যান ঘুরছে। ঘাম বন্ধ হচ্ছে না।

প্রায় দুই ঘণ্টা পর ফোনের লাইন পেলেও ফারুক ফোনের রিসিভার তুললেন না। ফরিদার উত্তেজনা বাড়ছে। এরপর ফোন করলেন রশিদের বাসায়। হ্যালো-হ্যালো শোনা গেল, কথা হলো না। বাধ্য হয়ে এবার শ্বশুরকে ফোন করলেন। ঢাকায় ফরিদার পাশের বাসায় থাকেন। বললেন, এখনই ফারুককে দরকার, আপনি ওকে একটু বলেন, যেন এখনই আমাকে ফোন করে।

আচ্ছা বলছি।

ফোনের রিসিভার রেখে দিলেন ফারুকের বাবা। গায়ে ফতুয়া, সাদার ভেতরে হালকা নীলের ছাপ। পরনে ঢিলেঢালা কালো ট্রাউজার। ফারুকের বাবা বাসার ভেতর চলে গেলেন। দরজা খোলা ছিল। ভৃত্য বারান্দায় বসে আছে। শোবার ঘরে গিয়ে দেখলেন তার ছেলে গভীর ঘুমে।

দেয়াল ঘড়ির দিকে তাকালেন। চারটা ৫০ মিনিট। ফারুকের বাবা ভেবে পাচ্ছেন না ঘুমিয়ে থাকা ছেলেকে ডাকবেন কি না। ভাবতে ভাবতে মিনিট পাঁচেক চলে যায়। এদিকে ফরিদার উদ্বিগ্নতার কথা মনে পড়ছে। শেষমেশ ডাকলেন, ফারুক। ঘুম ভেঙে যায়। ফারুক তাকিয়ে দেখলেন, তার বাবা খাটের পাশে দাঁড়ানো।

বাবা বললেন, ফরিদা তোমাকে ফোনে পাচ্ছে না, এক্ষুনি ফোন করো। এ কথা বলে বেরিয়ে গেলেন তিনি।

হাত বাড়িয়ে খাটের পাশে ছোট্ট গোল টেবিলের ওপর থেকে ফোন সেট টেনে নিলেন। এখনো পাঁচটা বাজেনি। একবার রিং করতেই ফরিদাকে পেলেন।

ফরিদা বললেন, আন্ধা বাবার সঙ্গে দেখা করেছি। তিনি দুইটি সূরা পাঠ করতে বলেছেন। বলেছেন, চিন্তা করার দরকার নেই। কোনো সমস্যা হবে না।

শুনে ফারুক খুশি। আর এসব বলতে পেরে হালকা লাগছে ফরিদার। দুপুরে খাওয়া হয়নি। সময় হয়ে ওঠেনি। ফারুকের সঙ্গে কথা শেষ করে খাবার টেবিলের দিকে গেলেন ফরিদা।

মতিঝিল থেকে অফিস করে বাসায় ফিরছেন হোসনে আরা।

মন ভালো না। বাসে চড়তে ইচ্ছা হয়নি, ফিরছেন রিকশায়। বিশ্ববিদ্যালয় টিএসসির কাছে দেখলেন অনেক মানুষের জটলা। বুঝতে অসুবিধা হলো না, এই জটলার কারণ। অফিসে বসেই কানে এসেছে বোমা ফাটানোর খবর। তখন থেকেই কারো সঙ্গে কথা বলতে ইচ্ছা করছে না। সন্ধ্যার একটু আগে বাসায় ফিরে এসে আরেকটা ঘটনার মুখে পড়লেন।

চারতলা বাড়ির তিনতলায় হোসনে আরার ফ্ল্যাট।

প্রতি ফ্লোরে দুইটা করে ফ্ল্যাট। বাড়ির গা ঘেঁষে দুইটা নারকেলগাছ। একটা রোগা কাঁঠালগাছ আর চারা নিমগাছ। ওই সময় এক বিল্ডিংয়ের গায়ের ওপর দিয়ে আরেকটা বিল্ডিং উঠত না। সব বাড়ির চারপাশে ফাঁকা জায়গা ছিল। তিনতলায় হোসনে আরার ফ্ল্যাটের সামনে প্রথমে কলাপসিবল গেট। তারপরে দরজা। কলাপসিবল গেটের সামনে একটু ফাঁকা জায়গা। তিন ফুটের একটু বেশি হবে। এখানে ফুলসহ ১০ টাকায় বেলি ফুলের ঝাড় কিনে এনে রেখেছে। চারটা টবে গাছগুলো মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে। তালা খোলার সময় চোখ গেল টবের দিকে। হোসনে আরা চিৎকার করে উঠলেন,

সাপ

সাপ

সাপ

এক লাফে পিছিয়ে এলেন।

চিৎকার শুনে পাশের ফ্ল্যাটের দরজা খুললেন কবিরউদ্দিন।

বললেন, কোথায়? কোথায়?

হোসনে আরা আঙুল তুলে টব তিনটা দেখালেন। এবার কবিরউদ্দিন দেখতে পান। ছাই আর হলদে চরকি কাটা বড় একটা খোলস। চৌকাঠের ভেতরে দাঁড়িয়ে কবির বললেন, খোলস যখন ছেড়েছে তখন সাপটা আশপাশেই আছে। লুকিয়ে লুকিয়ে সে আমাদের দেখছে।

হোসনে আরা এদিক-ওদিক তাকালেন। এবার কবিরউদ্দিন বলেন, 'খোলস-ছাড়া সাপেরা খুব রেগে থাকে। খোলসটা দেখে মনে হচ্ছে খুব বিষধর সাপ।' এ কথা

বলতে-বলতে দরজা বন্ধ করে দিলেন কবিরউদ্দিন। হোসনে আরা অবাক হয়ে দেখল, দরজার তলায় সামান্য ফাঁকটুকু দিয়ে একচিলতে আলো প্রবেশ করে, সেখানে ন্যাকড়া গুঁজে দিচ্ছেন কবিরউদ্দিন।

বসার ঘরে বেতের মোড়ার ওপর বসে হোসনে আরা সব দেখলেন।

গেটের দরজা আটকাতে ইচ্ছা করছে না। এখানে বসে বাতাস খেতে ভালো লাগে।

আজ কিছুই ভালো লাগছে না।

আচমকা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বোমা ফাটানোর ঘটনায় মন টাটাচ্ছে। আরেক ফ্ল্যাটে থাকা গৌতম বাবুর স্ত্রী নন্দিতা দরজা তিন ইঞ্চি ফাঁক করে বলল, কী সাপ রে আরাদি? কোবরা?

জানতে চাওয়ার ঢং দেখে মনে হচ্ছে কোবরা হলে সে খুশি হয়। রাগে কোনো জবাব দিলেন না হোসনে আরা। ভাবলেন, এখন কী করব? নিচে ওষুধের দোকান থেকে কার্বোলিক অ্যাসিড কিনে আনব? আবার ভাবল, না থাক। কী আর এমন হবে?

বন্ধ দরজার ওপার থেকে গৌতম বাবুর স্ত্রীর কথা ভেসে এল, এই সাপটা এল কীভাবে? গৌতম বাবু বললেন, রাস্তাঘাটে ঝোপঝাড়ে কেউ হয়তো এটা পেয়ে শয়তানি করে টবের গায়ে রেখে গেছে। নন্দিতা ভুরু কোঁচকায়। নাও এবার চা খাও। চায়ের পেয়ালা দিয়ে রান্নাঘরে যায়।

খোলসটা শয়তানি ভেবে নন্দিতা দুশ্চিন্তা কাটাতে চেষ্টা করছে।

গৌতম বাবু চায়ের পেয়ালায় একবার চুমুক দিয়ে বললেন, শয়তান থেকে শয়তানি শব্দটা কিছুটা ভালো, বুঝলে? আজকাল শয়তানি এক ধরনের মজা। সবাই একে ফান বলে। তবে শয়তানি করে একবার মিথ্যা টেনশন যদি কারো মাথায় চালান করতে পারো, তাহলেই হলো।

রান্নাঘর থেকে নন্দিতা চেঁচিয়ে বলে, মিথ্যা টেনশন?

এটা ভীষণ ভয়ংকর। একবার মনের ভেতর ঢুকিয়ে দিয়ে, নিজের কাজ হাসিল করা যায়।

নন্দিতার মাথা থেকে মিথ্যা টেনশন শব্দটা যাব-যাচ্ছি করেও সরছে না। ঘরের ভেতর চলে আসেন হোসনে আরা। গৌতম-নন্দিতার কথা এখন আর শোনা যাচ্ছে না। টেবিলের ওপর রাখা রেডিও 'অন' করে সন্ধ্যার খবর শুনলেন, 'স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের প্রেস নোটে বলা হয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়ের ফাটানো বোমা ছিল অনেক শক্তিশালী, যা কোনো বিশেষজ্ঞ ছাড়া তৈরি করা সম্ভব নয়। এই ধরনের বোমা কেবল সেনাবাহিনীর কাছে মজুদ আছে।

পুলিশ মনে করে এটি জাসদ গণবাহিনীর কাজ। আবার চীনাপন্থি বামেরাও করতে পারে। বিকেলে নোয়াখালীতে একটি সামরিক হেলিকপ্টার দুর্ঘটনার

শিকার হয়। ভারত সরকারের ধার দেয়া এই হেলিকপ্টার সেনাবাহিনীর চট্টগ্রাম কমান্ডের অধীনে ছিল।'

এই খবর শোনার পর ব্লাড প্রেসারটা বেড়ে যায়।

ঘেমে যাচ্ছেন হোসনে আরা।

মনের ভেতর অজানা ভয় তাড়া করছে। প্রতিদিন এই সময় সুমন আসে। আজ আসেনি। কী হলো ছেলেটার? শরীর খারাপ করেনি তো? একবার ভাবলেন, সুমনের বাসা থেকে ঘুরে আসি। ব্লাড প্রেসার বাড়ায় যাওয়া হলো না। গোসল করে কয়েকটা খটখটে টোস্ট বিস্কুট আর একটা আপেল খেয়ে শুয়ে পড়লেন। প্রেসারের ওষুধটা খাওয়া হলো না।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বোমা ফাটানোর ঘটনা তদন্তে ব্যস্ত পুলিশ।

বোমা রহস্য টেনে বের করার সব রকম চেষ্টা চলছে। কাল রাষ্ট্রপতি আসবেন, নিরাপত্তা বাহিনীর সজাগ থাকার কথা। তা নেই। বোমা ফাটানোর ঘটনা বলে দেয় নিরাপত্তার নামে যা হচ্ছে তা কেবলই ছেলেখেলা। ঢাকার ব্যস্ত জীবনে এর কোনো প্রভাব পড়ল না।

বাজার অর্থনীতির লাগাম ছাড়া জীবন। সবাই ইঁদুরদৌড় দৌড়াচ্ছে। চলন্ত গাড়ির ফাঁকফোকর দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে একটা নীল রঙের ভক্সওয়াগন গাড়ি। ড্রাইভিং সিটে বসে আছেন মেজর নূর। পরনে পুরু গ্যাবার্ডিন কাপড়ের প্যান্ট। ওপরে হালকা বেগুনি রঙের হাফ শার্ট। পাশের সিটের ওপর একটা এ-ফোর সাইজের খামের ভেতর আড়াই লাখ টাকা।

কিছুক্ষণ পর এই গাড়িটা থামবে মতিঝিলে মেজর ডালিমের অফিসে। সেনাবাহিনী থেকে চাকরি চলে যাওয়ার পর মতিঝিলে অফিস খুলেছে ডালিম।

আগে থেকে এখানে আড্ডা দিচ্ছেন আজিজ পাশা, হুদা ও ডালিম। এরা সবাই সঙ্গে টাকা এনেছেন। এই টাকায় ডলার কেনা হবে। ডলারগুলো থাকবে ডালিমের অফিসের ড্রয়ারে। যদি কোনো কারণে খুনপর্ব ঠিকঠাক না হয়, তাহলে দেশ থেকে পালানোর আগাম প্রস্তুতি নিয়ে রাখা হচ্ছে। নূর এসে ডালিমের টেবিলের ওপর টাকা ভরা খামটা রেখে বললেন, এখনই ডলার কিনে রাখো। ডালিম বললেন, ডোন্ট ওরি।

মতিঝিলে খুনি চক্রের আড্ডা চলছে। এদিকে নিশ্চিন্তে ক্যাপ্টেন বাশার। রাষ্ট্রপতির ধানমন্ডির বাসভবন এবং গণভবনের নিরাপত্তারক্ষীর দলপতি বাশার। পহেলা আগস্ট এই দায়িত্ব নিয়েছেন। চলনে-বলনে সব সময় ব্যস্ততা। এই ব্যস্ততার ভাব ছাত্র বয়স থেকে। স্কুলের বন্ধুরা তাকে বলতেন, বিজি ফর নাথিং। দুপুরে

হন্তদন্ত হয়ে ধানমন্ডি ৩২ নম্বরে এসে দুই ঘণ্টা পর চলে যান, আজিমপুর চায়না বিল্ডিংয়ে মামার বাড়ি। এই চলে যাওয়া অনেক প্রশ্নের জন্ম দেয়।

মতিঝিল অফিস থেকে বেরিয়ে মোটরসাইকেল স্টার্ট দেন ডালিম।

১১০ সিসির লাল রঙের হোন্ডা। বিকেল পৌনে চারটায় আসে ৩২ নম্বর সড়কে। গায়ে হিজিবিজি প্রিন্টের হাফ শার্ট। বাড়ির আশপাশে শেষবারের মতো রেকি করতে এসেছেন। পাহারারত হাবিলদার কুদ্দুস ডালিমকে দেখতে পান, কথা হয় না। ডালিম চলে যাওয়ার এক ঘণ্টা পর আসেন হুদা, একই মোটরসাইকেলে চেপে। ধানমন্ডি থেকে মতিঝিল অফিসে ফিরে যাওয়ার পর একই মোটরবাইক নিয়ে বের হন হুদা। বাড়ির সামনে লেকের ধারে দেখা হয় হাবিলদার গনির সঙ্গে। মোটরসাইকেল থামান হুদা। এগিয়ে আসেন গনি। তারা ফিসফিস করে কিছুক্ষণ কথা বললেন। দূর থেকে দেখলেন কুদ্দুস।

ধানমন্ডি লেকের পশ্চিম পাশের গাছের আড়ালে ডুবে গেল সূর্য। আকাশের সাদা মেঘকে পিঙ্গল, তামাটে ও কমলা রঙে রাঙিয়ে। ধূসর ছায়ার সন্ধ্যা এনে দিল গোধূলিকে। আর গোধূলি হারিয়ে গেল কালো অন্ধকারে।

বাড়িতে আসে রাসেলের বন্ধু সুমন। রাসেল আজ উত্তেজিত। পরদিন ইউনিভার্সিটি ল্যাবরেটরি স্কুলের ছয়জন ছাত্র রাষ্ট্রপতিকে স্বাগত জানাবে, রাসেল তাদের একজন।

এই তালিকায় সুমনের নাম নেই। গণভবনের লেকে দুপুরে সাঁতার কেটে ক্লান্ত রাসেল। সন্ধ্যার আগেই চলে আসে ধানমন্ডির বাসায়, একটু পর আসে খেলার সাথি সুমন। সাঁতার কাটা ক্লান্ত শরীর রাসেলকে খেলতে সায় দেয় না। বাড়ির সামনে লেকের ধারে দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ সুমনের সঙ্গে গল্প করে।

আবছা অন্ধকার।

ধানমন্ডি ছয় নম্বরের রোডের এক বাড়িতে পরপর তিন জন ঢুকলেন।

মার্কিন রাষ্ট্রদূত বোস্টার, মেজর রশিদ আর তাহেরউদ্দির ঠাকুর। কথার শুরুতে বোস্টার জানান, সব ঠিক আছে তো? রশিদ বলেন, সবকিছু ওকে। এ বিষয়ে আর কোনো কথা কেউ তুললেন না। হুইস্কির গ্লাস সামনে। চিয়ার্স বললেন বোস্টার।

আধঘণ্টা পর তিন জন বেরিয়ে গেলেন তিন দিকে। নিজ অফিসের দিকে বোস্টার। রশিদ যান ক্যান্টনমেন্ট এলাকায়। তাহের ছুটলেন আগামসি লেনে মোশতাকের বাড়িতে।

নামাজ পড়ে বৈঠকখানা ঘরে একা বসে আছেন মোশতাক। কপালে ভাঁজ পড়েছে। দেখে মনে হবে, সারা দুনিয়ার সকল চিন্তা এখন তার মাথায় ভর করেছে। তাহেরকে দেখে ঠোঁট বাঁকা করে হাসার চেষ্টা করলেন।

তাহেরকে বললেন, কী বার্তা এনেছ?

সবকিছু ওকে।

আর কোনো কথা না বলে তাহের ঘর থেকে দ্রুত বেরিয়ে যান। এখন আবার একা মোশতাক। তাহেরের কথায় মন হালকা হতে শুরু করেছে। দুপুরে একই কথা জানিয়ে গেছেন রশিদ। তবে কারো বার্তায় মোশতাকের সকল দুশ্চিন্তা সরে যায়নি। বারবার ভাবনার তলা থেকে উঁকি দিচ্ছে একটাই প্রশ্ন।

এবারও কি হাতের মোয়া ফসকে যাবে?

তখনই দীর্ঘশ্বাস কেঁপে কেঁপে ছড়িয়ে পড়ছে সারা ঘরে।

রূপশিল্পী পিকাসো বলতেন, তুমি যা কল্পনা করতে পারো তা-ই সত্যি। তাই হয়তো অনেকদিনের রাজা হওয়ার কল্পনা সত্য হতে চলেছে। এশার নামাজের পর টস করলেন মোশতাক।

তিনবারই মুদ্রা পক্ষে পড়েছে।

সন্ধ্যার পর ফারুকের বাসায় এলেন, বঙ্গবন্ধুর ভিজিলেন্স দলের সদস্য বিএস সফদার। গায়ে সাদা পাজামার ওপরে হালকা খয়েরি পাঞ্জাবি। দেখে মনে হবে এইমাত্র শ্বশুরবাড়িতে বেড়াতে এসেছেন। পাঞ্জাবির ভাঁজ ভাঙেনি। গায়ে আতরের সুবাস। বিকেলে টানা ঘুমের পর কফির মগ হাতে নিয়ে বসে আছেন ফারুক।

সফদার এসে বললেন, বঙ্গবন্ধুর বাড়িতে আজ কে কে থাকছেন।

কফি চলবে? ফারুক বললেন।

এখন না, আমি চললাম। ফারুকের বাসা ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন সফদার।

অন্ধকার এখনো ঠিক হয়নি, নড়াচড়া করছে।

লেকের পাড়ে ঝোপের ভেতর জোনাকির দল সাঁঝবাতি জ্বালানোর চেষ্টা করছিল। বড় গাছের মাথায় বাদুড়ের দল কালো হয়ে ঝুলছে। রাত ঘন হলে ওরা বেরিয়ে পড়বে। সূর্যাস্তের শেষ আলোয় উজ্জ্বল ধানমন্ডির ৩২ নম্বরে বঙ্গবন্ধুর বাড়ি। বারান্দার গ্রিল ধরে দাঁড়িয়ে আছেন এই বাড়ির সন্তানদের মা। নিচে তাকিয়ে দেখলেন ছোট ছেলে রাসেল সুমনের সঙ্গে গল্প করছে।

প্রতিদিন এই সময় ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে লেকের পাড়ের গাছগুলোর পাতার আড়ালে দিনের আলোর হারিয়ে যাওয়া দেখেন। আজ চোখ সরাতে ইচ্ছা করল

না। আস্তে আস্তে ১৪ আগস্টের লেজটা পর্যন্ত ঢুকে পড়ল রাতের অন্ধকারে। বড় ছেলে কামালের স্ত্রী সুলতানা ডাকলেন, মা চা করেছি, আপনি আসেন।

পুত্রবধূর ডাকে ভেতরে এসে ডাইনিংটেবিলে বসলেন। রোজী এগিয়ে দিলেন চায়ের পেয়ালা। হাতে নিয়ে বললেন, রাসেলটা আসছে না কেন? কথা শেষ হওয়ার সাথে সাথেই রাসেল চলে আসে। মা বললেন, হাতমুখ ধুয়ে আসো। বড় ভাবি বললেন, রাসেল বাবু চা খাবে না?

না, মিষ্টি খাব।

সন্ধ্যার চা পর্ব শেষ করে বাড়ির নতুন দুই বউ একমাত্র পিচ্চি দেবরকে নিয়ে ছাদে উঠলেন। যাওয়ার সময় রাসেল বলল, মা ছাদে গেলাম। মা বললেন, দেরি কোরো না।

দুপুর থেকে মনটা বিষণ্ন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বোমা ফাটার পর থেকে মন আনচান করছে। বারবার ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে রাস্তায় তাকাচ্ছেন আর মনে মনে বলছেন, হাসুর বাবা তাড়াতাড়ি বাড়ি চলে এসো।

গণভবন থেকে রাত সাড়ে আটটায় ধানমন্ডির বাড়িতে ফিরলেন বঙ্গবন্ধু। গেটের কাছে এসে হঠাৎ মার্সিডিজ গাড়ির স্টার্ট বন্ধ হয়ে যায়। আবার স্টার্ট দিয়ে গাড়ি চলে আসে বাড়ির ভেতরে।

সিঁড়িতে ওঠার সময় বঙ্গবন্ধু বললেন, বেগম সাহেবের মন-মেজাজ কেমন? গৃহভৃত্য ফরিদ জানায়, সব ঠিক আছে। প্রতিদিন দোতলায় ওঠার সময় একই কথা বলেন। শুনতে শুনতে ফরিদের প্রশ্ন-উত্তর দুইটাই মুখস্থ হয়ে যায়। তাই আগে থেকে উত্তর রেডি রাখে।

দোতলায় এসে এক অদ্ভুত পরিস্থিতির মুখে পড়লেন। বঙ্গবন্ধুর কাছের দুজন উদ্বিগ্ন হয়ে আছেন ভাগ্য গণনার ফল নিয়ে। মহাজাতক শহিদ আলবোখারি মন্তব্য করেছেন, যে-কোনো সময় বঙ্গবন্ধুর প্রাণনাশের ঘটনা ঘটবে। তিনি গণনার ফল বলেছেন ফটোসাংবাদিক জহিরুল হককে।

জহিরুল এই খবর নিয়ে দ্রুত চলে আসেন বাংলার বাণী অফিসে, ফজলুল হক মনির কাছে। মহাজাতকের ওপর এদের সবার অগাধ বিশ্বাস। মনি এবং জহিরুল এই খবর নিয়ে সন্ধ্যার পর ধানমন্ডি চলে আসেন। মনি বললেন, 'মহাজাতকের কথা ফেলে দেবেন না। কয়েক দিন দেশের বাইরে থেকে ঘুরে আসুন।'

বঙ্গবন্ধু বললেন, 'এখন সম্ভব নয়, কাল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রোগ্রাম। অনেক কাজ। তোরা বাড়ি যা।' জহিরুল বেরিয়ে গেলেন, বসে থাকলেন মনি।

ডাইনিংটেবিলে মাছ, ডাল আর ভাত সাজানো। টেবিলে বড় বড় কই মাছ দেখে বললেন, হাসুর মা, এত বড় কই মাছ পেলে কোথায়?

নাসের খুলনা থেকে নিয়ে এসেছে।

এত বড় কই মাছ তো আর দেখাই যায় না। প্লেট দাও খাই। বলতে বলতে বেসিনে হাত ধুয়ে খেতে বসলেন। নিজে একটা তুলে নিলেন। এরপর ফজিলাতুন্নেছা আরো দুইটা তুলে দেন।

এত বড় তিনটা কই মাছ কি খেতে পারব?

পারবে, খাও। নাসের তুমিও বসো।

রাসেল বাবার সঙ্গে খেতে বসেছে। এবার বসলেন ছোটভাই নাসের এবং সেরনিয়াবাত। মনি বসলেন না, উঠে গেলেন ছাদে। একটা সিগারেট টেনে নিচে নেমে এলেন। ততক্ষণে খাবার শেষ করে সেরনিয়াবাতের সঙ্গে গল্প করতে বসেছেন বঙ্গবন্ধু। হাতে পাইপ।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় বোমা বিস্ফোরণ ঘটনার খবর শুনছেন। মন থেকে দুশ্চিন্তা যাচ্ছে না। কথার ফাঁকে বললেন, ছোটবেলায় নদীর পাড়ের মাঠে ফুটবল খেলতাম, ওখানে আর মাঠের চিহ্ন নাই। এখন চর আর চর। ড্রেজার দিয়ে ওখানে নদী খননের কাজ শুরু করব। নদীগুলো বাঁচাতে হবে। রাত সাড়ে ১০টার পর বিদায় নেন সেরনিয়াবাত।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বশেষ খবর নিয়ে ক্যাম্পাস থেকে রাত সোয়া তিনটায় বাড়ি ফিরলেন শেখ কামাল। মধ্যরাত পর্যন্ত পাশের বাড়িতে ক্যারাম খেলে বাড়ি ফিরেছেন জামাল। ঘরে তাদের সদ্য বিবাহিত স্ত্রী, সুলতানা ও রোজী। কাজের সুবাদে আজ ঢাকায় এসেছেন বঙ্গবন্ধুর ছোটভাই শেখ নাসের। জার্নির ধকলে তিনি ক্লান্ত। রাতের খাবার খেয়ে ঘুমিয়ে পড়েছেন। বাড়ির বড় মেয়ে হাসিনা জার্মানিতে। তার সঙ্গে আছেন ছোট মেয়ে রেহানা। প্রতিদিনের মতো রান্নাঘর সামলে সবার শেষে ঘুমাতে যান বেগম ফজিলাতুন্নেছা।

বেডরুমের দরজার সামনে শুয়ে পড়েছে গৃহভৃত্য রমা ও সেলিম।

সারা দেশ এখন ঘুমের তলায়।

শুধু জেগে আছে ফারুক-রশিদ গং আর আমেরিকান দূতাবাসের কয়েকজন। অল্প আলোতে অফিসে বসে আছেন ইউনিজন বোস্টার। তার পাশে কয়েকজন । পিয়ন ভৃত্যরা এখন কেউ নেই। ছয় জন দূতাবাস কর্মকর্তার সঙ্গে দুজন বাঙালি। মাহবুবুল আলম চাষী আর করিম।

বোস্টার যে সময় রেড ওয়াইনের গ্লাস নিয়ে চিয়ার্স করেছে তখন ক্যান্টনমেন্টে অন্য দৃশ্য।

আড়মোড়া ভেঙে চলতে শুরু করল টু-ফিল্ড রেজিমেন্টের কামানবাহী শকটের যানগুলো। ক্যান্টনমেন্টের দক্ষিণ প্রান্ত থেকে ১০৫-এমএম কামানগুলো টেনে নিয়ে যায় ট্রাকের বহর। এদের গন্তব্য নতুন বিমানবন্দরের রানওয়ে। বর্তমানের হজরত শাহজালাল বিমানবন্দরটি তখনো চালু হয়নি।

রাত দশটার কিছুক্ষণ পর রানওয়ের ওপর হাজির হলেন মেজর ফারুক। সঙ্গে এনেছেন ট্রাক বোঝাই সৈন্য আর ট্যাংক। ট্যাংকগুলো মিশরের প্রেসিডেন্ট আনোয়ার সাদাতের উপহার।

বেঙ্গল ল্যান্সারের টি-৫৪ ট্যাংকগুলো গড়িয়ে চলল রাস্তায়। কাঁপতে থাকে রাতের অন্ধকার। রাস্তায় কোনো লোকজন নেই। বিমানবন্দরে হাজির হলো বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর দুটি যান্ত্রিক ইউনিট। সঙ্গে আঠারোটি কামান, আটাশটি ট্যাংক এবং অসংখ্য হালকা ও ভারি অস্ত্র।

কয়েকজনকে সঙ্গে নিয়ে এলেন মেজর ডালিম। দলে আছে আজিজ পাশা, বজলুল হুদা, নূর চৌধুরী এবং শাহরিয়ার। সন্ধ্যার পর মতিঝিল থেকে তারা সবাই ক্যান্টনমেন্টে শাহরিয়ারের বাসায় যান। পাঁচ জন মিলে এক বোতল ব্ল্যাক লেবেল হুইস্কি আর গরুর ভুনা মাংসের সঙ্গে পরোটা খেয়ে বেরিয়েছেন।

ব্ল্যাক লেবেল সবার পছন্দের। কারণ, এই হুইস্কি নিয়মিত পান করতেন পাকিস্তানের জাতির জনক মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ। এর সঙ্গে জিন্নাহর পছন্দ ছিল শূকরের মাংস থেকে তৈরি বেকন। ঢাকায় তখন বেকন পাওয়া যেত না, তাই গরুর মাংস সামনে নিয়ে ডালিমদের চিয়ার্স করতে হলো।

দলে যোগ দেয়ার কথা ছিল গোলন্দাজ বাহিনীর জয়দেবপুর ইউনিটের কমান্ডিং অফিসার মেজর শাহজাহানের। তাকে জানানো হয়নি, রাতে দল নিয়ে আসার কারণ। দুই দিন আগে জানতে চাইলে রশিদ বলেন, চলে আসবেন। পরে সব জানতে পারবেন।

রাত সাড়ে নয়টায় বাসা থেকে বেরোবার সময় শাহজাহান ফোন করেন। রশিদ ফোন ধরে শুনতে পান, আমার ফোর্সরা ক্লান্ত। আজ মহড়া করা যাচ্ছে না। রশিদের মুখ থেকে কোনো কথা বেরোল না।

ফোন রেখে দিয়ে দ্রুত বাসা থেকে বেরিয়ে আসেন। কিছুক্ষণ পর ফারুকের সঙ্গে দেখা হতে রশিদ জানান, ফোর্স নিয়ে শাহজাহান আসতে পারছে না। 'শালারা সব বেড়াল হয়ে গেছে। ডালিম কোথায়?' বললেন ফারুক।

রশিদ জানান, আমার সঙ্গে কথা হয়নি।

কিছুক্ষণ পর ডালিম আসে পাঁচ জনের দল নিয়ে। ঢাকা শহরের মানচিত্র হাতে নিয়ে লাফ দিয়ে ট্যাংকের সামনে উঠে দাঁড়ালেন ভোমরা। ছোটবেলায় পরিবারের কয়েকজন ফারুককে ভোমরা বলে ডাকতেন। জীবনের সকল কাজের সঙ্গে এই নামটা বেশ মানিয়ে যায়।

এখনো প্রধান কয়েকজন ছাড়া সাধারণ সেনারা জানেন না কী ঘটতে চলেছে। তাদের শপথ পড়া 'That I shall go whereever My Superior orders me even at the peril of My Life'. তাই উর্দি পরা জোয়ানরা এখন দলপতির হুকুম পালন করতে প্রস্তুত।

ট্যাংকের ওপর দাঁড়িয়ে এদিক-ওদিক তাকিয়ে দেখলেন। হাতে ট্রিপল ফাইভ সিগারেট। একটা লম্বা টান দিয়ে সিগারেট ফেলে জোয়ানদের অন্তরে বিষ ছড়াতে শুরু করেন।

প্রথমে শুরু করলেন ইংরেজিতে। বললেন, No delay, Here and now we shall have to strick, Let us kill him and make history. এ সময় পাশে থেকে মেজর নূর চেঁচিয়ে বললেন, Let us do or die.

ফারুকের কথা এখনো শেষ হয়নি। জোয়ানরা ইংরেজি বোঝেন না, তাই ফারুক বাংলায় বলতে শুরু করলেন, 'শেখ মুজিব বিশ্বাসঘাতকতা করে বাকশাল কায়েম করেছে। সেনাবাহিনীর পাল্টা রক্ষীবাহিনী গঠন করেছে। রাজতন্ত্র কায়েম করেছে। আমরা রাজতন্ত্র সমর্থন করতে পারি না। এসব করতে গিয়ে সেনাবাহিনীর বাজেট কমিয়েছে। আর্মি বোধহয় আর থাকবে না, ডিসব্যান্ড হয়ে যাবে। সেনা ও ল্যান্সার ভেঙে দিতে চেষ্টা করছে। বিদেশি শক্তির কাছে মুজিব দেশ বিক্রি করে দিয়েছে। এই অবস্থায় দেশের সরকার বদল ছাড়া আর কোনো বিকল্প নেই। মুজিবকে দিয়ে প্রক্লামেশন করিয়ে সব চেঞ্জ করতে হবে। যদি সে রাজি না হয়, যদি রেজিস্ট্যান্স হয়, দেশ বাঁচবে না, আমরা কেউই সার্ভাইভ করব না। কাজেই তাকে এক্সিকিউট করা লাগবে।'

রাত সাড়ে এগারোটায় আসে আরো কয়েকজন।

এবার অপারেশনের দায়িত্ব ভাগ করার কাজ। ফারুক বললেন, মুজিবের বাড়ি আক্রমণ করবে ডালিম।

এখানে না, আমি অন্য জায়গায় যাব, বললেন ডালিম।

ওকে। তাহলে মহিউদ্দিন যাও। তোমার সঙ্গে থাকবে হুদা আর নূর।

রশিদ দায়িত্ব নেয় অপারেশনের পর রাজনৈতিক পরিস্থিতি মোকাবিলা করার প্রধান কাজ বাহিনীপ্রধানদের সঙ্গে যোগাযোগ এবং গুরুভাই খন্দকার মোশতাককে

ক্ষমতায় বসানো। রশিদের ওপর বাড়তি দায়িত্ব পড়ল সকল পরিস্থিতি সামাল দেয়ার। এই কাজে রশিদের পাশে থাকবেন মাহবুবুল আলম চাষী।

রাত গড়াচ্ছে। শোবার ঘরে পায়চারি করছেন ফরিদা। মন ছটফট করছে। হঠাৎ বিদ্যুৎ চলে যায়। জেনারেটর নষ্ট। সরু আকারের মোমবাতি গলতে গলতে নিভে যাচ্ছে। আজ রাতের অন্ধকারকে বেশি কালো মনে হচ্ছে। এদিকে তার স্বামী ফারুক রহমান এখন খুনের প্রস্তুতি নিচ্ছেন।

ট্যাংক থেকে নেমে সামনে দাঁড়ানো জোয়ানদের ফারুক বললেন, ধানমন্ডির বাসা দুইটি বৃত্তাকার অবস্থায় ঘিরে রাখা হবে। একটা ভেতর বৃত্ত আর একটা বাহির বৃত্ত।

এই ভেতর বৃত্তে যারা থাকবে তারা গুলি চালাবে। আর যারা বাহিরে থাকবে তারা কেউ আক্রমণ করলে তাদের ঠেকাবে। ধানমন্ডি ২৭ নম্বর রোড, সোবহানবাগ মসজিদ, লেক ব্রিজ এলাকা ব্যারিকেড দিয়ে রাখা হবে। একই সময়ে আক্রমণ করা হবে মনি ও সেরনিয়াবাতের বাসা।

মিন্টো রোডে সেরনিয়াবাতের বাসা আক্রমণের দায়িত্ব পায় ডালিম। তার সঙ্গে থাকবে একটি হেভি মেশিনগান, জিপ, পর্যাপ্ত অ্যামুনিশন, গুলি, এক প্লাটুন ল্যান্সার এবং একটি বড় ট্রাক।

শেখ মনির বাসা আক্রমণের দায়িত্ব রিসালদার মোসলেমউদ্দিনের। রেডিও স্টেশন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস এবং নিউ মার্কেট এলাকার দায়িত্বে মেজর শাহরিয়ার, পিলখানা থেকে বিডিআর আক্রমণ করলে তাদের ঠেকাবে। সেনাবাহিনী আক্রমণ করলে যুদ্ধবিমান নিয়ে তৈরি থাকবেন লিয়াকত।

দুই দিন আগে ফারুক তাকে সব বুঝিয়ে দিয়েছেন। শেরেবাংলা নগর এবং সাভার এলাকা থেকে রক্ষীবাহিনী আক্রমণ করতে পারে। তাদের ঠেকানোর দায়িত্ব ফারুকের। সঙ্গে থাকবে আটাশটি ট্যাংক। আক্রমণের সব ধরনের প্রস্তুতি শেষ। একটু পরেই হানা দেবে ফারুকের দল।

রাত পৌনে তিনটায় বঙ্গবন্ধুর বাড়িতে আসে সুবেদার মেজর ওয়াহাব জোয়ার্দার।

প্রতিদিন না, মাঝেমধ্যে রাতে এসে ডিউটি চেক করে যায়। আজ আসার কারণটা ভিন্ন। কয়েক দিন আগে কুমিল্লা সেনানিবাস থেকে ঢাকায় বদলি হয়ে এসেছে ১০৫ জনের একটি কোম্পানি। এদের মধ্যে হাবিলদার আবদুল গনি, হাবিলদার কুদ্দুস সিকদার, নায়েক সুবেদার আবদুল মোতালেব, নায়েক জলিল,

সিপাহি সোহরাব এবং নায়েক হাবিবসহ পঁচিশ জন সেনার দল রাষ্ট্রপতির ধানমন্ডির বাড়ির ডিউটি পায়।

ডিউটি চেক করতে এসে হাবিলদার গনিকে ওয়াহাব বলেন, 'এখন পুরোনো গুলি দিয়ে দাও। নতুন গুলি দেয়া হবে সকালে।' এই বাড়িতে পাহারারত পুলিশ ও সেনা সদস্যদের ছোট একটি আকারের অস্ত্রাগার ছিল। গুলি ছিল এক হাজার রাউন্ড। সব গুলি নিয়ে যায় ওয়াহাব। গুলিহীন রাইফেল নিস্তেজ হয়ে পড়ে। গনির ডিউটি শেষ হয় রাত চারটার পর। সাতজনকে সঙ্গে নিয়ে আসে হাবিলদার কুদ্দুস সিকদার।

সাড়ে চারটায় আটাশটি ট্যাংক নিয়ে বিমানবন্দর রোড ধরে এগিয়ে আসতে থাকেন ফারুক।

আক্রমণের প্রথম টার্গেট বঙ্গবন্ধুর বাসভবন।

খুনি দলের বৈঠক হলো সেনাবাহিনীর ফিল্ড গোয়েন্দা ইউনিটের কয়েক শ গজ দূরে। অথচ গোয়েন্দাদের কাছে কোনো খবর ছিল না। মিশরীয় ট্যাংকগুলো আড়মোড়া ভাঙল মধ্যরাতের পর। অস্ত্র হিসেবে ট্যাংক ভয়ংকর। ট্যাংক দেখে প্রাণভয়ে সবাই পালানোর চেষ্টা করবে। তাই গোলা ছাড়া ট্যাংকগুলো নিয়ে এগোন ফারুক।

বিকট শব্দে ক্যান্টনমেন্ট এবং বনানী এলাকার মাটি কাঁপতে লাগল। শব্দে অনেকের ঘুম ভাঙল। তবে বিছানা ছাড়ল না কেউ। কেউ কেউ জানালা দিয়ে উঁকি মেরে ট্যাংক দেখে আবার শুয়ে পড়ল। কেউ ভাবল না, এই সময়ে ট্যাংকগুলো কোথায় যাচ্ছে?

বড় রাস্তা ধরে বিমানবাহিনীর হেলিপ্যাডের উল্টো দিক দিয়ে তেজগাঁও এয়ারপোর্টের দিকে চলে আসেন ফারুক। কিছু দূর এসে দেখলেন বাইশটি ট্যাংক বিকল। ছয়টি ট্যাংক বিমানবন্দর রোড ধরে ফার্মগেটের কাছাকাছি চলে আসে। দ্রুত এগিয়ে যায় পুরোনো রানওয়ের পশ্চিম প্রান্তে। এখন একটি ট্যাংক সচল। এর ভেতর থেকে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছেন ফারুক। কোমরে গুলি ভরা তিনটি পিস্তল।

একটি দেয়াল ভেঙে ট্যাংকটি হাজির হয় রক্ষীবাহিনীর হেডকোয়ার্টার্সের সদর দরজায়। দেখে হাজার হাজার বীর সেনা কাঁপতে লাগলেন। মাথা ঘুরে গেল। ফারুক জানতেন, ট্যাংকের সামনে দাঁড়ানোর সাহস এদের নেই। দেখলেই হাত থেকে রাইফেল পড়ে যাবে, বেঁকে যাবে হাঁটু। বাস্তবে তা-ই হলো।

ভয়ে শেরেবাংলা নগর এমপি হোস্টেলের বাইরে অবস্থান নেন রক্ষীবাহিনীর অনেক সদস্য। সবার পরনে লুঙ্গি। খালি পা। গায়ে স্যান্ডো গেঞ্জি। তাদের দলপতি ব্রিগেডিয়ার নুরুজ্জামান দেশের বাইরে। সেমিনারে অংশ নিতে ঢাকা

ছেড়েছেন ১২ আগস্টের দুপুরে। নুরুজ্জামান না থাকায় দায়িত্বে আছেন পাকিস্তান প্রত্যাগত লেফটেন্যান্ট কর্নেল আবুল হাসান। তিনি দুর্বলচিত্তের মানুষ।

ভোররাতে অদ্ভুত স্বপ্ন দেখে ঘুম ভাঙল মোশতাকের।

সামনে একটা বিশাল সিংহাসন। দেখতে অনেকটা মোগল সম্রাট শাহজাহানের ময়ূরসিংহাসনের মতো। এটা তৈরি করতে ৭২০ কেজি সোনা লেগেছিল। সম্রাটের শৌখিনতার রোগ ছিল। স্ত্রী মমতাজের সমাধিসৌধ বানাতে রাষ্ট্রের সব টাকা খরচ করে দেউলিয়া হয়ে যান। এ রকম একটা সিংহাসনের সামনে খালি গায়ে দাঁড়িয়ে আছেন মোশতাক। পরনে খাকি হাফ প্যান্ট। ওপরে স্যান্ডো গেঞ্জি। এ ধরনের পোশাকে কেউ কোনোদিন সিংহাসনে বসেনি। মোশতাক প্রথম হতে চলেছেন।

বসার সময় দেখলেন অনেক বিষধর সাপ সিংহাসনের ওপর ফণা তুলে আছে। ভয়ে আঁতকে উঠলেন। মনে পড়ল নবাব সিরাজের কথা। প্রাণ বাঁচাতে মুর্শিদাবাদ ছেড়েছিলেন বাংলার শেষ নবাব। পরে তাঁকে ধরে এনে কাঁটা-বিছানো সিংহাসনে বসতে দেয়া হয়েছিল।

মোশতাক ভাবলেন, সাপের চেয়ে কাঁটা ভালো। কারণ, কাঁটা হাত দিয়ে সরানো যায়। ফণা তোলা সাপ ধরা সহজ নয়, কঠিন। এটা ওঝাদের কাজ। ভয়ে চিৎকার করে বললেন, দেশের সব ওঝাকে এখনই তলব করা হোক।

মোশতাক চিৎকার করেই যাচ্ছেন, কিন্তু ওঝাদের দেখা পেলেন না।

এরপর আরেক ঘটনা ঘটল। স্বপ্নে দেখলেন দরবারের সবাই মানুষ থেকে এক মুহূর্তে সাপ হয়ে গেল। ফণা তোলা ভয়ংকর সাপ। দেখলে সবারই আত্মারাম শুকিয়ে যাবে। ভয়ে দোয়া ইউনুস পাঠ করার চেষ্টা করলেন, কিছুতেই মনে পড়ছে না।

আগামসি লেনের বাড়িতে মোশতাক যখন স্বপ্ন দেখে জেগে উঠেছেন ঠিক এই সময় তার দলের ছেলেরা বঙ্গবন্ধুর বাড়ির ভেতরে গুলি করতে করতে প্রবেশ করেছে। এবং এরই মধ্যে বড় ছেলে শেখ কামালকে খুন করে সিঁড়ির গোড়ায় অস্ত্রহাতে কয়েকজন দাঁড়িয়ে আছে।

নিচতলায় কাজের লোক আর নিরাপত্তারক্ষীরা হাঁ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকল। নূর বললেন, তোরা সব দেয়ালের পাশে দাঁড়া। এমন সময় নিচের তলায় ডিউটিরত পুলিশ ইন্সপেক্টরকে গুলি করে হুদা। সে টেবিলের ওপর পড়ে যায়। জবাই করা মুরগির মতো ছটফট করে নিস্তেজ হয়ে যায়। টেলিফোনগুলোর ওপর উবু হয়ে পড়ে থাকে লাশ। রক্তে ভেসে যায় সারা ঘর। শোবার ঘরে এসে রেড ফোনের রিসিভার তুললেন বঙ্গবন্ধু।

ফোন করলেন সেনাপ্রধান সফিউল্লাহ্‌কে।

'তোমার বাহিনী আমার বাসায় আক্রমণ করেছে। মনে হয়, তারা কামালকে খুন করেছে। এক্ষুনি বাহিনী পাঠাও।' এ কথা শুনে ভয়ার্ত গলায় সেনাপ্রধান বললেন, স্যার আই এম ডুইং সামথিং। কয়েকবার হ্যালো হ্যালো বললেন সফিউল্লাহ্‌। ফোনের ওপার থেকে কোনো কথা শুনতে পেলেন না। রিসিভার রাখতে যাবেন, এমন সময় গুলির শব্দ পেলেন।

সফিউল্লাহ্‌কে পছন্দ করতেন বঙ্গবন্ধু। মেজর থেকে মেজর জেনারেল করা হয়েছিল মাত্র তিন বছরে। এ নিয়ে ক্যান্টনমেন্টে অসন্তোষ ছিল। বঙ্গবন্ধু ফোন করার আগেই সেনাপ্রধান মেজর জেনারেল কাজী মোহাম্মদ সফিউল্লাহ্‌র ঘুম ভেঙেছে ফজরের আজানের সময়।

সকালের আলো ফোটেনি। এই সময় বাড়ির ডোরবেল বেজে ওঠে। পর পর তিনবার। দরজা খুলে দেখেন মিলিটারি ইন্টেলিজেন্সের ডিরেক্টর সালাহউদ্দিন দাঁড়িয়ে আছেন। সেনাপ্রধানকে স্যালুট দিয়ে সালাহউদ্দিন বললেন, আপনি কি আর্মড এবং আর্টিলারি ডিভিশনকে শহরের দিকে পাঠিয়েছেন?

কই না তো! হতবাক সেনাপ্রধান।

বুঝতে অসুবিধা হলো না, এখন কোনো একটা অঘটন ঘটতে চলেছে। শেষরাতের ঠান্ডা বাতাসেও ঘেমে যাচ্ছেন সফিউল্লাহ্‌। বললেন, ব্রিগেড কমান্ডার শাফায়াত জামিল কি জানে?

জানি না। প্রথমে আপনার কাছে এসেছি।

তুমি যাও। শাফায়াতকে বলো, দুই আর চার নম্বর ব্যাটালিয়ন পাঠিয়ে ওদের এগিয়ে যাওয়া বন্ধ করতে।

জি স্যার।

স্যালুট জানিয়ে বিদায় নিলেন সালাহউদ্দিন।

গেটের কাছে থেকে ভেতরে এসে ডাইনিংটেবিলের কাছে দাঁড়ালেন সফিউল্লাহ্‌। পানির গ্লাস হাতে নেবেন। এমন সময় দেখলেন বেডরুমের দরজার ওপারে টেবিলের ওপর রাখা রেড ফোন বাজছে। রেড ফোন মানে রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ কেউ একজন ফোন করেছেন। দ্রুত পা ফেলে এগিয়ে এসে রিসিভার তুলে শুনতে পান বঙ্গবন্ধুর গলা।

সেনাপ্রধানের সঙ্গে কথা বলে বঙ্গবন্ধু ফোন করলেন সামরিক সচিব ব্রিগেডিয়ার মাসহুরুল হককে। বললেন, আমার বাড়ি আক্রান্ত। তাড়াতাড়ি ব্যবস্থা নাও। এরপর ফোন করলেন গোয়েন্দা বিভাগের পরিচালক কর্নেল জামিলকে। দুই মাস আগে জামিলকে এই পদে নিয়োগ দেয়া হয়েছে।

ব্রিগেডিয়ার রউফ এখন কোথায়? তাকে পাওয়া যাচ্ছে না। আক্রমণের খবর রউফ রাতেই জেনেছেন। রাত তখন আড়াইটা। ফোন আসে। রিসিভ করেন রউফ। শুনলেন, 'স্যার ক্যান্টনমেন্টের ট্যাংক আর অনেক সোলজার বেরিয়ে গেছে। সম্ভবত কোনো অঘটন ঘটতে যাচ্ছে। আপনি কিছু জানেন?' জানি না, বলে ফোন রেখে দিলেন রউফ।

বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে কথা হওয়ার পর সেনাপ্রধান ফোন করলেন ব্রিগেড কমান্ডার শাফায়াত জামিলকে। বললেন, সালাহউদ্দিন তোমাকে কিছু জানিয়েছে? শাফায়াত বললেন, না।

দুই ও চার নম্বর রেজিমেন্ট পাঠিয়ে যারা শহরের দিকে যাচ্ছে তাদের ফিরিয়ে আনো। এসব কথা বলে ফোন রেখে দিলেন সফিউল্লাহ্। সেনাপ্রধানের দেয়া এই তথ্যের সাথে শাফায়াত জামিলের স্মৃতিচারণের বড় ধরনের গরমিল।

বঙ্গবন্ধুর ফোন পেয়ে লাল রঙের প্রিন্স গাড়ি নিয়ে রওনা দেন কর্নেল জামিল।

পরনে সেনা পোশাক। কোমরে ঝুলছে চামড়ার খাপে ভরা পিস্তল। ৩২ নম্বর বাড়ির কাছাকাছি সোবহানবাগ মসজিদের কাছে আসতেই ফারুকের দলের সঙ্গে দেখা হয়।

কয়েকজন সেনা কর্মকর্তা রাইফেল তাক করে পাহারা দিচ্ছিল। তারা চিৎকার করে বলতে থাকে 'হল্ট' 'হল্ট'।

জামিল গাড়ি দাঁড় করান। কয়েকজন সেনা গাড়ির চারপাশ ঘিরে ধরে। একজন জানালা দিয়ে রাইফেল ঢুকিয়ে দেয়। নল মাথায় ঠেকিয়ে গুলি করে।

গাড়ির ড্রাইভিং সিটের পাশে বসে থাকা অবস্থায় প্রাণ যায় জামিলের। আরেকটা গুলি করা হয় পেটে। নাড়িভুঁড়ি বেরিয়ে যায়। বঙ্গবন্ধুর ফোন পেয়ে রওনা দেয় ব্রিগেডিয়ার মাসহুরুল। ধানমন্ডির কাছাকাছি মিরপুর রোডের ওপর দেখা হয় কালো পোশাক পরা কয়েকজন যমদূতের সঙ্গে।

যমদূতরা ফারুকের ট্যাংক বাহিনীর সদস্য। তারা হাত-পা বেঁধে মাসহুরুলকে রাস্তার পাশে ফেলে দেয়। মুখ বেঁধে দেয় গামছা দিয়ে। যমদূতের কাছে গামছা ছিল না। রাস্তার ওপর পড়ে থাকা একজন ভাসমান ভিক্ষুকের কাছ থেকে এটা নিয়েছে। ময়লা আর দুর্গন্ধে পেটের নাড়িভুঁড়ি বেরিয়ে আসতে চাইছে। মুখ শক্ত করে বাঁধা। তাই বমি বেরোচ্ছে না।

ধানমন্ডি ১৩/১ সড়কের এক বাড়ির সামনে গুলি শুরু হয়েছে।

স্টেনগান থেকে বৃষ্টির মতো গুলি বের হচ্ছে।

এই বাড়িতে থাকেন বঙ্গবন্ধুর ভাগনে শেখ ফজলুল হক মনি।

গুলির শব্দে মনি বুঝতে পারলেন, এটা সন্ত্রাসীর কাজ নয়, ডাকাত দলও নয়। এরা খুন করার জন্যই এসেছে। ভয়ে সোফায় বসে পড়লেন। কয়েক জায়গায় ফোন করলেন। কেউ সাড়া দেয় না। সবাই ফোন রেখে দিয়ে আবার ঘুমিয়ে পড়ল। কয়েকজন সেনা চলে আসে ড্রয়িংরুমে। মনি উঠে দাঁড়ালেন। সামনে দাঁড়ান মেজর ডালিম আর রিসালদার মোসলেমউদ্দিন। দুজনের হাতে গুলিভরা স্টেনগান। স্টেনগান থেকে গুলি করে মোসলেমউদ্দিন। এমন সময় সন্তানসম্ভবা স্ত্রী আরজু মনি সামনে এসে দাঁড়ান। দুজনে মেঝের ওপর লুটিয়ে পড়লেন। পড়ে যাওয়ার সময় মনির মাথা সোফার হাতলের সঙ্গে লাগে। রক্তাক্ত আরজু বললেন, আমাকে হাসপাতালে নিয়ে চলো। আমার ছোট ছোট দুইটা বাচ্চা আছে।

মা-বাবার মৃত্যুদৃশ্য দেখল তিন বছর বয়সের তাপস। খাটের তলায় বসে সব দেখল। খুনিরা চলে যাওয়ার পর তাপস মায়ের কাছে এসে বলে, মা, মাগো, তুমি কথা বলো? তার মা এখন কথা বলতে পারছেন না। ছেলের মুখের দিকে তাকিয়ে আছেন। কিছুক্ষণের মধ্যে থেমে গেল চোখের নড়াচড়া।

মিন্টো রোডের ৩৭ নম্বর বাড়িতে এখন রক্তগঙ্গা বইবে।

রক্তগঙ্গার কারিগররা জড়ো হয়েছে বাড়ির সামনে।

স্টেনগানের গুলি চালিয়ে দেয় বাড়ির ওপর। শব্দে ঘুম ভেঙে যায় সেরনিয়াবাতের। তিনি বঙ্গবন্ধুর ভগ্নিপতি। ফোন করলেন বঙ্গবন্ধুর বাড়িতে। ফোন ধরেছিলেন বেগম ফজিলাতুন্নেছা। ফোন করার পর তিনি এখন বাড়ির সবাইকে নিয়ে বৈঠকখানার ঘরে বসে আছেন।

নিজের পিস্তল নিয়ে বড় ছেলে আবুল হাসনাত সেনাদের ঠেকাতে চেষ্টা করলেন। ঘরের ভেতর থেকে বেশ কয়েক রাউন্ড গুলি ছুড়লেন। ঠেকানো গেল না। গুলির সংখ্যা বাড়ায় খুনির দল। একটার পর একটা নয়, ঝাঁকে ঝাঁকে গুলির কাছে হাসনাতের ব্যারিকেড তুচ্ছ হয়ে যায়। এক দল সেনা নিয়ে হুড়মুড় করে বাড়ির ভেতর চলে আসেন শাহরিয়ার। বৈঠকখানার ঘরে দেখা হয়। সেরনিয়াবাত জানতে চাইলেন, তোমাদের কমান্ডিং অফিসার কে?

শাহরিয়ার বললেন, আমাদের কোনো কমান্ডিং অফিসার নেই। আজ আমরা সবাই কমান্ডার। কে আপনি? কালো পোশাক পরা একজন সেনা কানের কাছে মুখ এনে বলে, ইনিই সেরনিয়াবাত। সঙ্গে সঙ্গে গুলি চালায় শাহরিয়ার। মেঝেতে পড়ে যান। মেয়ে হামিদা দৌড়ে এসে বাবাকে জড়িয়ে ধরেন। তার শরীরে ও পায়ে গুলি লাগে।

সেনারা হাসনাতকে খুঁজে বেড়ায় সারা বাড়ি। চিৎকার করে বলতে থাকে কোথায় হাসনাত? এই বাড়িতে খুন হয় আবদুর রব সেরনিয়াবাতের ১৪ বছরের কন্যা বেবি। আট বছরের ছেলে আরিফ। তিন বছরের নাতি এবং সেরনিয়াবাতের ভাইয়ের ছেলে। বড় মেয়ে এবং বেগম সেরনিয়াবাত গুরুতর আহত হন। পরে চিকিৎসায় তাঁরা সেরে ওঠেন। হাসনাত বাড়ির পেছন দিয়ে পালিয়ে কোনোমতে প্রাণ রক্ষা করেন।

সবশেষে বঙ্গবন্ধু ফোন করলেন তোফায়েল আহমেদকে।

দেশের মানুষ শক্তিমান নেতা হিসেবে তাকে চেনেন। এ ছাড়া তিনি বঙ্গবন্ধুর কাছের মানুষ এবং রাজনৈতিক সচিব। ফোন করে বললেন, 'বাড়িতে আক্রমণ হয়েছে। কিছু একটা করো।'

ঘুমের ঘোরে এ কথা শোনার পর এখন কী করবেন? বুঝে উঠতে পারলেন না। বিছানায় শুয়ে কথা বলছিলেন, এবার নেমে দাঁড়ালেন।

ঘুরন্ত লাট্টুর মতো তাঁর মাথা ঘুরছে। একসঙ্গে দুই গ্লাস পানি পান করলেন। তাও ঠোঁট ভিজল না। মুখ-ঠোঁট শুকিয়ে যাচ্ছে। বাড়ি থেকে বের হয়ে ৩২ নম্বরের সড়কের কাছাকাছি এসে গুলির শব্দ শুনতে পান। এই শব্দটা তার সাহস কেড়ে নেয়। দিশা হারিয়ে ফেলেন।

চেষ্টা করলেন। সাহস আর ফিরল না। এরপর উদ্‌ভ্রান্তের মতো হাজির হলেন রক্ষীবাহিনী সদর দফতরে। কীভাবে এবং কীসে চড়ে সেখানে পৌঁছলেন তা অজানা। গুলির শব্দের ভয় মন থেকে সরছে না। একটা ঘরের দরজা বন্ধ করে মেঝের ওপর বসে পড়লেন। হাঁটু কাঁপছে। মাথা দুলছে।

গুলির শব্দ ভালো না, বড়ই বিশ্রী শোনায়। এই শব্দ ভয় ধরায়। তাই ভয়ে ঝিম ধরে আছেন তোফায়েল। বঙ্গবন্ধুকে রক্ষার দায়িত্বে থাকা রক্ষীবাহিনীর বেশিরভাগ সদস্য এখন ঝিম মেরে বসে আছে। রানিক্ষেত রোগ লাগা মুরগির মতো। এই রোগে ধরলে চুনের মতো পায়খানা হয়। এটা খারাপ রোগ।

বেডরুমের মেঝের ওপর বঙ্গবন্ধু দাঁড়িয়ে আছেন।

বুকের ভেতর বয়ে যাচ্ছে মরু ঝড়। খাটের পাশে দাঁড়ানো ছোট টেবিলের ওপর একটা পানির গ্লাস। তৃষ্ণায় বুক ফেটে যাচ্ছে। তবু পানি পান করতে ইচ্ছা করল না। তামাটে খয়েরি রঙের পাইপটা হাতে নিলেন। চোখ গেল এরিনমোর কৌটার দিকে। তামাক নিতে ইচ্ছা হলো না। খালি পাইপ নিয়ে শোবার ঘর থেকে বের হতে পা বাড়ালেন।

বাঁ হাত চেপে ধরলেন বেগম ফজিলাতুন্নেছা। শরীর কাঁপছে। হাত ছেড়ে জীবনসঙ্গীকে বুকের সঙ্গে জড়িয়ে ধরলেন।

হাসুর মা ছাড়ো, নিচে যাই। নরম গলায় বললেন বঙ্গবন্ধু।

হাসুর মা কথা বলতে পারছেন না। কামালের গোঙানির শব্দ শোনার পর বুকে শ্বাস আটকে যাচ্ছে। বঙ্গবন্ধু দরজার সামনে এসে দেখলেন, পিস্তল হাতে দাঁড়িয়ে আছে মহিউদ্দিন। তার পেছনে হুদা আর নূর। সবার হাতে অস্ত্র। চোখ লাল।

বঙ্গবন্ধু বললেন, কী চাস তোরা?

স্যাটআপ-ইউ আর আন্ডার অ্যারেস্ট। বললেন নূর।

কই নিবি আমারে?

সাথে আসুন।

সিঁড়ির কাছে এসে একবার পেছনে ফিরে তাকালেন।

প্রিয়তমা স্ত্রী ফজিলাতুন্নেছার মুখের ওপর চোখ পড়ল। কথা হলো না।

শেখ মনির বাড়িতে হত্যাযজ্ঞ শেষ করে ধানমন্ডি চলে এসেছে মেজর ডালিম, রিসালদার মোসলেমউদ্দিন এবং মেজর শাহরিয়ার। নিচতলায় সবাই দাঁড়ায়। দৌড়ে ভেতরে যায় মোসলেমউদ্দিন। হাতে স্টেনগান। কোমরের দুই পাশে দুইটা পিস্তল ঝুলছে। সিঁড়ির কাছে গিয়ে দেখে, বঙ্গবন্ধুর সামনে দাঁড়িয়ে আছে নূর এবং মহিউদ্দিন, পেছনে হুদা, তার হাতে একটা গামছা।

বঙ্গবন্ধুর এক হাতে পাইপ। অন্য হাতে দিয়াশলাই। চোখে চশমা। পরনে চেক লুঙ্গি। গায়ে সাদা পাঞ্জাবি। সিঁড়ি দিয়ে নামার সময় হুদা পেছন থেকে গামছা দিয়ে বঙ্গবন্ধুর চোখ বাঁধার চেষ্টা করেন। হাত দিয়ে ঝটকা মেরে পেছন ফিরে হুদাকে বললেন, সরে যা এখান থেকে।

হুদা এক ধাপ পেছনে চলে আসে।

এমন সময় দৌড়ে এসে সিঁড়ির গোড়ায় দাঁড়ায় মোসলেমউদ্দিন। দাঁড়ানোর সময় ডান পা পিছলে যায়। কোনোমতে পা সামলে নিয়ে দাঁড়ায়। স্টেনগানের ট্রিগার টান দেয়। সিঁড়ির ওপর পড়ে যান বঙ্গবন্ধু। ঘড়িতে এখন পাঁচটা ৪৫ মিনিট।

বঙ্গবন্ধুর ঠোঁট এখনো কাঁপছে। স্টেনগানের একঝাঁক গুলি শরীর ছিঁড়ে বেরিয়ে যায়। মোসলেম গুলি করার পর, পিস্তল দিয়ে তলপেটে গুলি করে মেজর নূর। এরপর রিভলবার দিয়ে গুলি করে হুদা।

গুলির শব্দে ঘর থেকে দৌড়ে বেরিয়ে আসেন ফজিলাতুন্নেছা। সিঁড়িতে পড়ে থাকা বঙ্গবন্ধুর কপালে, বুকে হাত বুলিয়ে দিচ্ছেন আর বারবার বলছেন, হায় আল্লাহ এ কী হলো?

এভাবে কয়েকটা মুহূর্ত।

শেষবারের মতো ঠোঁট কেঁপে উঠে বঙ্গবন্ধুর। দুই চোখ স্থির হয়ে যায়।

ফজিলাতুন্নেছা কথা বলতে পারছেন না। বুক ফেটে যাচ্ছে। কালো পোশাক পরা একজন সেনা এসে হাত ধরে টেনে-হিঁচড়ে ওপরে নিয়ে যায়। তাঁর মাথা টলছে। নরম স্বরে কয়েকবার বললেন, বাবা, আমাকে এখানেই মেরে ফেলো, এখানেই মারো।

বেডরুমের দরজার সামনে এনে ধাক্কা মারে মুখোশ পরা সেনা। মেঝেতে পড়ে যান। পায়ে বাথরুমের চপ্পল। সুতি শাড়ি আর কালো রঙের ব্লাউজ পরে আছেন। গলায় মাদুলি বাঁধা সোনার সরু চেন। মেঝের ওপর থেকে মাকে ধরে তুললেন জামাল।

বিছানায় বসিয়ে দিয়ে বললেন, মা এখানে বসো।

সামনে দাঁড়িয়ে জামাল, রোজী, ডেইজি ও নাসের।

বিছানায় বসে পেছন থেকে মাকে বুকের সঙ্গে জড়িয়ে ধরে রেখেছে রাসেল। সবাই ভয়ার্ত। কারো মুখে কথা নেই।

ভেতর থেকে দরজা বন্ধ করে দিলেন নাসের। কয়েক মিনিট পরে দরজায় লাথি মারার শব্দ। লাথি মেরে দরজা খুলতে পারল না আজিজ পাশা। দরজার ওপরে পিস্তল দিয়ে গুলি করে ছিটকিনি ভেঙে ফেলে, চৌকাঠের সামনে দাঁড়ায় আজিজ পাশা।

বাথরুম থেকে বেরিয়ে আসেন ফজিলাতুন্নেছা।

বললেন, খবরদার ভেতরে যেয়ো না।

ধাক্কা দিয়ে ভেতরে চলে আসে পাশা। তার পেছনে তিন জন সেনা। এরই মধ্যে স্টেনগান হাতে এই ঘরে চলে আসে রিসালদার মোসলেমউদ্দিন। রুমের দরজা এখন ভেড়ানো।

একজন মুখোশ পরা সেনা রাসেলের হাত ধরে। শেখ নাসের আর বাড়ির ভৃত্য সেলিমকে বলে তোমরা আমার সাথে এসো। রাসেল আসতে চায় না।

চিৎকার করে কাঁদছে। মাকে ছেড়ে সে কোথাও যাবে না।

ওই সেনা হ্যাঁচকা টান দেয়। ফজিলাতুন্নেছা এগিয়ে এলে ধাক্কা দেয় আজিজ পাশা।

দোতলা থেকে নামার সময় বাবাকে দেখতে পায় রাসেল।

রক্তের ভেতর পড়ে আছেন। 'আব্বা' বলে একবার ডাক দেয়। সিঁড়িতে বড় ভাইয়ের লাশ দেখে কাঁপতে থাকেন নাসের। এমন সময় শোবার ঘরে স্টেনগানের গুলি চালায় রিসালদার মোসলেমউদ্দিন এবং মেজর আজিজ পাশা। গুলির বৃষ্টি। জবাই

করা প্রাণীর মতো ছটফট করেন ফজিলাতুন্নেছা, জামাল, সুলতানা কামাল এবং রোজী। সারা ঘর রক্তে ভেসে যায়। গুলি করে দৌড়ে নিচে নেমে আসে আজিজ পাশা।

নিচতলায় দেয়াল ঘেঁষে দাঁড়ানো একজন নিরস্ত্র পুলিশকে গুলি করে। ওই পুলিশ রাসেলের পাশে দাঁড়ানো ছিল। নিচতলা থেকে দেখলেন নাসের। এবার নিচতলার পাশে বাড়ির আঙিনায় আজিজ পাশা এসে নাসেরের সামনে দাঁড়ায়। যমদূত দেখে নাসেরের ভয় বাড়ে। ভয় জড়ানো গলায় বললেন, আমি মুজিবের ছোটভাই। খুলনায় ব্যবসা করি। আমাকে ছেড়ে দিন। আজিজ বলে, আপনি ওই ঘরে যান।

নিচতলা অফিস ঘরের ভেতরে যান নাসের। এই ঘরের সাথে বাথরুম। পানির কষ্টে বুক চৌচির। ভাবলেন, বাথরুমের কলে হাত পেতে পানি পান করি। পা বাড়িয়েছেন বাথরুমের দিকে। এমন সময় পেছন থেকে ব্রাশফায়ার করে আজিজ পাশা। বাথরুমের দরজার সামনে পড়ে যান। পানি, পানি বলে গোঙাতে থাকেন। এমন সময় পিস্তল দিয়ে গুলি করে হুদা। চিরতরে নিস্তব্ধ হয়ে যান শেখ নাসের।

দেয়ালের পাশে মহিতুলের কাছে এসে রাসেলকে ছাড়ে।

মহিতুলের হাত ধরে রাসেল বলে, মায়ের কাছে যাব। ভাইয়া, আমাকে মারবে না তো?

কী বলবে? ভেবে পায় না মহিতুল।

মহিতুল, মশালচি সেলিম ওরফে আবদুল, বুয়া রমা আর ডিএসপি নুরুল ইসলাম এখন গেটের কাছে। দেয়ালের পাশে লাইনে দাঁড় করানো হয়েছে। দোতলা থেকে টেনে নামানোর সময় সেলিমের পায়ে চোট লাগে। সে দাঁড়াতে পারছে না। বসে পড়ে। গাছপাকা কাঁঠাল মাটিতে পড়ার মতো শব্দ হলো। ভয়ে কাঁপছে বাড়ির কাজের ছেলে কাশেম ভুঁইয়া। এই বাড়ির কেউ তাকে কাশেম বলে ডাকে না। সবাই কিশোর বলে। দুই বছর আগে কাশেম কাজে যোগ দেয়। সেদিন বঙ্গবন্ধু বলেন, তোর নাম কী?

আমার নাম মোহাম্মদ আবুল কাশেম ভুঁইয়া।

বাড়ি কই?

কিশোরগঞ্জ।

তাহলে লম্বা নামের দরকার নাই। আজ থেকে তুই কিশোরগঞ্জের কিশোর। এদিনের পর থেকে কাশেম বলে আর কেউ ডাকেনি।

মশালচি শব্দের সাথে আমরা অনেকেই পরিচিত না। রাষ্ট্রপতি এবং প্রধানমন্ত্রীর জন্য বাইরে থেকে খাবার এনে পেন্টিরুম নামের একটি বিশেষ কক্ষে রাখা হয়। তখন এই খাবার থাকে দুই জনের দায়িত্বে। একজনকে বলে পেন্টিম্যান,

অন্যজনকে মশালচি। সেলিম রাষ্ট্রপতির বাড়ির মশালচি। গৃহভৃত্য হিসেবে কাজ শুরু করেছিল দুই বছর আগে, পরে মশালচির পদ পায়। বাড়ির সবাই ডাকতেন সেলিম। বঙ্গবন্ধু ডাকতেন আবদুল।

নিচে দাঁড়িয়ে আছেন নূর, হুদাসহ কয়েকজন। আজিজ পাশা চিৎকার করে বলে, সব শেষ।

এ কথা বলে দেয়ালের কাছে যায়। এখানে লাইন ধরে দাঁড়িয়ে আছেন কয়েকজন। মহিতুলের হাত ধরে কাঁপছে রাসেল। এদের পাশে কয়েকজন সাধারণ সেনা, একজন রিসালদার। তাকে ইশারা করে পাশা। কালো পোশাক পরা রিসালদার এগিয়ে এসে রাসেলের হাত ধরে।

মহিতুলের হাত ছাড়তে চায় না রাসেল। বলে, ভাইয়া আমাকে মারবে না তো? আমি মায়ের কাছে যাব।

রাসেল এখনো জানে না ওপরের ঘরে কী ঘটেছে।

রিসালদার বলে, মায়ের কাছেই তো নিয়ে যাচ্ছি। বিশ্বাস করে মহিতুলের হাত ছেড়ে দাঁড়ায়। রিসালদার ডান হাতের কবজি কাছে ধরে হাঁটতে থাকে। সিঁড়ির কাছে এসে বাবাকে পড়ে থাকতে দেখে রাসেল দাঁড়িয়ে পড়ে। পা চলে না। কান্নার শক্তি হারিয়ে ফেলেছে। রিসালদার হ্যাঁচকা টান মেরে ওপরের তলায় নিয়ে যায়। এই ঘরে মা ভাই ভাবি সবাই রক্তের ভেতর পড়ে আছেন। মায়ের মুখ চিনতে কষ্ট হয় না।

রিসালদার হাত ছেড়ে দেয়।

দরজার কাছে চিত হয়ে পড়ে থাকা মাকে জড়িয়ে ধরে। বারবার ডাকতে থাকে, মা, মাগো।

এখনো মায়ের জীবন সচল। দুই হাতের আঙুল নড়ছে।

কাঁপছে ঠোঁট।

খুনিদের কি তিনি কিছু বলতে চাইছিলেন? কী বলতেন? নিশ্চয়ই বলতেন, আল্লাহর দোহাই আমার রাসেলকে মেরো না। ওকে হাসুর কাছে পাঠিয়ে দিয়ো। এ কথা বলতে পারলে কি পাষাণ সেনাদের মন গলত? রক্ষা পেত রাসেলের জীবন? এসব প্রশ্নের উত্তর মেলাতে পারেনি সুমন।

মায়ের বুকের ওপর রাসেল।

সারা গায়ে মায়ের রক্ত। এমন সময় ঘরের উত্তর দেয়ালের কাছ থেকে রিসালদার গুলি চালায়।

মাথার খুলির এক পাশ উড়ে যায়, বেরিয়ে আসে চোখ।

ছিটকে পড়ে রাসেল। স্টেনগানের গুলিতে পরনের হাফ প্যান্টে আগুন লেগে যায়।

কিছুক্ষণ আগে নিচতলা পাশে থেকে রাসেলের 'মাগো' ডাক শুনতে পেয়েছিলেন মহিতুল। গুলির শব্দের পর 'মাগো' ডাক থেমে যায়। দুই চোখ বন্ধ করলেন মহিতুল। পানি বের হলো না।

এই রাতের ঘটনা সম্পর্কে সেনাপ্রধান দাবি করেন, ব্রিগেড কমান্ডার শাফায়াত জামিলকে ফোন করে নির্দেশ দিয়েছিলাম। সে যেন ওদের আটকায়। এ কথা মানতে নারাজ শাফায়াত। 'একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ, রক্তাক্ত মধ্য আগস্ট ও ষড়যন্ত্রের নভেম্বর' বইয়ে শাফায়াত লিখেছেন, "আমার বাইরের ঘরের দরোজায় ধাক্কাধাক্কিতে ঘুম ভাঙতেই আমি ভাবলাম, কি হচ্ছে? এতো সকালে দরোজার ওপর এ রকম ধাক্কাধাকি! দ্রুত পায়ে হেঁটে গিয়ে দরোজা খুলে দিই। দিতেই যা দেখলাম, তার জন্য তৈরি ছিল না সদ্য ঘুমভাঙা চোখ। আমার একটু দূরে দাঁড়িয়ে মেজর রশিদ। সশস্ত্র। তার পাশে আরো দুজন অফিসার। প্রথমজন মেজর হাফিজ (আমার ব্রিগেড মেজর) অন্যজন লেফটেনেন্ট কর্নেল আমিন আহমেদ চৌধুরী (আর্মি হেড কোয়ার্টারে কর্মরত)। তাদের কাছে কোনো অস্ত্র নেই। মনে হলো দুজনকে জবরদস্তি করে আনা হয়েছে। আমার চমক ভাঙার আগেই রশিদ উচ্চারণ করলো ভয়ঙ্কর একটি বাক্য, 'উই হ্যাভ কিলড্ শেখ মুজিব'। অস্বাভাবিক একটু কিছু ঘটেছে সেটা আগন্তুকদের দেখেই বুঝেছিলাম। তাই বলে এ কী শুনছি আমাকে হতবাক করে দিয়ে রশিদ বলে যেতে লাগল, ইউ হ্যাভ টেকেন ওভার দ্য কন্ট্রোল অব দ্য গভর্নমেন্ট আন্ডার দ্য লিডারশিপ অব খন্দকার মোশতাক।" ইতিহাসের পাতায় সেনাপ্রধান এবং ব্রিগেড কমান্ডার দুই ধরনের তথ্য দিয়েছেন। সত্য কোনটা?

১৫ আগস্টের সকালটা ফ্যাকাসে। আকাশ মুখ ভার করে আছে।

একটু দেরিতে হোসনে আরার ঘুম ভাঙল। শুক্রবার ছুটির দিন বলে বিছানা ছাড়তে ইচ্ছা করে না। সারা সপ্তাহের ক্লান্তি চেপে ধরে। ঘুম ভাঙার পর প্রতিদিনের মতো রেডিও অন করে শুনতে পেলেন, 'আমি ডালিম বলছি। স্বৈরাচারী মুজিব সরকারকে সেনা অভ্যুত্থানের মাধ্যমে উৎখাত করা হয়েছে। সারা দেশে মার্শাল ল জারি করা হলো। জননেতা খন্দকার মোশতাক আহমদের নেতৃত্বে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী ক্ষমতা দখল করেছে। বাংলাদেশ এখন থেকে ইসলামি প্রজাতন্ত্র হবে।'

ইথার-তরঙ্গে ভেসে আসা গরম শব্দের ঝাঁঝালো বাক্য শুনে চমকে উঠলেন হোসনে আরা। চমকে উঠল বাংলাদেশ।

সকাল সাড়ে ছয়টায় রেডিওতে ডালিম প্রথম ঘোষণা দেন, 'সেনাবাহিনী মুজিব সরকারকে উৎখাত করে দেশের স্বার্থে বন্দি করেছে। এই ঘোষণা আপেল মাহমুদ রেকর্ড করে ১০ মিনিট পর পর প্লে করেছে। এরপর ঘোষণা আবার রেকর্ড করেন আপেল। এবার ডালিম বললেন, 'সেনাবাহিনী ক্ষমতা অধিগ্রহণের সময় উচ্ছেদ করা রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিবুর রহমান নিহত হয়েছেন।'

সকাল দশটার পর মর্মান্তিক খবর শুনেছেন হোসনে আরা।

বিছানা থেকে লাফিয়ে নামার সময় পড়ে যান। মাথায় চোট লাগে। খাটের কোনায় লেগে কপালের ডান দিকটায় বেশ ফুলে যায়। এরপর কোনোমতে ঘর থেকে বেরিয়ে সুমনের বাড়ির সামনে এসে চিৎকার করে ডাকে। সুমন বেরিয়ে আসে। কথা না বলে সুমনের হাত ধরে এগিয়ে যায় ধানমন্ডি ৩২ নম্বর বাড়ির দিকে। রেডিওতে শোনা ডালিমের কথাগুলো মাথার ভেতর ঘুরপাক খাচ্ছে।

সুমন প্রশ্ন করে। আমরা কই যাচ্ছি বুবু?

হোসনে আরা উত্তর দেয় না।

টলতে টলতে ধানমন্ডি ৩২ নম্বরের দিকে এগিয়ে যায়। রাস্তার মুখে কালো পোশাক পরা তিন জন সেনা এগিয়ে এসে বলে, এখান থেকে সরে যান। কোনো কথা না বলে এগিয়ে যায় হোসনে আরা। 'হল্ট' 'হল্ট' বলতে বলতে আরেকজন সেনা এগিয়ে আসে। সেনার আদেশ হোসনে আরাকে থামাতে পারে না।

সেনা কর্মকর্তা কাছে এসে ধাক্কা দেয়। হোসনে আরা রাস্তার ওপর পড়ে যান। ওই সেনা বুট দিয়ে পেটে দুইবার লাথি মারে। সুমন চিৎকার করে কেঁদে ওঠে।

বেশ খানিকটা দূরে কয়েকজন কৌতূহলী লোক দাঁড়িয়ে আছেন। সবাই ঝিম ধরা মানুষ। দাঁড়িয়ে সেনাবাহিনীর গাড়ির আসা-যাওয়া দেখছে। হাইব্রিড শসার মতো দৃষ্টি। এদের মধ্যে কয়েকজন এসেছে রাষ্ট্রপতির বাড়ি লুট করার ধান্ধায়।

এই ভিড়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছেন আবুল মাল। হোসনে আরা যে মহল্লায় থাকেন সেই মহল্লার দোকানদার আবুল। প্রতিদিনের মতো আজ সকালে দোকান খুলে রেডিও অন করেন। একটা ফিলিপস রেডিও দোকানে থাকে। এখনো ভালো আওয়াজ হয়। রেডিও অন করে ডালিমের ঘোষণা শুনতে পেয়ে বেরিয়ে এসেছেন।

কর্মচারী বললেন, কই যান?

কোনো উত্তর দেননি।

আবুল মাল বঙ্গবন্ধুর বাড়ি লুট করার ধান্ধায় আসেননি। এসেছেন প্রাণের টানে।

রাস্তায় হোসনে আরাকে লাথি মারা দেখে দৌড়ে এলেন। সুমন আর আবুল মাল দুজন মিলে টেনে তুললেন। পেটে আর কোমরে প্রচণ্ড ব্যথা করছে। মাথা

ঘুরছে। কোনো কিছু ঠিকমতো দেখতে পাচ্ছেন না হোসনে আরা। সব ঝাপসা লাগছে। কয়েক ধাপ এগিয়ে এসে আরো দুজনকে ডেকে নিলেন। রাস্তায় কোনো যানবাহন নেই। সবাই ধরাধরি করে হোসনে আরাকে বাসায় নিয়ে আসেন।

বারোটার দিকে একবার হেঁচকি তুলে সংজ্ঞা হারালেন হোসনে আরা। সুমনের আব্বাজান একজন চিকিৎসক ডেকে আনলেন। তিনি এসেই বললেন, এখুনি হাসপাতালে নিয়ে চলুন, রোগীর অবস্থা ভালো না।

কয়েক জায়গায় ফোন করা হলো। অ্যাম্বুলেন্স পাওয়া গেল না। হোসনে আরার পাশের ফ্ল্যাটের লোকজনের ঝিম ধরা রোগ হয়েছে। শুধু পাশের ফ্ল্যাটের লোকজন না, সারা দেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষের ঝিম ধরা রোগ হয়েছে। রেডিওতে ডালিমের ঘোষণা শোনার পর থেকে কেউ আর হাসছে না।

হোসনে আরার চৈতন্য নেই। বিছানার ওপর শুইয়ে রাখা হয়েছে। মাথার কাছে সুমন বসে আছে। ওর ডান হাত কপালের ওপর রাখা। দুপুর পৌনে একটার দিকে একবার চোখ মেলে তাকালেন হোসনে আরা। ঠোঁট নড়ে উঠল। একজন চা-চামচে করে পানি দিলেন মুখে।

পানি গড়িয়ে পড়ল।

সারা রাত অফিসে ছিলেন মার্কিন রাষ্ট্রদূত বোস্টার।

ধানমন্ডির রাস্তায় আমেরিকান পতাকা ওড়ানো গাড়িতে ঘুরে গেলেন। পাশের সিটে বসে আছেন মাহবুবুল আলম চাষী। ড্রাইভারের পাশের সিটে করিম। শাহবাগ বেতার ভবনের সামনের রাস্তায় দুজনকে নামিয়ে দিয়ে গাড়িটা দ্রুত সটকে পড়ে। বেতার ভবনে ঢুকে পড়েন চাষী। পাশের পাঁচতারকা হোটেলে উঠলেন করিম।

ক্যান্টনমেন্ট অফিসার মেসে ঘুমাচ্ছেন মেজর শাহাদত হোসেন। আশপাশের কথার শব্দে ঘুম ভেঙে যায়। একজন হাবিলদার এসে জানায়, 'এখনই চিফ স্যারের অফিসে যান। স্যার আপনাকে ডেকে পাঠিয়েছেন।' সেনাপ্রধানের তলব। লাফিয়ে উঠলেন শাহাদত। চোখেমুখে পানির ঝাপটা দিয়ে পোশাক পরে নেন। ১০ মিনিটের কম সময়ের মধ্যে পৌঁছে যান।

স্যালুট দিয়ে সামনে দাঁড়ালেন।

সফিউল্লাহ্ গম্ভীর। বললেন, 'ধানমন্ডি ৩২ নম্বরে কী হয়েছে? দেখে এসে রিপোর্ট করো।' শাহাদত চলে যাওয়ার পর নিজ অফিসে বৈঠকে বসলেন সেনাপ্রধান। সঙ্গে আছেন জেনারেল জিয়া, খালেদ মোশাররফ এবং কর্নেল নাসিম। ভয়ে কাঁপছেন সফিউল্লাহ্। গলা দিয়ে কথা বেরোচ্ছে না।

এখনো বিছানায় ঢাকা স্টেশন কমান্ডার লেফটেন্যান্ট কর্নেল আবদুল হামিদ। ফোনের শব্দে ঘুম ভাঙল।

কর্নেল আবদুল্লাহর ফোন, 'হামিদ সাহেব কিছু শুনেছেন?

না, এইমাত্র ঘুম থেকে উঠলাম।

রেডিও অন করুন বলে ফোন রেখে দিলেন আবদুল্লাহ।

হামিদের খাটের পাশে একটা ছোট্ট গোল টেবিল। সেগুন কাঠের। এটা পাহাড়ি সেগুন। পার্বত্য এলাকায় পাহাড়ের গাছ কাটার ধুম চলছে তিন বছর থেকে। এই টেবিলটা সেই কাঠের। টেবিলের ওপরে পানি ভরা কাচের গ্লাস, টেলিফোন-সেট আর একটা রেডিও। রেডিও অন করে হামিদ শুনতে পেলেন, শেখ মুজিবকে হত্যা করা হয়েছে। গা কাঁটা দেয়া ডালিমের রেডিও ঘোষণা।

ডালিমের এই ঘোষণা শোনার পর সাভার রক্ষীবাহিনীর প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের দুজন সদস্য মাথায় রাইফেলের নল লাগিয়ে গুলি চালায়। আত্মহত্যার খবর শোকের পরিমাণ বাড়িয়ে তুলল। ভয়ে অনেক রক্ষী পালিয়ে যান।

দু-চার জন ঘুরে দাঁড়ানোর চেষ্টা করেছেন। তাদের একজন উপপ্রধান আনোয়ার উল ইসলাম এবং সারোয়ার হোসেন মোল্লা। তারা দুজন হতবাক। উপায়ান্তর না দেখে উপরাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলামের বাড়িতে ফোন করলেন।

আনোয়ার বললেন, স্যার রাষ্ট্রপতি নিহত, এখন উপরাষ্ট্রপতি হিসেবে আপনার ওপরই সব দায়িত্ব। আপনি রাষ্ট্রক্ষমতা হাতে নিয়ে সব বাহিনীপ্রধানকে ফোন করে বিদ্রোহী সেনাদের প্রতিহত করার আদেশ দেন।

উপরাষ্ট্রপতি নরম স্বরে বললেন, আমার এখানে কোনো স্টাফ নেই।

স্যার তাহলে আপনাকে আমাদের এখানে নিয়ে আসি।

এসো।

এরপর প্রধানমন্ত্রী ক্যাপ্টেন মনসুর আলীর সঙ্গে একই কথা হলো আনোয়ারের। উপরাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর জন্য গাড়ি নিয়ে বের হলেন আনোয়ার ও সারোয়ার। রাস্তা ফাঁকা। কিছুক্ষণের মধ্যে তারা পৌঁছে গেলেন। সৈয়দ নজরুলের বাড়িতে গিয়ে শুনলেন, তিনি বাড়িতে নেই, আত্মীয়ের সঙ্গে বাইরে গেছেন।

উপরাষ্ট্রপতির বাসভবনের উল্টোদিকে স্বাস্থ্যমন্ত্রী আবদুল মান্নানের বাসা। এই বাড়িতে ঢুকে পড়লেন দুজন। ড্রয়িংরুমে ঝিম মেরে বসে আছেন আবদুল মান্নান। তিনিও দিশা হারিয়ে ফেলেছেন।

এই বাড়ির লাল ফোন থেকে প্রধানমন্ত্রীর বাড়িতে ফোন করেন সারোয়ার। একজন ফোন রিসিভ করে জানান, স্যার একান্ত সচিবের সঙ্গে বাইরে চলে

গেছেন। তারা দুজন রক্ষীবাহিনী সদর দফতরে চলে আসেন। দফতরের সামনে এখনো একটি ট্যাংক গা বের করে দাঁড়িয়ে আছে।

কিছুক্ষণ পর রক্ষীবাহিনীর সদর দফতরে একটা জিপ এসে দাঁড়ায়। জিপ থেকে নামলেন কর্নেল আমীন আহম্মদ চৌধুরী এবং মেজর বালা রেড্ডি। বালা রেড্ডি ভারতীয় মেজর। প্রশিক্ষণ দিতে তিনি রক্ষীবাহিনীর সাভার প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে ছিলেন। সেখান থেকে আমীন আহম্মদ তাকে নিয়ে এসে সদর দফতরে দিয়ে গেলেন, কোনো কথা বললেন না। বিষয়টা রহস্যজনক।

পরদিন দেখা গেল, আমীন আহম্মদ প্রেসিডেন্টের মিলিটারি সেক্রেটারির পদে বসেছেন। তখন রহস্যের জট খুলে যায়। দুপুরের পর বালা রেড্ডিকে ভারতীয় হাইকমিশন অফিসে পাঠিয়ে দেয়া হয়।

ধানমন্ডির ৩২ নম্বর সড়কে একটা ট্যাংক এসে দাঁড়াল।

ট্যাংকের সামনে ফারুক। কালো পোশাক গায়ে। কোমরে ঝুলছে তিনটা পিস্তল। দেখে মনে হবে পিস্তল নিয়ে হকারি করতে বেরিয়েছেন সাতসকালে। তবে তাকে দেখে এখন কারো হকার মনে হচ্ছে না। হকারদের লাল চোখ আর চড়া মেজাজ থাকে না। ফারুকের দুটোই আছে।

ফারুক আসার পর আসে ডালিম। তাদের পাশে দাঁড়ায় ক্যাপ্টেন বজলুল হুদা, মেজর নূর, মেজর আজিজ পাশা এবং সুবেদার মেজর ওয়াহাবসহ আরো কয়েকজন। হুদা এবং ওয়াহাবকে কাছে ডাকে ফারুক। এখন পুরস্কার দেবেন ফারুক। খুন করার পুরস্কার।

ক্যাপ্টেন হুদার কাঁধে আটকে থাকা স্টার খুলে ওয়াহাবের হাতে দেয়। এবার ওয়াহাবের কাঁধের শাপলা খুলে হুদার কাঁধে লাগিয়ে তাকে মেজর পদে ওঠানো হলো। ওয়াহাবের কাঁধে দুইটা স্টার লাগিয়ে তাকে অনারারি লেফটেন্যান্ট বানালেন ফারুক। পুরস্কার দেয়ার পর হাত তালি দিলেন ডালিম।

জাতির জনক এবং দেশের রাষ্ট্রপতিকে পরিবারসহ খুন করার পুরস্কার বিতরণ শুরু হয়ে গেল। পদোন্নতির পুরস্কার দিয়ে হুদাকে ফারুক বলে, কেমন লাগছে মেজর সাহেব?

আনন্দে গদগদ হুদা বললেন, থ্যাংকস গড অ্যান্ড থ্যাংকস ইউ। কিছুক্ষণ পর ফারুক এবং ডালিমসহ সেনারা চলে যায়। যাওয়ার সময় কুদ্দুস সিকদারকে হুদা বললেন, বাড়ির লাশগুলো যেন এদিক-ওদিক না হয়।

৩২ নম্বর বাড়ি থেকে বের হয়ে ফারুক একটা জিপে উঠলেন। তার জিপের পেছনে এক ট্রাক বোঝাই সেনা। ট্যাংক চলে গেল শহরে ঘুরে বেড়াতে। কিছুক্ষণ

পর ফারুকের জিপ গাড়িটা এসে দাঁড়ায় আনোয়ার উল আলমের বাসার সামনে। আনোয়ার এই সময় বাসায় নেই। ড্রয়িংরুমের ফোন থেকে ফারুক ফোন করলেন আওয়ামী লীগ নেতা নূরুল ইসলামের বাসায়। বললেন, অপারেশন সাকসেসফুল।

রেডিওতে ডালিমের ঘোষণা শোনার পর থেকে উদ্বিগ্ন স্টেশন কমান্ডার এম এ হামিদ।

সেনাপ্রধানকে ফোন করলেন। ফোন বিজি।

এরপর ফোন করলেন উপ-সেনাপ্রধান জিয়ার বাসায়। রিসিভ করলেন বেগম খালেদা জিয়া। হামিদ বললেন, ভাবি জিয়াকে দেন। খালেদা বললেন, ভাই একটু আগে তিনি হুড়মুড় করে বেরিয়ে গেছেন।

কিছু বলে গেছে?

না।

তড়িঘড়ি রেডি হতে থাকেন হামিদ। পোশাক পরছেন। এমন সময় ফোন বেজে ওঠে। ফোন করেছেন সেনাপ্রধান। সফিউল্লাহ্ বললেন, হামিদ তুমি ঘটনা কিছু জানো?

রেডিওতে শুনলাম। কিছু বুঝতে পারছি না।

ট্যাংক আর্টিলারি ইউনিট ছেড়ে বেরিয়ে গেল, কেউ কিছু জানে না। তুমি কিছু জানো?

কিছুই জানি না। অফিসে যাচ্ছি। খবর থাকলে জানাচ্ছি।

রেডিওতে ঘোষণা দিচ্ছে এটা সেনা অভ্যুত্থান, মানে কী? ইটস ড্যাম ব্লাফ। ফোন রেখে দিলেন সফিউল্লাহ্।

এরপর অফিসে রওনা দিলেন হামিদ।

ক্যান্টনমেন্টের ভেতরে একটু পর পর সেনাদের জটলা। গাড়ি ছেড়ে এবার হাঁটতে শুরু করলেন। জিপ থেকে নামতেই কয়েকজন তাকে ঘিরে ধরল। হামিদ জানতে চাইলেন, স্টেশন থেকে ট্যাংক ও আর্টিলারি ইউনিট কখন বেরিয়ে গেল? তোমরা কেউ দেখেছ?

একজন সুবেদার জানান, 'স্যার, ট্যাংক তো আমাদের পাশ দিয়ে ওই রাস্তা ধরে শহরে গেল। ৪৬ ব্রিগেডের ভেতর দিয়েই তো গেল। কেউ তো কিছু বলল না। আর্টিলারি তো আমাদের পাশের ইউনিট। তারা রাতেই বেরিয়ে যায়।' দ্রুত পা ফেলে সেনা হেডকোয়ার্টার্সের গেটের সামনে পৌঁছে যান হামিদ। একজন সেন্ট্রি স্যালুট জানায়। সেনাপ্রধানের অফিসের প্রবেশপথের সামনে ডিরেক্টর অব

অপারেশন নূরউদ্দিনের অফিস। এখানে বড় আকারের জটলা। কামরার ভেতরে গিয়ে দেখলেন টেবিলের ওপর রাখা একটা রেডিও বাজছে।

হামিদ জানতে চাইলেন, কী ঘটেছে জানেন?

নূরউদ্দিন বললেন, স্যার আপনি যতটুকু জানেন, আমিও ততটুকু।

কর্মকর্তারা সেনাসদরে হাজির হতে শুরু করেছেন।

জিয়াউর ছাড়া সবার চোখেমুখে উৎকণ্ঠা। শেভ করা চকচকে মুখ জিয়ার। ছাঁটা গোঁফ। মেজর জেনারেলদের এক্সিকিউটিভ পোশাক পরে গাড়ির পেছন সিটে বসে এসেছেন। খালেদ মোশাররফ এসেছেন শার্ট আর পায়জামা পরে, মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়ি, পায়ে চপ্পল। সিনিয়র কর্মকর্তারা সবাই এলেন।

নূরউদ্দিনের কামরা থেকে বের হয়ে হামিদের সঙ্গে দেখা হয় কর্নেল মোমেনের। হামিদ বললেন, তোমার ইউনিট সব ট্যাংক নিয়ে বেরিয়ে গেল; অথচ তুমি কিছুই জানো না? মোমেন বললেন, স্যার, আমি তো সাত দিনের ছুটিতে। ফারুক সব ট্যাংক নিয়ে শহরে বেরিয়ে এসব কাণ্ড ঘটাল।

যাও দেখে এসো, তোমার ছেলেরা কী করেছে?

আপনার জিপটা দেবেন?

পাশে দাঁড়িয়ে আছেন নূরউদ্দিন। হামিদ তাকে বললেন, আরে ভাই ওকে একটা গাড়ি দাও না? কথা শেষ হতে না হতেই অফিসের সামনে ব্রেক কষার শব্দ। দুইটি জিপ এসে দাঁড়ায়। নেমে আসে ডালিম। হাতে গুলি ভরা স্টেনগান। সাথে কালো পোশাক পরা ছয় জন সেনা। সবার হাতেই অস্ত্র।

কয়েকজন সেনা এগিয়ে আসে।

ডালিম চিৎকার করে বলে দেয়, 'স্যাট-আপ ব্লাডি। গেট এওয়ে ফ্রম হেয়ার।'

ভয়ে যে যার মতো সটকে পড়ে।

তড়িঘড়ি করে বের হওয়ার সময় কেউ কেউ চেয়ার উল্টে ফেললেন। একজন আরেকজনকে ধাক্কা মারলেন। কে আগে পালাতে পারে সেই চেষ্টা চলল। ভেজা বেড়ালের মতো সরে গেলেন ঢাকা স্টেশন কমান্ডার হামিদ। তার মতো একে একে সবাই সরে যান। সেনাপ্রধানের অফিসে ঢুকে পড়ে ডালিম।

রুদ্ররূপ দেখে কাঁপতে থাকলেন সফিউল্লাহ্।

অফিসের ভেতরে এসে ডালিম চিৎকার করেন, চিফ কোথায়? ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকলেন সেনাপ্রধান। নাসিম বললেন, তিনি তো তোমার সামনেই বসে আছেন। সেনাপ্রধানের দিকে স্টেনগান তাক করে ডালিম বলে, প্রেসিডেন্ট আপনার সঙ্গে কথা বলবেন, আমার সঙ্গে আসুন।

হামিদ এক পা দুই পা করে এগিয়ে এলেন। অফিসের ভেতরের গরম কথাবার্তা কানে আসছে। ভেতরে যাবেন কি না ভাবছেন, এমন সময় দরজা খুলে বেরিয়ে এলেন সেনাপ্রধান। পেছনে স্টেনগান হাতে ডালিম। সফিউল্লাহ্‌র চোখে সানগ্লাস। নিজের গাড়িতে উঠলেন সেনাপ্রধান।

জিয়া বললেন, কাম অন ডালিম ইন মাই কার।

ডালিম বলে, নো স্যার আই ডোন্ট গো ইন জেনারেলস কার।

এবার যে যার গাড়িতে উঠে বসলেন। সেনাপ্রধানের পেছনের গাড়িতে ডালিম। পর পর উপ-সেনাপ্রধান জিয়াউর রহমান, ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশাররফ এবং কর্নেল নাসিমের গাড়ি। চারটা গাড়ি 'আউট' লেখা গেট দিয়ে বেরিয়ে গেল।

পেছনের গাড়িতে ডালিমের লোকজন। এদের সবার হাতে লোড করা স্টেনগান।

ডালিম আর দশজনের মতো স্বাভাবিক মানুষ নয়। ব্রোকেন পরিবারে বেড়ে ওঠা। শৈশবে মা মারা যাওয়ার পর বাবা আবার বিয়ে করেন। তখন জীবনের ছন্দপতন হয়ে যায়। ওই সময় থেকে বন্য স্বভাব স্থায়ী হয় মনের মধ্যে। মিথ্যা কথা সত্যের চেয়েও জোরালো উচ্চারণে বলতে পারে।

ঢাকা ক্যান্টনমেন্টে একটু পর পর জটলা।

সবখানে একই আলোচনা, সেনাপ্রধান কি হাইজ্যাক হয়ে গেলেন?

অন্য সকলের মতো হামিদের ভয় কাটছে না।

সেনাসদর থেকে রওনা দেয়া গাড়িগুলো ছুটে চলল ৪৬ ব্রিগেডের ফার্স্ট বেঙ্গল ইউনিটে। কিছুদূর যাওয়ার পর জিয়ার গাড়িটা বহর থেকে বেরিয়ে যায়। অন্য গাড়িগুলো কিছুক্ষণের মধ্যে ব্রিগেড অফিসে পৌঁছে। অফিসের সামনে দুই ট্রাক সেনা। রাতে এরাই হত্যাকাণ্ড ঘটিয়েছে।

জিপ থেকে নেমে রশিদের সঙ্গে দেখা হলো সফিউল্লাহ্‌র। স্যার আসুন, বলে ভেতরে নিয়ে গেলেন। বারান্দার সিঁড়িতে উঠতে যাবেন, এমন সময় একজন সাধারণ সেনা ফ্রেমে বাঁধানো বঙ্গবন্ধুর ছবি এনে বারান্দার ওপর ছুড়ে ফেলল। এরপর বুট পায়ে ছবির ওপর লাফালাফি শুরু করে।

সেনাপ্রধানকে নিয়ে আসা হয়েছে শাফায়াত জামিলের অফিসে। অথচ তিনি এখন অফিসে নেই। সকালে জিয়ার বাসায় যান। এরপর শাফায়াতকে কোথাও দেখা যাচ্ছে না। মুক্তিযুদ্ধের সময় জিয়া এবং শাফায়াত একসঙ্গে থেকেছেন। ওই সময় সম্পর্কের ঘনিষ্ঠতা বাড়ে।

সকালে জিয়ার বাসার সদর দরজায় কয়েকবার শব্দ করেন শাফায়াত জামিল। দরজা খুলে দেন জিয়া। পরনে স্লিপিং ড্রেসের পাজামা, ওপরে স্যান্ডো গেঞ্জি। এক গালে শেভিং ক্রিম লাগানো। অন্য গাল শেভ করা। হাতে রেজর।

স্যালুট দিয়ে দাঁড়ালেন শাফায়াত। জিয়া বললেন, এত সকালে।

শাফায়াত এবার বললেন, ধানমন্ডির বাড়িতে পরিবারসহ রাষ্ট্রপতি খুন হয়েছেন।

তা-ই! বললেন, জিয়া। একঝলক বিস্ময় প্রকাশ করলেও বিচলিত হতে দেখা গেল না। বললেন, So What President is dead? Vice president is there, Get your troos resdies uphold the constitution.

শাফায়াত বললেন, ইয়েস স্যার।

এখন অফিসের কাছে অন্য একটা রুমে জিয়া আর শাফায়াত কথা বলছেন।

এরই মধ্যে নৌবাহিনীপ্রধান রিয়ার অ্যাডমিরাল এম এইচ খান এবং বিমানবাহিনীপ্রধান এ কে খন্দকার চলে এসেছেন। সবাই এখন ৪৬ ব্রিগেড অফিসে।

তিন বাহিনীপ্রধান বেশ কিছুক্ষণ বৈঠক করলেন। বিশেষ কোনো কথা হলো না। চা পান আর কুশল বিনিময় হলো। সবার চেহারা থেকে উদ্বিগ্নতা চলে যায়। কৃত্রিম উদ্বিগ্নতার ছাপ বেশিক্ষণ থাকে না।

এখনো শাফায়াত জামিল নিজ অফিসে ফেরেননি। কিছুক্ষণ পর তিন বাহিনী প্রধানকে নিয়ে ডালিম রওনা দেন শাহবাগে, রেডিও স্টেশনে। ফারুক ও রশিদ রওনা হলেন আগামসি লেনে। গন্তব্য খন্দকার মোশতাকের বাড়ি। দুই জন এক জিপে। পেছনে একটি ট্যাংক ও এক ট্রাক সৈন্য।

রক্ষীবাহিনী সদর দফতরে চেষ্টা শুরু হয়েছে প্রতিরোধ গড়ে তোলার। তবে এই চেষ্টার গতি ঝিম মারা। সারোয়ার এবং আনোয়ার বলাবলি করলেন, প্রতিরোধ গড়ে তোলার মতো পর্যাপ্ত অস্ত্র ও গুলি আমাদের নেই। অস্ত্রশস্ত্র সব পিলখানায়, বিডিআর সদর দফতরে।

রক্ষীবাহিনী প্রধান আবুল হাসান বিডিআর প্রধান মেজর জেনারেল খলিলুরকে ফোন করেন, 'আমি ট্রাকসহ ডেপুটি লিডার হাফিজউদ্দিনকে আপনার ওখানে পাঠাচ্ছি। আপনার ওখানে মজুদ রাখা আমাদের অস্ত্রগুলো আনতে। দিয়ে দেবেন।' কিছু না বলে ফোন রেখে দিলেন খলিলুর রহমান। বড় ট্রাক নিয়ে হাফিজ রওনা দিলেন পিলখানায়। অস্ত্র দেয়া দূরের কথা, হাফিজকে বিডিআর সদর দফতরে প্রবেশ করতে দেয়া হলো না।

ভোররাতে দোয়া ইউনুস পড়ে ঘুমানোর পর আবারও স্বপ্ন দেখলেন মোশতাক।

স্বপ্নে এবার কী দেখেছেন, তা মনে পড়ছে না। মাঝেমধ্যে এ রকম হয়। বেডরুম থেকে বেরিয়ে চোখে পড়ল একটা ধূসর ডানার প্রজাপতি বারান্দায় উড়ে বেড়াচ্ছে। ঘড়িতে এখন সকাল সোয়া আটটা। দেয়ালে ঝুলে থাকা ঘড়ির পেন্ডুলামটা অবিরাম দুলছে।

ফজরের নামাজ পড়া হয়নি।

পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়লেও ফজরের নামাজ সময়মতো পড়তে পারেন না। রাত জাগা অনেকদিনের অভ্যাস। মসজিদ থেকে যখন 'আসসালাতো খায়রুম মিনন নওম' ভেসে আসে, তখন বিছানা ছাড়তে পারেন না। পরে ফজরের নামাজ পড়েন।

শোবার ঘর থেকে বেরিয়ে বারান্দায় এসে আকাশের দিকে তাকান।

সুন্দর আকাশ। আলো কম। সূর্য এখনো রুদ্ররূপ ধরেনি। খোলা বাতাসে শ্বাস নিলেন মোশতাক। মাত্র তিনবার শ্বাস নেয়া হয়েছে। এমন সময় সামনে এসে দাঁড়ায় মোফাজ্জল। তাকে উদ্‌ভ্রান্তের মতো লাগছে। তাড়া খাওয়া মানুষের মতো হাঁপাচ্ছে।

মোফাজ্জল বলে, চাচাজান মুজিবুর খুন হয়েছেন।

ইন্নালিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজিউন। দোয়া পাঠ করলেন মোশতাক।

চাচাজান রেডিও শুনবেন?

লাগবে না, কড়া করে চা নিয়ে আয়।

বারান্দায় পাতা ইজি চেয়ারে শোয়ার ভঙ্গিতে গা এগিয়ে দিলেন। চা নিয়ে আসে মোফাজ্জল। চায়ের পেয়ালায় একবার চুমুক দিলেন, এমন সময় মোফাজ্জল বললেন, চাচাজান আপনি কি এই বাড়িতে থাকবেন নাকি দাউদকান্দি যাবেন?

বাড়ি বদল করতে হবে কেন?

যদি কোনো বিপদ হয়, গেটে তালা মেরে রাখব?

কেন?

কেউ যেন ঢুকতে না পারে।

দরকার নেই। গেট খুলে রাখ। কেউ এলে সালাম দিয়ে ভেতরে নিয়ে আসবি।

এক মগ কড়া চা পান করে বাথরুমে যান মোশতাক।

কিছুক্ষণ পর বাথরুম থেকে ওজু করে বের হলেন। ড্রয়িংরুমের পাশে আর একটা ছোট ঘর। এটা তার নামাজের জায়গা। এই ঘরের দেয়াল কেটে একটা শেলফ লাগানো। এর ভেতরে কোরআন ও অনেক হাদিসের বই। প্রতিদিনের মতো আজও দেরিতে ফজরের নামাজ পড়লেন। নামাজ শেষে মোনাজাতের জন্য

হাত তুলেছেন, এমন সময় বিকট শব্দ কানে আসে। মোনাজাত না করে উঠে দাঁড়ান, জানালা দিয়ে উঁকি দিলেন।

এ কি? বাড়ির সামনে ট্যাংক কেন?

ভয়ে বুক শুকিয়ে যায়। একমনে দোয়া ইউনুস পাঠ করতে লাগলেন। ঠিকমতো পড়তে পারছেন না ভুল হয়ে যাচ্ছে। বুঝে উঠতে পারছেন না, এই ট্যাংক কে নিয়ে এল? দোয়া ইউনুস পড়েই যাচ্ছেন। নবী ইউনুসকে একবার মাছে খেয়ে ফেলেছিল। সে এক ভয়ংকর ব্যাপার। চরম বিপদে তিনি এই দোয়া পাঠ করে জীবন রক্ষা করেছিলেন।

এমন সময় বাড়ির ভেতর চলে আসেন মেজর রশিদ। তার পেছনে কালো পোশাক পরা দুজন সেনা। তাদের হাতে স্টেনগান। রশিদ ভেতরে এসেই বললেন, স্যার চলুন।

কোথায় যাব?

আপনাকে এখন প্রেসিডেন্ট হতে হবে। এটা গুরুদায়িত্ব। প্রথমে আমরা যাব রেডিও স্টেশনে। সেখানে জাতির উদ্দেশে কিছু বলবেন। দেশের মানুষ আপনার কথা শুনতে চায়, তারা সবাই ঝিম মেরে বসে আছে।

ট্যাংক এনেছ কেন?

আপনার মর্যাদা রক্ষার জন্য। সবাই বুঝুক ট্যাংক আপনার পেছনে।

জুমার নামাজের আগে আমি কোনো কাজ করি না।

নিতে এসেছি সাথে যাবেন, সময় কম।

আমাকে একটু সময় দাও।

আপনাকে দেয়ার মতো সময় আমার হাতে নেই।

লুঙ্গি আর স্যান্ডো গেঞ্জি পরেই শপথ নেব?

ঠোঁট চেপে হাসলেন রশিদ। বললেন, কপাল আর লুঙ্গির মধ্যে মিল কোথায়, স্যার জানেন?

মোশতাক বললেন, জানা নেই।

দুইটাই যে-কোনো সময় খুলে যেতে পারে।

দেশের মানুষ এখনো কিছু জানে না কী ঘটেছে বঙ্গবন্ধুর বাড়িতে।

এদিকে ভয়েস অব আমেরিকা থেকে ইথারে ভেসে আসে, বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিবুর রহমান ও তাঁর পরিবারের সদস্যরা খুন হয়েছেন।

বঙ্গবন্ধু খুন হওয়ার পরপরই মার্কিন দূতাবাস থেকে ভয়েস অব আমেরিকা অফিসে ফোন করে এই তথ্য জানায় ফিলিপ চেরি।

তিন বাহিনীপ্রধান আসার আগেই খন্দকার মোশতাক রেডিও ভবনে পৌঁছে যান। কিছুক্ষণ পর এখানে মোশতাককে পেয়ে সফিউল্লাহ্, এ কে খন্দকার আর এম এইচ খানের মুখে হাসি ফুটল।

মোশতাক বললেন, এই সংকট সময়ে আপনারা পাশে থাকলে তত্ত্বাবধায়ক বেসামরিক সরকার গঠন করতে পারি। অল্পসময়ের মধ্যে নির্বাচন দেয়া হবে। সফিউল্লাহ্ বললেন, স্যার উই আর ইউথ ইউ।

সকাল থেকেই রেডিওতে মেজর ডালিমের ভাষণ বাজিয়ে চলেছেন আপেল মাহমুদ। দিনের আলো ফোটার আগে রেডিও ভবনে এসে নিজ গানের সুর করেন খান আতাউর রহমান। ভাষণের মাঝেমধ্যে সকাল দশটার পর থেকে বাজানো হচ্ছে খান আতার গান, ওরা সূর্যসন্তান, সূর্যসেনা ওরা, কোনো বাধা মানবে না।

আপেল মাহমুদ রাতে রেডিও ভবনে ছিলেন। রাতের কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর অফিস বন্ধ থাকার কথা। ভেতর থেকে দরজা বন্ধ করে বসে ছিলেন আপেল মাহমুদ। সকালে ডালিম এলে একগাল হেসে মুখে স্বাগত জানান। এর কিছুক্ষণ পর আসেন চাষী নজরুল ইসলাম এবং তাহেরউদ্দির ঠাকুর। স্টুডিওতে ডালিমের ঘোষণা রেকর্ড করেন আপেল মাহমুদ। এরপর তা অবিরাম বাজতে থাকে।

অফিসে বসে আছেন আপেল মাহমুদ। পাশের দুই চেয়ারে মেজর রশিদ এবং তাহেরউদ্দির ঠাকুর। সামনে সোফাসেটের একটা সিঙ্গেল চেয়ার। কালো রঙের রেক্সিনে মোড়ানো। এতে বসে আছেন খন্দকার মোশতাক।

দুপুর পৌনে বারোটায় জাতির উদ্দেশে ভাষণ দিলেন মোশতাক।

ভাষণের কপি সঙ্গে করেই এসেছেন।

সেনাপ্রধান ভাষণের কপি দেখতে চাইলেন। এগিয়ে দিলেন। পড়ে মুগ্ধ সফিউল্লাহ্। বললেন, চমৎকার, ইটস রিয়েলি গুড।

আপনার কি মনে হয়, এই ভাষণ একদিনে লেখা হয়েছে? বললেন মোশতাক।

মাথা নিচু করলেন সফিউল্লাহ্।

ভাষণে মোশতাক বললেন, 'প্রিয় দেশবাসী ভাই ও বোনেরা, এক ঐতিহাসিক প্রয়োজনে বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষের সত্যিকার ও সঠিক আকাঙ্ক্ষাকে বাস্তবে রূপদানের পবিত্র দায়িত্ব সামগ্রিক ও সমষ্টিগতভাবে সম্পাদনের জন্য পরম করুণাময় আল্লাহতায়ালা ও বাংলাদেশের গণমানুষের দোয়ার ওপর ভরসা করে রাষ্ট্রপতি হিসেবে সরকারের দায়িত্ব আমার ওপর অর্পণ করা হয়েছে।'

ভাষণ শেষে ফারুক, রশিদ এবং ডালিমকে 'সূর্যসন্তান' এবং ভয়হীন হৃদয়ের অধিকারী 'বীর' বলে সম্বোধন করলেন।

ভাষণ শেষে রেডিও সেন্টার থেকে সফিউল্লাহ্ বেরিয়ে আসবেন। এমন সময় তাহেরউদ্দিন ঠাকুর মোশতাককে বললেন, স্যার ওনাকে যেতে দেবেন না, কিছু কাজ বাকি আছে। রশিদ এতক্ষণ পাশে ছিলেন। বললেন, সবাই আমার সঙ্গে আসুন। রশিদ এগিয়ে চললেন। সবাই তার পেছনে। তারা একটা স্টুডিওতে ঢুকলেন।

আপেল মাহমুদ একটা কাগজ নিয়ে এলেন। এ-ফোর সাইজ কাগজে স্পষ্ট অক্ষরে লেখা। এই কাগজটা রশিদ হাতে নিয়ে সফিউল্লাহ্কে দিয়ে বললেন, এটা এখন পড়বেন। রেকর্ডিং যন্ত্র অন করলেন আপেল মাহমুদ।

সফিউল্লাহ্ পড়লেন, 'আমি সেনাপ্রধান কাজী মোহাম্মদ সফিউল্লাহ্ বলছি, সেনাবাহিনী এবং তিন বাহিনীর পক্ষ থেকে খন্দকার মোশতাক আহমদকে পূর্ণ সমর্থন দেয়া হলো। আপনারা সবাই শান্ত থাকুন। কেউ নিজের হাতে আইন তুলে নেবেন না।'

সবার দুশ্চিন্তা ছিল, দেশের লোক খেপে যেতে পারে। তখন এই ঘোষণা রেডিওতে বাজানো হবে। তা হয়নি। দেশের লোক ঝিম মেরে থাকল। বেশ কয়েকজন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি রেডিও সেন্টারে এসেছেন। তাদের একজন কর্নেল তাহের। সকালে তাকে ফোন করেছিলেন রশিদ।

রাস্তা ফাঁকা। নারায়ণগঞ্জের বাসা থেকে আসতে বেশি সময় লাগল না। রেডিও সেন্টারে এসে প্রথমে দেখা হয় ডালিমের সঙ্গে। তাকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন তাহের। সাহসের প্রশংসা করলেন। ভেতরে আপেল মাহমুদের চেম্বারে দেখা হয়, খন্দকার মোশতাক, তাহেরউদ্দির ঠাকুর এবং বিডিআর মহাপরিচালক মেজর জেনারেল খলিলুর রহমানের সঙ্গে। পাশের রুমে বসে আছেন তিন বাহিনীপ্রধান। হাসি মুখে 'কংগ্রাচুলেশন' বলে মোশতাকের সঙ্গে হাত মেলান তাহের।

মোশতাক বললেন, কর্নেল সাহেব দেশের কাজে আপনার পরামর্শ দরকার।

তাহের বললেন, এই মুহূর্তে আমার পাঁচটি প্রস্তাব আছে।

সেগুলো কী?

অবিলম্বে সংবিধান বাতিল করতে হবে।

সারা দেশে সামরিক আইন জারি এবং প্রয়োগ করতে হবে।

সকল রাজনৈতিক বন্দিকে মুক্তি দিতে হবে।

বাকশালকে বাদ দিয়ে একটি সর্বদলীয় জাতীয় সরকার গঠন করতে হবে।

অবিলম্বে একটি সাধারণ নির্বাচনের ব্যবস্থা করতে হবে।

কর্নেল তাহেরের প্রস্তাব শুনে মোশতাক বললেন, আপনার প্রস্তাবগুলো বড়ই সুন্দর, দেশের কাজে লাগবে। মোশতাকের প্রশংসা শুনে হাসিমুখে মাথা বাঁকালেন

তাহের। এরপর আর কোনো কথা হলো না। বেতার ভবন থেকে বেরিয়ে মোশতাক গেলেন জাতীয় মসজিদ বায়তুল মোকাররমের দিকে। গাড়িবহরের সামনে একটা ট্যাংক। এই ট্যাংকের গায়ে বড় অক্ষরে '২৭' লেখা। পেছনে সাঁজোয়া যান।

মসজিদের দক্ষিণ গেটের কাছে ব্রেক কষে গাড়িবহর।

দুই চোখ বন্ধ। গভীর ভাবনায় মোশতাক।

একজন সেনা এসে গাড়ির দরজা খুলে দিল। দেড় মিনিট মসজিদের দিকে তাকিয়ে থেকে তারপর নামলেন। পেঙ্গুইন পাখির মতো হেঁটে চলে গেলেন মসজিদের ভেতরে।

মসজিদের সামনে রাস্তার ওপারে একটা চায়ের স্টল। এখানে কয়েকজনের জটলা। কারো হাতে চায়ের পেয়ালা, কারো হাতে কে-টু সিগারেট।

সবার চোখ ফ্যাকাসে। মুখে হাসি নেই। কোনো কৌতূহলও নেই। খন্দকার মোশতাকের হেঁটে যাওয়া কেউ দেখল না। যে যার মতো বসে থাকল। একজন বলল, যুদ্ধের দিন দেখলাম, শ্মশান-গোরস্তান দেখলাম, এখন দেখছি গিরগিটির দিন। এ কথা বলতে বলতে ওয়াক-থু বলে চায়ের দোকানদারকে বলল, চিনি থেকে পিঁপড়ে বাছতে পারিস না।

দুই রাকাত নফল নামাজ পড়ে মসজিদ থেকে বের হন মোশতাক।

মুখে হাসি ঝুলিয়ে রাখার চেষ্টা করছেন। আজ আনন্দের দিন। স্বপ্ন পূরণের দিন। রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব নিতে এখন বঙ্গভবনে প্রবেশ করতে যাচ্ছেন। এই ভবনে বাস করার সাধ অনেকদিনের।

মোশতাকের মনের ইচ্ছা পূরণ হলেও তার এক ভক্ত চড় খেলেন দাউদকান্দি সেতুর কাছে। মধ্যবয়স্ক একজন চেঁচিয়ে উঠল, মোশতাক ভাই জিন্দাবাদ। সেতুর পাশে চায়ের স্টলে কয়েকজন বসে ছিলেন। তাদের একজন দৌড়ে এসে ওই লোকটার গালে কষে চড় মারলেন।

চড় খাওয়া লোকটা রাস্তায় পড়ে যায়।

বঙ্গবন্ধু হত্যার খবরে দিল্লিতে স্বাধীনতা দিবসের অনুষ্ঠান ফ্যাকাসে হয়ে গেল।

কুচকাওয়াজের সালাম শেষে ভাষণ দেবেন, এমন সময় প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর কানের কাছে এসে একজন ঊর্ধ্বতন সেনা কর্মকর্তা জানান, ঢাকায় শেখ মুজিব পরিবারসহ খুন হয়েছেন।

হতবাক ইন্দিরা। বাকরুদ্ধ 'র'-প্রধান রমেশ্বর নাথ কাউ। বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে দুজনের ব্যক্তিগত সম্পর্ক ছিল।

তাঁরা বারবার সতর্ক করেছেন, 'যে-কোনো সময় অঘটন ঘটতে পারে, সতর্ক থাকুন।' প্রতিবারই হেসে উড়িয়ে দিয়েছেন বঙ্গবন্ধু। আজ সব কথা মনে পড়ছে। দিল্লির অফিসে অস্থির পায়চারি করছেন কাউ। টেবিলে এক পেয়ালা গরম চা ঠান্ডা হয়ে গেল।

বঙ্গবন্ধুর বাড়ির নিরাপত্তা দলের প্রধান বাশার ঠান্ডা মাথার মানুষ।

আজিমপুর চায়না বিল্ডিংয়ে মামার বাসায় সকালের নাশতা সেরে ফেলেছেন। ডিম, পরোটা আর দুধে রান্না করা সুজি। নাশতার পর চা নিয়ে বসে রেডিও অন করে মেজর ডালিমের ভাষণ কানে আসে। চা পান করা হলো না। একটার পর একটা সিগারেট টেনে ছাই করছেন।

সকাল দশটার পরে বাশারের সঙ্গে দেখা করতে আসে সুবেদার মেজর ওয়াহাব জোয়ার্দার। চায়না বিল্ডিংয়ের সামনে একটা ঢোপ দোকানের সামনে জিপ থেকে নামে ওয়াহাব।

পঁচিশ বছরের মোটাসোটা এক যুবকের দোকান। ওয়াহাব সিগারেট চায়। দোকানদার শুনতে পায় না। বলে, কী যেন কইলেন? কী লাগব? সঙ্গে সঙ্গে ওই যুবককে বাঁ হাত দিয়ে চড় মারে। দোকানি আর কোনো কথা বলে না। চোখ দিয়ে পানি গড়ায়।

জাতির জনককে পরিবারসহ খুন করার পুরস্কার দিয়েছে মেজর ফারুক। তখন থেকে যা খুশি তা-ই করতে ইচ্ছা করছে। সুবেদার মেজর থেকে ওয়াহাব জোয়ার্দার এক লাফে অনারারি লেফটেন্যান্ট। বারবার ফারুকের শুকরিয়া আদায় করছে আর ঘাড়ের দিকে তাকাচ্ছে। ইউনিফর্মের শোল্ডারে ঝিলিক মারছে স্টার।

ড্রয়িংরুমে বসে আছে ক্যাপ্টেন বাশার।

হাতে সিগারেট। ট্রিপল ফাইভ। দামি সিগারেটের প্রতি বাশারের বেশ দুর্বলতা।

ওয়াহাব জোয়ার্দার স্যালুট দিয়ে দাঁড়ান। এখনো বাশারের চোখ যায়নি ওয়াহাবের ঘাড়ের দিকে। বাশার বললেন, এখন একবার ৩২ নম্বরে যেতে চাই। কোনো উত্তর না দিয়ে বারবার ঘাড়ের দিকে তাকান ওয়াহাব। বাশার এবার বুঝতে পারেন। জানতে চান, এসব কী করে হলো?

ওয়াহাব বলেন, ফারুক সাহেব পুরস্কার দিয়েছেন।

বাশার আবার বললেন, ৩২ নম্বরে যাওয়ার ব্যবস্থা করুন। ওয়াহাব বলে, 'স্রোতের উল্টোদিকে যাওয়া ঠিক হবে না। একটু পরে যখন গাড়ি পাঠাব, তখন যাবেন।'

একথা বলে ওয়াহাব আর দাঁড়ায় না। ঘর থেকে বেরিয়ে যায়। ঘণ্টাখানেক পর গাড়ি আসে। বাশার রওনা দেন ৩২ নম্বরে।

গেটের সামনে দেখা হয় হুদা, ওয়াহাব ও আরো কয়েকজন জোয়ানের সঙ্গে। হুদার কাঁধে আটকানো শাপলা চোখে পড়ে। বাশার বুঝতে পারে ওয়াহাবের মতো হুদাও কাজের পুরস্কার পেয়েছে। হুদা বলে, সরি বাশার, আই কুড-নট ইনফর্ম ইউ আরলিয়ার। ফর অভিয়াস রিজন ইট ওয়াজ নট পসিবল।'

বাড়ির ভেতর প্রবেশ করেন বাশার।

পা ভারি হয়ে আসছে। ধাপ ওঠে না। এক পা, এক পা করে এগোতে থাকেন। সারা বাড়ি একটার পর একটা লাশ। দেখে বিচলিত বাশার। ঘামে ভিজে যাচ্ছে পোশাক। সিঁড়ির কাছে বঙ্গবন্ধুর লাশ দেখে পেছনে দাঁড়ানো ওয়াহাবকে বলেন, এসব কী করেছেন?

ওয়াহাব বলেন, যা হওয়ার তা-ই হয়েছে, যা করার তা-ই করেছি।

বেলা এগারোটায় ব্রিগেডিয়ার খালেদের ফোন পেলেন হামিদ।

খালেদ বললেন, '৪৬ ব্রিগেড হেডকোয়ার্টার্সে চলে আসুন, সময় কম।' হামিদ গেলেন সেখানে।

খালেদ বললেন, হাতে সময় কম। স্টেশন সিকিউরিটির প্ল্যান করে আমার সঙ্গে বসুন। খাতা কলম নিয়ে বসলেন হামিদ। এরই মধ্যে সেনাপ্রধানের ফোন, 'শহরের পরিস্থিতি কী? ৩২ নম্বর ঘুরে এসে আমাকে সব জানান।'

ঘড়িতে এখন বেলা তিনটা। জিপ নিয়ে তড়িঘড়ি বেরিয়ে পড়লেন হামিদ।

ধানমন্ডি ৩২ নম্বরে এসে চোখে পড়ল আর্টিলারি ও আর্মড কোর সেনাদের জটলা। বাড়ির গেটে দেখা হলো আজিজ পাশা ও হুদার সঙ্গে। হুদা বললেন, ওয়েলকাম মিস্টার কর্নেল। হামিদ বললেন, বাড়ির ভেতর যেতে চাই। আজিজ পাশা হুদাকে বললেন, আপনি সঙ্গে করে নিয়ে যান।

রিসেপশন রুমে পড়ে আছে শেখ কামালের লাশ। পাশে একজন পুলিশ অফিসারের লাশ। বাথরুমের দরজার সামনে পড়ে আছেন বঙ্গবন্ধুর ছোট ভাই শেখ নাসের। দোতলায় ওঠার সিঁড়িতে চিত হয়ে পড়ে আছেন বঙ্গবন্ধু। আশপাশে দলা দলা জমাট রক্ত। শুকিয়ে যাওয়া রক্তের ওপর বুটের দাগ। মাছি ভনভন করছে।

দোতলার বাঁদিকের রুমের দরজায় উপুড় হয়ে পড়ে আছেন বেগম ফজিলাতুন্নেছা। এই রুমের ভেতরে শেখ জামাল, রোজী জামাল, সুলতানা কামাল। তাদের থেকে একটু দূরে পড়ে আছে বাড়ির ছোট ছেলে রাসেল।

সারা বাড়ি তছনছ।

দেয়ালে গুলির ক্ষত আর রক্তের দাগ।

দোতলা থেকে নামার সময় হুদাকে বললেন, আবারও লুটপাট হতে পারে। যেন না হয়, সেদিকে খেয়াল রাখবেন। নিচে নেমে এসে বাড়ির আঙিনায় একটা লাল রঙের প্রিন্স কার চোখে পড়ল। ভেতরে কর্নেল জামিলের লাশ। সব দেখে অফিসে ফিরে এসে টেলিফোন করলেন সেনাপ্রধানকে। যা দেখে এসেছেন সবই বললেন।

কিছু না বলে ফোন রেখে দিলেন সফিউল্লাহ্।

ঢাকার রাস্তায় লোকজন নেই। কয়েকটা সেনা জিপ, ট্রাক দৌড়াদৌড়ি করছে। আর একটা ট্যাংক গড়াচ্ছে।

এর ওপরে ফারুকের ট্যাংক বাহিনীর কালো পোশাক পরা সেনারা লাফালাফি করছে। তাদের সঙ্গে আনন্দ প্রকাশ করে জাসদ গণবাহিনীর সদস্যরা। তারা এখন প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সংসদ অফিসে। ফাঁকা মহানগরে গণবাহিনীর জরুরি সভা। আনোয়ারের খোশ মেজাজ। কালো চেহারায় হাসির ঝিলিক।

বৈঠকের শুরুতে আনোয়ার বললেন, ভাইজান সকালে (কর্নেল তাহের) রেডিওতে গিয়েছিলেন। মেজর ডালিমকে বকাঝকা করেছেন, '...র মেজর হয়েছ, এখন পর্যন্ত একটা মার্শাল ল প্রক্লেমেশন করতে পারলে না? জানো কাল ভার্সিটিতে কারা বোমা ফাটিয়েছিল? দে আর মাই বয়েজ।'

জুমার নামাজের আগে ৩২ নম্বরে এসেছে আর্মি ইন্টেলিজেন্স, ফিল্ড ইন্টেলিজেন্স এবং ডিজিএফআই-এর কয়েকজন। পরপর তিন দল এসে বাড়িতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা লাশের ছবি তুলে নিয়ে যায়। বাড়ির পাহারায় থাকা কুদ্দুস এদের সবাইকে চিনতে পারে না।

ছবি তোলার পর ধানমন্ডি থেকে একটা জিপ দৌড়ে যায় পল্টনের দিকে। দৈনিক বাংলার সামনে এসে ব্রেক কষে। তিনজন সেনা কর্মকর্তার সঙ্গে জিপ থেকে নামলেন দৈনিক বাংলার প্রধান আলোকচিত্রী গোলাম মওলা। হাতে ক্যামেরার ছোট ব্যাগ। চোখে পুরু লেন্সের চশমা। বিষণ্ন মুখ।

ছোট আকারের লিফটে চেপে হুড়মুড় করে ওপরে উঠে এলেন। প্রবেশ করলেন বার্তাকক্ষে। আরো এক ধাপ ওপরে ডার্করুম। ওই পর্যন্ত লিফট ওঠে না। বার্তাকক্ষের বড় টেবিলটার সামনের কাঠের হাতলওয়ালা চেয়ারে বসে পড়লেন। মাথার দুপাশ ব্যথায় টনটন করছে।

ঘণ্টা দুই আগে সেনা কর্মকর্তারা গোলাম মওলাকে ৩২ নম্বরে নিয়ে যায়। সিঁড়ির কাছে গিয়ে নিজেকে সামাল দিতে পারছিলেন না মওলা। ১২০ মিমি

রলিকর্ড ক্যামেরায় ফ্ল্যাশগানের কর্ড লাগাতে হলো বেশ কষ্টে। সিঁড়িতে পা রাখতে পারছেন না। বাড়ি যেন এখন রক্তগঙ্গা। একজন সেনা কর্মকর্তা বঙ্গবন্ধুর লাশ টপকে ওপরে উঠে যায়। ওপর থেকে সেনা কর্মকর্তা চিৎকার করে বলেন, কী হলো উঠে আসুন?

সিঁড়ির রেলিং ধরে খুঁজতে থাকলেন কোন জায়গায় রক্ত নেই।

রক্তের ওপর পা রাখতে চান না মওলা। কোনোমতে এঁকেবেঁকে ওপরে উঠলেন। দোতলা ঘরের সামনে আলপনা চোখে পড়ল। কয়েক দিন আগে বাড়ির বড় দুই ছেলে কামাল, জামালের বিয়ে হয়েছে। শোবার ঘরের মেঝে লাল। পড়ে আছে অনেক লাশ। সারা বাড়িতে ভুতুড়ে নীরবতা। ছিন্নভিন্ন মুখগুলো এখন মনে করতে পারছেন না মওলা। মাথার ব্যথাটা বাড়ছে। চোখ বন্ধ করলেন।

কিছুক্ষণ পর বাবু আনসারীর ডাকে চোখ খুললেন মওলা।

আনসারী তখন দৈনিক বাংলার সিনিয়র ফটোসাংবাদিক। তাকে দেখে কিছুটা স্বাভাবিক হলেন মওলা।

বললেন, ক্যামেরার ভেতর থেকে ফিল্মগুলো বের করে ওনাদের দাও। দুজন সেনা কর্মকর্তা টেবিলের অপর প্রান্তে বসে আছেন। টেবিলের ওপর রাখা গুলি ভর্তি বিদেশি পিস্তল। একজন অফিসার বললেন, তাড়াতাড়ি করতে হবে, আমাদের হাতে সময় কম।

গোলাম মওলার হাত থেকে ফিল্মগুলো নিয়ে সিঁড়ি বেয়ে তিনতলার ডার্করুমের দিকে গেলেন আনসারী। পেছন পেছন গেলেন দুই সেনা কর্মকর্তা। ট্রের ওপর প্রয়োজন মতো কেমিক্যাল ঢাললেন, পানির ট্রেতে কাচের বোতল থেকে পানি ঢাললেন। কিছুটা হাইপো ঢেলে নিলেন ফিক্সচার ট্রের ওপর। ফিল্মগুলো খুলে নেয়ার জন্য রাখলেন এনলার্জারের মাস্কিং বোর্ডের ওপর। এবার দরজা বন্ধ করার পালা। একজন সেনা কর্মকর্তা চেঁচিয়ে বললেন, দরজা বন্ধ করছেন কেন?

দরজা বন্ধ না করলে ফিল্ম ডেভলপ করব কী করে? বললেন আনসারী।

দরজা বন্ধ না করে কি ডেভলপ করা যায়? শুধু দরজাই না এখন লাইটও অফ করতে হবে। দুজন সেনা কর্মকর্তা আর কোনো কথা বললেন না। তারাও ডার্করুমের ভেতরে ঢুকে পড়লেন। দরজা ও লাইট বন্ধ করে দিলেন আনসারী। অন্ধকারের ভেতর আনসারী টের পেলেন পেছন থেকে পিস্তলের নল তার পিঠের সঙ্গে লাগানো। ঠান্ডা লাগছে। ভয়ে হাত কাঁপতে থাকে। একজন বললেন, অন্ধকারে কী করছেন? কিছুই তো বুঝতে পারছি না, আর কতক্ষণ লাগবে?

আনসারী বললেন, কয়েকটা ফিল্ম। সময় তো লাগবেই। কিছুক্ষণ পর বললেন, ফিল্ম ডেভলপ হয়ে গেছে এবার ফিক্স করছি হাইপোতে। সেনা কর্মকর্তা বললেন, তাহলে লাইট জ্বালিয়ে দেই। না, না তা করবেন না। এখনো ফিল্মগুলো ফিক্স হয়নি, আরো মিনিট পাঁচেক লাগবে। ফিল্ম ফিক্সের পর বাবু আনসারী লাইট জ্বালিয়ে বললেন, এবার ফিল্ম শুকিয়ে ছবি করার পালা।

ছবি করতে শুরু করলেন বাবু আনসারী। এবার আর ডার্করুম অন্ধকার নয়। লালবাতি জ্বালিয়ে রেখেছেন। সেনা কর্মকর্তা বললেন, এখন কি লালবাতি জ্বলবে। আনসারী বললেন, হ্যাঁ এখন থেকে লালবাতিই জ্বলবে।

ছবি করার সময় যেগুলো নষ্ট হলো সেগুলো বাস্কেটে ফেলে দিলেন। ইচ্ছা করে দু-একটা ভালো ছবিও ফেলে দিলেন আনসারী। ছবি নিয়ে বেরিয়ে যাওয়ার সময় সেনা কর্মকর্তারা বাস্কেটে ফেলে দেয়া ছবিগুলোও নিয়ে যান। আনসারী বললেন, এসব নষ্ট ছবি কী করবেন? সেনা কর্মকর্তা কোনো উত্তর না দিয়ে লাল চোখে আনসারীর দিকে তাকালেন।

বার্তাকক্ষের ভেতরে গোলাম মওলা বসে আছেন। আনসারীকে দেখে বললেন, ওরা কি ফেলে দেয়া নষ্ট ছবিগুলোও নিয়ে গেছেন?

আনসারী মাথা নেড়ে বোঝালেন, হ্যাঁ।

সেনা কর্মকর্তারা এই ফিল্ম নিয়ে চললেন ধানমন্ডি ৩২ নম্বর বাড়িতে।

কিছুক্ষণ পর তা নিতে আসেন সাখাওয়াত হোসেন।

ক্যান্টনমেন্টের অফিসে বসে মেজর গাফফারের সঙ্গে কথা বলছেন সাখাওয়াত। এমন সময় খবর এলো ব্রিগেড কমান্ডার শাফায়াত জামিল ডেকে পাঠিয়েছেন। দুজন গেলেন ব্রিগেড অফিসে। চেয়ারে বসে আছেন শাফায়াত। রোজা রাখার পরদিন শেষে যেমন চেহারা হয় তাকে এখন সে রকম লাগছে।

চেয়ারে বসলেন সাখাওয়াত এবং গাফফার। কথা শুরু করবেন, এমন সময় সাখাওয়াতের অফিসের রানার এসে জানায়, স্যার ধানমন্ডি থেকে জরুরি ফোন এসেছে।

সাখাওয়াত বুঝতে পারেন না, কে এবং কী কারণে ফোন করেছে। ব্রিগেড অফিস থেকে বের হয়ে নিজ অফিসে আসেন। ফোনের রিসিভার নামিয়ে রাখা ছিল। তুলে বললেন, হ্যালো।

ফোনের ওপর প্রান্ত থেকে বললেন, 'ধানমন্ডি ৩২ নম্বর বাড়ি থেকে বজলুল হুদা বলছি। এখনই এখানে আসতে হবে। আমাদের হাতে কিছু ফিল্ম আছে। এগুলো সেনাসদরে বা ব্রিগেড হেডকোয়ার্টারে রাখতে হবে।'

আর কোনো কথা না বলে ফোন রেখে দিলেন হুদা।

কলকাতায় চিত্তরঞ্জন সুতারের বাড়িতে ঘুমাচ্ছেন সিরাজুল আলম খান। দরজায় ধাক্কা দিলেন সুতারের স্ত্রী মঞ্জুশ্রী।

হুড়মুড় করে ওঠেন সিরাজুল। মঞ্জুশ্রী জানান, মুজিব ভাইকে পরিবারসহ খুন করেছে আর্মির লোকজন। খবর শুনে হাউমাউ করে কেঁদে উঠলেন। মঞ্জুশ্রীর ফরসা গাল বেয়ে চোখের পানি গড়িয়ে পড়ল মেঝের ওপর। সিরাজুলের কান্নাও থামছে না। বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে গত পনেরো বছরের গুরু-শিষ্যের সম্পর্ক আর থাকল না।

এ কী হলো? বলছেন আর কাঁদছেন।

সকাল থেকে বঙ্গভবন ও গণভবনে উল্লাস চলছে।

কোলাকুলি আর অভিনন্দন জানানোর পালা শেষে চলছে মিষ্টি খাওয়া। কেউ মিষ্টি বিতরণ করছেন না। একজন অন্যজনকে মিষ্টি খাইয়ে দিয়েছেন। এরপর বঙ্গভবন নতুন সাজে সেজে উঠল। অনেকটা বিয়েবাড়ির মতো। যে এই বাড়িটা চেনে না, সে বিয়েবাড়ি ভাববে।

জুমার নামাজের আগে গাড়িবহর নিয়ে বঙ্গভবনে এলেন মোশতাক।

পারিচ্ছন্ন পোশাক। মাথায় সাদা টুপি। মুখে হাসি ঝুলিয়ে রেখেছেন। মোশতাক বিশ্বাস করেন, রাজনীতি আসলে এক চোখ-ধাঁধানো মঞ্চনাটক। এই নাটক আজ সত্য হয়ে উঠেছে। বঙ্গভবনে জুমার নামাজ আদায় করলেন। কিছুক্ষণের মধ্যে তিন বাহিনীর প্রধানরা চলে আসেন। সেনাপ্রধানের সাথে এসেছেন উপপ্রধান জিয়াউর রহমান। তাদের দুজনের চোখে দামি সানগ্লাস। সফিউল্লাহ্‌র চোখে 'পলিশ' ব্র্যান্ডের আর জিয়াউরের চোখে 'রে বান'।

বঙ্গভবনের হলঘরের নাম দরবার হল। এখানে সবাই বসলেন। তিন বাহিনীর প্রধানরা প্রথা অনুয়ায়ী পাশাপাশি বসলেন। হলঘরের ভেতরেও তারা সানগ্লাস পরে থাকলেন। সবার চোখ গেল এই দুজনের দিকে।

শপথ পাঠ করার পর নতুন মন্ত্রিসভার নাম ঘোষণা করলেন। মন্ত্রীরা সবাই আওয়ামী লীগের এবং বঙ্গবন্ধুর ঘনিষ্ঠ বলে পরিচিত। শপথবাক্য পাঠ শেষ। এদিকে রক্তের ভেতর পড়ে আছে বঙ্গবন্ধুর লাশ। রক্তের গন্ধে মাছিরা ভিড় করেছে।

বিকেলে এক বার্তায় মোশতাক সরকারকে অভিনন্দন ও সমর্থন জানালেন, মওলানা ভাসানী। মওলানাকে বঙ্গবন্ধু হুজুর বলে ডাকতেন। আব্বাজানের মতো শ্রদ্ধা করতেন।

সকালে সংক্ষিপ্ত বেতার ভাষণের পর সন্ধ্যায় দেশবাসীর উদ্দেশে খন্দকার মোশতাক বললেন, 'প্রিয় দেশবাসী ভাই ও বোনেরা। এক ঐতিহাসিক প্রয়োজনে

বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষের সত্যিকার ও সঠিক আকাঙ্ক্ষাকে বাস্তবে রূপদানের পূর্ণ দায়িত্ব সামগ্রিক ও সমষ্টিগতভাবে সম্পাদনের জন্য পরম করুণাময় আল্লাহতায়ালা ও বাংলাদেশের গণমানুষের দোয়ার ওপর ভরসা রেখে সরকারের পূর্ণ দায়িত্ব আমার ওপর অর্পিত হয়েছে।

'বাংলাদেশের মানুষের ভাগ্য পরিবর্তনের বজ্রকঠিন দায়িত্ব সম্পাদনের পথ সুগম করার জন্য বাংলাদেশ সেনাবাহিনী সত্যিকারের বীরের মতো অকুতোভয় চিত্তে এগিয়ে এসেছেন। বাংলাদেশ বিমানবাহিনী, নৌবাহিনী, বাংলাদেশ রাইফেলস, রক্ষীবাহিনী এবং পুলিশ বাহিনী সরকারের প্রতি অকুণ্ঠ আনুগত্য ও আস্থা প্রকাশ করেছেন। এরা সবাই একযোগে কাজ করে যাচ্ছেন।'

বাংলাদেশ সময় এখন রাত দশটা। ওয়াশিংটনের স্থানীয় সময় সকাল আটটা।

পররাষ্ট্র দফতরে স্টাফ সভায় বসলেন হেনরি কিসিঞ্জার।

বৈঠকের শুরুতে কিসিঞ্জার বললেন, মুজিব জীবিত না মৃত? উত্তর দিলেন আথারটন, মুজিব মৃত। ঘনিষ্ঠ সহচর, পরিবারের সদস্য, ভাই, ভাগনেসহ নিহত হয়েছেন।

কিসিঞ্জারের মুখে হাসি ফুটল। তিনি কি আগে থেকেই সব জানতেন? যদি না-ই জানবেন, তাহলে বৈঠকের শুরুতেই এই কথা বলবেন কেন?

হাসি লুকিয়ে ফেললেন বুদ্ধিমান কিসিঞ্জার।

এরপর বেশ কিছু কথা হয় আথারটনের সঙ্গে। কিসিঞ্জার জানতে চাইলেন, তাকে কি গত বছর আমরা এ বিষয়ে কিছু বলিনি? আথারটন জবাব দেন, গত মার্চে এ বিষয়ে আমরা অনেক ইঙ্গিত পাচ্ছিলাম।

মুজিবকে কি আমরা কিছু জানাইনি?

জানিয়েছি।

কারা জড়িত সেসব নাম কি বলেছিলাম আমরা?

সেটা পরীক্ষা করে দেখতে হবে।

এসব কথার সূত্র ধরে উত্তর দিলেন হিল্যান্ড। বললেন, আমরা এ বিষয়ে ঠিক যথাযথ ধারণা দিইনি। আথারটন বললেন, তিনি বিশ্বাস করেননি। তিনি বলেছেন, কেউ তাকে এ ধরনের কিছু করবে না। অভ্যুত্থান সফল হওয়ার কিছুক্ষণের মধ্যে আমাদের কাছে খবর চলে আসে। যারা এই কাজ করেছে তাদের মধ্যে আছে সামরিক অফিসার, মধ্যপর্যায় ও সিনিয়র অফিসার। যারা আগের

শাসকের তুলনায় কম ভারতপন্থি। তাদের সোভিয়েতবিরোধী এবং আমেরিকাপন্থি হিসেবে গণ্য করা যায়।

এবার কথা বললেন আথারটন, দেশের নাম বদল করে ইসলামি প্রজাতন্ত্র রেখেছে।

তারা যুক্তরাষ্ট্রপন্থি হবে এটা অপরিহার্য নয়। তবে তারা চীনাপন্থি এবং ভারতবিরোধী হবে, তা আমি শক্তভাবেই বিশ্বাস করি। আমি সব সময়ই জানতাম, বাংলাদেশ স্বাধীন করার জন্য ইন্ডিয়া একদিন অনুতাপ করবে। বললেন কিসিঞ্জার। একটু থেমে আবার বললেন, আমাদের উচিত হবে বাংলাদেশের নতুন শাসকের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা করা।

কেন? তারা আমাদের বন্ধু বলে?

কিসিঞ্জারের এই কথার পর চুপ হয়ে গেলেন আথারটন। কথা আর এগুলো না। এসব কথার ভেতর দিয়ে আমেরিকায় একটি দিন শুরু হলো। এখন বাংলাদেশে রাত।

মধ্যরাতের পর ধানমন্ডি আসেন বজলুল হুদা।

একটু আগে রাতের খাবার খেয়ে সিগারেটে আগুন দিয়েছে হাবিলদার কুদ্দুস। এমন সময় হুদা ডাক দেন। জ্বলন্ত সিগারেট পায়ে পিষে বাড়ির উত্তর দেয়ালের কাছ থেকে দৌড়ে দক্ষিণে চলে আসে। স্যালুট দিয়ে দাঁড়ায়।

আমার সঙ্গে এসো, মোহাম্মদপুর যাব, কফিন লাগবে।

গেটের সামনে দাঁড়িয়ে আছে নায়েক হাবিব। তার কাছে গিয়ে কুদ্দুস বলে, মোহাম্মদপুর যাচ্ছি, তুমি এখন পুরো বাড়ির ইনচার্জ। আর কোনো কথা না বলে বাড়ির বাইরে দাঁড়ানো একটা ছাদ খোলা জিপের কাছে চলে আসে। হুদা উঠে বসে ড্রাইভিং সিটে। পাশের সিটে কুদ্দুস।

কিছুক্ষণের মধ্যে পৌঁছে যায় মোহাম্মদপুর টাউন হল বাজারের কাছে। 'চির বিদায়' স্টোরের সামনে। ভেতর থেকে দরজা বন্ধ। মিটিমিটি আলো জ্বলছে। দরজার ফাঁক দিয়ে সিগারেটের ধোঁয়া বেরিয়ে এসে বাতাসে মিলিয়ে যাচ্ছে। দরজায় লাথি মারেন হুদা। বলেন, দরজা খোল। ভেতর থেকে আওয়াজ এল, কে?

তোর বাপ, দরজা খোল।

ভেতর থেকে একজন বের হতেই তাকে লাথি মারেন হুদা। লোকটা বুঝতে পারে, প্রতিবাদ করে লাভ নেই। লাথি খেয়েও বিনয়ের সুরে বললেন, ভাইজান বলুন। কিছুক্ষণের মধ্যে ১০টা কফিন ৩২ নম্বরে দিয়ে আসবি। দোকানি জানায়, আমার কাছে রেডি কফিন চারটা আছে। এই রাতে কী করে কফিন বানাব?

এবার কষে চড় মারেন হুদা। 'দুই ঘণ্টার মধ্যে কফিনগুলো যেন যায়, ফের যদি আমাকে আসতে হয় তাহলে তোকে কফিনে ভরে নিয়ে যাব।' হুদার এ কথা শোনার পর দোকানির আর কোনো কথা বলার সাহস হয়নি। লাথি আর চড় খাওয়া দোকানি বলে, পৌঁছে দেব। ধানমন্ডি ৩২ নম্বরে ফিরে আসে হুদা।

সকাল থেকে বাড়ির গ্যারেজে রাখা শেখ কামালের নতুন টয়োটা গাড়ির দিকে হুদার চোখ যাচ্ছে বারবার। গাড়ির ভেতরে চাবি লাগানো। কামাল গাড়ির চাবি খুলে রাখতেন না। গাড়িটা হুদার চোখে ভেসে বেড়াচ্ছে। ভাবলেন, সুন্দর গাড়িটা এখানে ফেলে রেখে লাভ নেই। তাই গাড়িটা নিজ বাসায় রেখে আসেন হুদা। হুদার মন এখন অনেক ভালো। নতুন গাড়ির ইচ্ছাপূরণ হলো।

ক্যান্টনমেন্টের বাসায় ঘুম আসছে না হামিদের। বারবার মনে পড়ছে ৩২ নম্বর বাড়িতে দেখা লাশগুলো।

রাত তিনটায় ফোন বেজে ওঠে।

স্ত্রী বললেন, ফোন ধরার দরকার নেই। হামিদ বুঝতে পারছেন না, ফোন ধরবেন কি না?

অবশেষে ফোন ধরলেন, হ্যালো।

বঙ্গভবন থেকে ফোন করেছেন মেজর এম এ মতিন। বললেন, 'আমি বঙ্গভবন থেকে বলছি স্যার। নতুন রাষ্ট্রপতি সেনাবাহিনী ও অন্যান্য বাহিনীর প্রধানসহ অন্যান্য উচ্চপদস্থ কর্মকর্তারা সবাই এখানে আছেন। আপনাকে যে মেসেজ দেয়ার জন্য বলা হয়েছে তা হলো, আগামীকাল সূর্য ওঠার আগেই শেখ সাহেবের বাসার সমস্ত লাশ বনানী কবরস্থানে দাফন করার ব্যবস্থা করতে হবে।'

হামিদ বললেন, এ অর্ডার কে দিলেন?

মতিন বললেন, 'এখানে তো রাষ্ট্রপতি থেকে শুরু করে সকল উচ্চপদস্থ কর্মকর্তারা আছেন। কোনো সন্দেহ থাকলে আপনি গাড়ি নিয়ে বঙ্গভবনে চলে আসেন, কিন্তু তাতে আপনার সময় নষ্ট হবে। আমি বলছি এটা উচ্চ পর্যায়ের অর্ডার।' এ কথা বলে টেলিফোন রেখে দিলেন মতিন।

মাথাটা ঘুরে গেল। ভাবলেন, ফোন রিসিভ না করাই ভালো ছিল। স্ত্রী রেগে বললেন, আমার কথা তো তোমার কানে যায় না, এবার বোঝো ঠেলা? আবার ফোন বেজে উঠল। এবার কোনো চিন্তা না করেই রিসিভ করলেন। এবারও মতিন ফোন করেছেন, স্যার আরো কিছু নির্দেশ।

হামিদ কিছু বলার আগেই মতিন বললেন, শেখ মনি এবং সেরনিয়াবাতসহ অন্যান্য যারা ওই ঘটনায় মারা গেছেন, তাদের বাসা থেকেও লাশগুলো কালেক্ট

করতে হবে। সবাইকে বনানী কবরস্থানে দাফন করতে হবে। মুজিবের লাশ ধানমন্ডিতে থাকবে। তাকে বনানীতে দাফন করা যাবে না। স্থান পরে বলা হবে।

বিছানায় বসে এতক্ষণ ফোনে কথা বলছিলেন।

এবার বিছানা ছেড়ে বাথরুমে যান হামিদ। চোখে-মুখে পানির ঝাপটা দিয়ে বের হয়ে ইউনিফর্ম পরে নেন। হাতে সময় কম, তড়িঘড়ি বের হয়ে যান। বেরোবার সময় ছড়িটা হাতে নিলেন। স্ত্রী বললেন, কিছু খেয়ে যাও।

না, সময় নেই আবার ক্ষুধাও নেই।

বাসা থেকে বেরোবার সময় ডিউটি অফিসারকে ফোন করলেন হামিদ। বললেন, এখনই সবাইকে জড়ো করেন। কিছুক্ষণ পর স্টেশন হেডকোয়ার্টার্সে এসে দেখলেন, সবাই এসে গেছে।

তাদের দুই দলে ভাগ করে একদলকে পাঠালেন ধানমন্ডি ৩২ নম্বরের বাড়িতে। অন্যদল গেল বনানী কবরস্থানে কবর খুঁড়তে।

একজন সুবেদারের অধীনে এই দলে থাকল ৩০ জন। কর্নেল রব এখনো পৌঁছায়নি। ফোন করলেন হামিদ। তাকে সবকিছু বলে রওনা দিলেন ধানমন্ডি।

রাতের অন্ধকারে গাড়ি চলতে লাগল। চোরাগোপ্তা হামলার ভয় বাড়ছে। গাড়িতে তিনজন সেনা। তাদের বললেন, রাইফেল লোড করে রাখো। রাইফেল লোড করার শব্দ ভয় আরো বাড়িয়ে তুলল।

ধানমন্ডি ৩২ নম্বরের বাড়ির সামনে এসে জিপ গাড়িটা ব্রেক করে। গাড়ি থেকে নেমে হামিদ শুনতে পেলেন হুদার গলা। কাকে যেন চিৎকার করে বলছেন, ব্লাডি, বাস্টার্ড।

ভেতরে এসে হুদাকে বললেন, কোনো সমস্যা?

'একটু সরে গেলেই বাস্টার্ডরা বাড়ির ভেতরে যে যা পাচ্ছে তাই পকেটে পুরছে। লাশের গা থেকেও গয়না ছিঁড়ে নিচ্ছে। শালা ব্লাডি।' রাগে হুদার লাল চোখ ফুটে বেরোচ্ছে। মুখ থেকে ছড়িয়ে পড়ছে মদের গন্ধ।

লাশগুলো কফিনে ভরা হয়েছে।

রাখা হয়েছে বাড়ির দক্ষিণ-পশ্চিম প্রাঙ্গণে। একটা কফিন নিচতলার বারান্দার পশ্চিম দেয়ালের কাছে রাখা। হামিদ জানতে চাইলেন, এটায় কার লাশ? একজন সুবেদার বললেন, শেখ সাহেবের। কারণ ছাড়াই হামিদের খটকা লাগে। বললেন, একবার আমি চেক করতে চাই। কফিনের ঢাকনাটা খুলুন।

সুবেদার বললেন, স্যার আমি চেক করেই ভরেছি।

হামিদ নাছোড়। বাধ্য হয়ে সুবেদার কফিনের ঢাকনা খুলে দেয়। দেখে হামিদের চোখ ছানাবড়া, 'এটা তো শেখ সাহেবের লাশ নয়, এটা নাসেরের লাশ।'

এ কথা শুনে সুবেদার ঘাবড়ে যায়। পাশেই হুদা দাঁড়িয়ে ছিলেন। তিনি আবার গালিগালাজ শুরু করলেন, দেখেছেন এই ব্লাডি-বাস্টার্ডরা কী করেছে? আপনি না দেখলে বড় ভুল হয়ে যেত। বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে ছোটভাই শেখ নাসেরের চেহারার অনেক মিল ছিল। দুজনের মুখের আকার এবং গোঁফ ছিল প্রায় একই রকম।

এরই মধ্যে কফিনবন্দি লাশগুলো ট্রাকে তোলা হয়েছে। বঙ্গবন্ধুর লাশ খুঁজতে মিলিটারি ট্রাকের ওপর উঠলেন হামিদ। সুবেদারকে বললেন, একটা টর্চলাইট দিতে পারেন?

আমাদের কাছে নেই।

অন্ধকারের মধ্যে ট্রাকে রাখা কফিনবন্দি লাশগুলো দেখা যাচ্ছে না। এবার হামিদ বললেন, মোমবাতি আছে?

সুবেদার বললেন, দেখি পাই কি না? ট্রাকের ওপর হামিদ দাঁড়িয়ে আছেন। কয়েক মিনিট পর হামিদের হাতে মোমবাতি দেয় সুবেদার। পাশে ছিলেন হুদা। পকেট থেকে লাইটার বের করে হামিদের হাতে দিলেন।

মোমবাতির আলো জ্বালিয়ে শুরু হলো বঙ্গবন্ধুর লাশ খোঁজা। পরপর পাঁচটা কফিন খুলেও পাওয়া গেল না। ছয় নম্বর কফিনে বঙ্গবন্ধুকে পাওয়া গেল। বরফ কুচি চারপাশে। এই কফিনটা নিচে নামানো হলো। বারান্দা থেকে শেখ নাসেরের লাশ ভরা কফিনটা তুলে দেয়া হয় ট্রাকে।

সবগুলো কফিনের ওপর কলম দিয়ে মার্ক করলেন হামিদ। এরপর কফিনগুলো নিয়ে বেডফোর্ড ট্রাকটা চলে গেল বনানী কবরস্থানের দিকে।

রাত চারটা ৪৫ মিনিট।

মেজর আলাউদ্দিনকে পাঠালেন আবদুর রব সেরনিয়াবাতের বাসায়। হামিদ চললেন শেখ মনির বাসার দিকে। পুরো বাড়ি ফাঁকা। লাশগুলোও নেই। কেউ আছেন? বলে কয়েকবার ডাকাডাকি করলেন হামিদ। কোনো সাড়াশব্দ পাওয়া গেল না।

পাশেই ধানমন্ডি থানা। এখানে এসে ডিউটি অফিসারকে হামিদ বললেন, শেখ মনির লাশ কোথায়? ডিউটি অফিসার জানায়, শুনেছি কয়েকজন আর্মি এসে লাশগুলো মর্গে নিয়ে গেছে। এর বেশি জানি না।

এরই মধ্যে আবদুর রব সেরনিয়াবাতের বাসা থেকে ফিরে এসেছেন মেজর আলাউদ্দিন। তিনি জানান, ওই বাসাতে কোনো লাশ পেলাম না, একজন মানুষও নেই।

লাশের খোঁজে জিপে চেপে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজে রওনা দিলেন হামিদ। মর্গের সামনে দেখা হলো পুলিশ ইন্সপেক্টর এরশাদের সঙ্গে। তিনি জানান, মনি এবং সেরনিয়াবাতের লাশ মর্গে রাখা আছে। হামিদ বললেন, এই লাশগুলো বের করার জন্য ডোম ডাকার ব্যবস্থা করেন।

মর্গের মেঝের ওপর রক্ত ছড়ানো-ছিটানো। তিনটা লাশ পচে-গলে পড়ছে। ছাদে দুইটা ফ্যান। একটাও ঘুরছে না। ওই সময় মর্গের লাশ শীতল রাখার কোনো ব্যবস্থা ছিল না। পচা-গলা লাশের সঙ্গে পড়ে আছে শেখ মনি এবং সেরনিয়াবাতের লাশ। তাদের সঙ্গে আছে পরিবারের অন্য সদস্যের লাশ।

চারজন ডোম এসেছে। খোলা হলো মর্গের ভেড়ানো দরজা। দরজার সামনে গিয়ে উঁকি দিলেন হামিদ ও এরশাদ। 'বাপ রে' বলে পিছিয়ে এলেন তিন ফুট। সবার নাকে হাত। যেন একসঙ্গে এই দুজনের নাকে কেউ একজন মোক্ষম ঘুষি মেরেছে। দুর্গন্ধে বমি করলেন এরশাদ। হামিদের গা গোলাচ্ছে। মনে হচ্ছে দুর্গন্ধে পেটের নাড়িভুঁড়ি বের হয়ে আসবে।

ডোম চারজন মর্গের ভেতরে ঢুকেছেন।

নাকে রুমাল চেপে খোলা দরজার চার ফুট দূর থেকে লাশগুলো শনাক্ত করলেন এরশাদ। মর্গের বারান্দায় এনে কফিনবন্দি করে একটি মিলিটারি ট্রাকে তুলে দেয়া হয়। ট্রাক গড়িয়ে চলল বনানী কবরস্থানের দিকে।

বনানী কবরস্থানে ১৮টা কবর খুঁড়ে রাখা হয়েছে।

হামিদ ছাড়াও আছেন তিন জন সেনা অফিসার। একজন সুবেদার এবং তিরিশ জন জোয়ান। বঙ্গবন্ধু পরিবারের সাত জনকে প্রথম কবর দেয়া হয়। জানাজা ও কাফন ছাড়া প্রথম কবরে বেগম ফজিলাতুন্নেছাকে। পরেরটায় শেখ নাসের।

শেখ কামাল

কামালের স্ত্রী সুলতানা

শেখ জামাল

জামালের স্ত্রী রোজী এবং সাত নম্বর কবরে শেখ রাসেল। ১৩ নম্বর কবরে শেখ মনি। পরেরটায় মিসেস মনি এবং ১৭ নম্বর কবরে সেরনিয়াতের লাশ দাফন করা হলো।

অন্য কবরগুলোতে বাড়ির অন্য সদস্য যারা মারা গেছেন তাদের দাফন করা হয়। লাশগুলো দাফন করা শেষ হতে হতে প্রায় সকাল হয়ে আসে। আলো ফোটার সময় অফিসে ফিরে আসেন হামিদ।

অফিসে এসে এক পেয়ালা চা পান করলেন।

এখন একটু ভালো লাগছে। বমি ভাবটা আর নেই।

সকাল হতে দেরি নেই। বঙ্গভবনে আজ কেউ ঘুমায়নি। আনন্দে তাদের ঘুম হয়নি। কাদের নিয়ে দেশ চালানো হবে? সেই পরিকল্পনা হয় সারা রাত। সকালের আলো ফোটার সময় ফারুকের মনে হলো, ধানমন্ডি ৩২ নম্বরে প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিবের লাশ পড়ে আছে। মোশতাককে ফারুক বললেন, লাশ দাফন করব কোথায়?

ঢাকায় না, অন্য যে-কোনো জায়গায় করো।

টুঙ্গিপাড়া, না অন্য কোথাও?

ঢাকা ছাড়া যেখানে খুশি সেখানে মজিবরের কবর দাও। মাটিচাপা দাও।

এত দিন বঙ্গবন্ধু বলতে বলতে মোশতাকের ফেনা তোলা মুখে এই প্রথম শুকনো উচ্চারণ 'মজিবর'। উচ্চারণের ভঙ্গি দেখে ফারুকের পাষাণ হৃদয় দুলে উঠল। বিড়বিড় করে বললেন, শালা আসলেই গোখরো সাপ।

মোশতাক বললেন, ফারুক কিছু বললে?

কথা ঘুরিয়ে ফারুক বললেন, বললাম এই লাশ ঢাকায় রাখার কোনো মানে নেই।

একেবারে খাঁটি কথা বলেছ।

বঙ্গভবন থেকে হামিদকে টেলিফোনে জানানো হয়, 'মুজিবের লাশ টুঙ্গিপাড়ায় দাফন করুন। এয়ারফোর্সের একটা হেলিকপ্টার ব্যবস্থা করা আছে।' একটু পর পর বঙ্গভবন থেকে ফোন আসতে লাগল। ফোন-আতঙ্ক শুরু হয় হামিদের। একটা জিপ নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন। ফোন থেকে কিছুক্ষণ সরে থাকা। ক্যান্টনমেন্টের এদিক-ওদিক ঘোরাফেরা করে সময় পার করলেন।

দুপুরের আগে বেলা একটার দিকে গোয়েন্দা বিভাগের ডিরেক্টর জেনারেল ব্রিগেডিয়ার আবদুর রউফ সব অফিসারকে ডেকে জানালেন, মুজিবের মরদেহ টুঙ্গিপাড়ায় নিয়ে সমাহিত করতে হবে। এই ব্যাপারে মূল দায়িত্ব তিনি একজন স্বেচ্ছাসেবককে দিতে চাইলেন। কেউ দায়িত্ব নিতে চাইলেন না। তখন আবদুর রউফ এই দায়িত্ব দিলেন মেজর হায়দার আলীকে। তাকে বলা হলো, সব স্থানীয় কর্তাব্যক্তিদের এ ব্যাপারে সতর্ক করে দেয়া হয়েছে। লাশ প্রাপ্তবয়স্ক আত্মীয়ের হাতে তুলে দিতে হবে।

নিরাপত্তার উদ্দেশ্যে তার সঙ্গে চৌদ্দজন সৈন্য থাকবে। হেলিপ্যাডে পৌঁছে চালক বললেন, দুই ঘণ্টার মধ্যে সব সেরে ফেলতে হবে। রাতে হেলিকপ্টার চালানো যাবে না।

দুপুর দুইটা ৩৫ মিনিট।

টুঙ্গিপাড়ার আকাশ কাঁপিয়ে একটি হেলিকপ্টার নামল।

এর ব্যাঙের মতো পেট থেকে বের করা হবে আমকাঠের কফিন। কফিন বের করার আগে বেরিয়েছেন একজন মেজর, একজন লেফটেন্যান্ট এবং ছয় জন জোয়ান। জোয়ানদের হাতে গুলিভরা স্টেনগান। অন্য দুই জনের কোমরে চামড়ার খাপে ভরা পিস্তল। হেলিকপ্টার থেকে নেমে তারা দেখলেন, আশপাশে কেউ নেই। শুধু দুইটা রোগা কুকুর চিৎকার করছে। এই চিৎকারে মেজর বিরক্ত। কয়েকবার বললেন, এই ভাগ, ভাগ।

এই গ্রামের লোকজন দ্বিতীয়বারের মতো আজ আর্মি দেখল। এর আগে দেখেছিল ১৯৭১ সালের মার্চ মাসে। পাকিস্তানি সেনারা বঙ্গবন্ধুর পূর্বপুরুষের ভিটেতে আগুন ধরিয়ে দিতে এসেছিল। ওই দিন গ্রামের সবাই ভয়ে পালিয়ে যায়, এবার কেউ ভয় পেল না। শোক, ঘৃণা আর লজ্জায় সবাই যে যার ঘরে ঝিম মেরে বসে থাকলেন।

হেলিকপ্টার আসার খবর আগেই জানানো হয়েছিল স্থানীয় প্রশাসনকে। তাই একজন ম্যাজিস্ট্রেট কয়েকজন পুলিশ নিয়ে হাজির হয়েছেন। তারা এখানে এসে ডেকে এনেছেন গ্রামের পেশ ইমাম সাহেবকে।

হেলিকপ্টারের পেট থেকে কফিন বের করে এখনই দাফন করার জন্য মেজর ব্যস্ত হয়ে পড়লেন।

ম্যাজিস্ট্রেটকে মেজর বললেন, গ্রামের লোকজন কি এই লাশ দাফন করবে?

পাশে দাঁড়ানো ইমাম সাহেব বললেন, যদি আমাদের লাশ দেখতে দেয়া হয়, তাহলেই। কারণ, লাশ না দেখে কবর দেয়ার রীতি নেই।

লাশ না দেখে দাফন করা যায় না কেন?

যায়, যদি আপনারা ওনাকে শহিদ বলে ঘোষণা দেন।

থাক আপনাদের লাগবে না, আমরাই পারব। এ কথা বলে মেজর দ্রুত কফিনের কাছে যান। জোয়ানদের ডেকে বললেন, কফিনটা কবরের কাছে নিয়ে এসো।

ইমাম সাহেব বললেন, এভাবে কবর দেয়া ইসলাম সমর্থন করে না। আপনারা কি ধর্ম মানতে চান না?

থমকে যান মেজর। ভ্রু কুচকে তাকান।

এই দেহ কবর দিতে হলে অবশ্যই গোসল এবং জানাজা করাতে হবে। ইমাম সাহেব বললেন।

চড়া গলায় মেজর বললেন, নিয়ম ভুলে তাড়াতাড়ি কবর দিয়ে দিন।

পেশ ইমাম মাওলানা শেখ আবদুল হালিম সাহেব বিরক্ত। বললেন, 'একমাত্র শহিদের ক্ষেত্রে নিয়ম না মানলেও চলে। কোনো মুসলমান যদি শহিদ হন, তাহলে

শরীরে আঘাতের চিহ্নগুলো না ধুয়ে দিলেও চলে। কারণ, তাঁর এই আত্মদানে চিহ্ন চূড়ান্ত বিচারের দিনে দেখা হবে।'

এরপর কী বলতে হবে, জানা ছিল না মেজরের। রাগে ফুলতে থাকলেন।

খন্দকার মোশতাকের নির্দেশ ছিল, গ্রামের কেউ যেন লাশ দেখতে না পায়। এদিকে ইমাম সাহেবের কথা শুনে মেজরের মনে ভয় ঢুকল। যদি গ্রামবাসীকে ধর্মীয় অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয়, তাহলে তারা খেপে যেতে পারেন। তখন কয়েকজন জোয়ান আর পুলিশ দিয়ে তাদের থামানো যাবে না।

ইমাম সাহেব ও মেজরের কথা বলার সময় স্থানীয় ম্যাজিস্ট্রেট পাশে কলাগাছের মতো দাঁড়িয়ে ছিলেন। তার দিকে তাকিয়ে মেজর বললেন, ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব আপনার মত কী?

ম্যাজিস্ট্রেটের মুখ থেকে কোনো কথা বেরোল না।

এবার মেজর বললেন, ধর্মের রীতি মেনে দাফন করেন, তবে সবকিছু করতে হবে মাত্র আধাঘণ্টার মধ্যে।

শুরু হলো কফিন খোলা।

মরচে ধরা হাতুড়ি দিয়ে আঘাত করা হচ্ছে।

ওপরের পাটাতন ভেঙে যায়। ঢাকনা খোলার পর চোখে পড়ল পুরো কফিন বরফে ভরা। স্বচ্ছ বরফ টুকরোর ফাঁক দিয়ে সকালের সূর্যের মতো উঁকি দিচ্ছে দলা দলা রক্ত। রক্তে ভেজা পাঞ্জাবির পকেটে পাইপ আর ভাঙা চশমা।

এরই মধ্যে আশপাশের গ্রাম থেকে অনেক লোক এসে জমেছে বাড়ির সামনে। কফিনের কাছে তাদের ভিড়তে দেয়া হচ্ছে না। পুলিশ আর কয়েকজন জোয়ান সবাইকে আটকে রেখেছে।

বঙ্গবন্ধুর গ্রামের বাড়িতে এখন কেউ নেই। আশপাশের দোকানপাট বন্ধ। লাশ গোসল করানোর জন্য সাবান দরকার। একজন গ্রামবাসী কাপড় ধোয়া '৫৭০' নামের একটা সাবান নিয়ে আসে, আর একজন পাশের বাড়ির গোয়াল থেকে নিয়ে আসে মরচে পড়া একটা টিনের বালতি। বাড়ির ভেতরের টিউবওয়েল চেপে বালতি ভরে পানি আনা হলো।

গায়ে মাখানো হলো সাবান। ভালো করে ধুয়ে দেয়ার আগেই মেজর বললেন, অনেক হয়েছে আর না। তাড়াতাড়ি সারতে হলো গোসল করানো। জানাজার আগে গোসল করার পানি গরম করতে হয়, এখন তা করা হলো না। বঙ্গবন্ধুর গায়ে রক্তের দাগ লেগে থাকল।

ইমাম সাহেব মেজরকে বললেন, কাফনের কাপড় কোথায়?

মেজর উত্তর দিলেন না।

লোকাল থানার দারোগা বললেন, এখন কাফন জোগাড় করা সম্ভব নয়। তবে সায়েরা খাতুন হাসপাতালে সাদা শাড়ি পাওয়া যাবে। মেজর বললেন, তাড়াতাড়ি নিয়ে এসো।

দুইজন পুলিশকে দারোগা ইশারা করলেন। দুই পুলিশ কিছুক্ষণ পর হাসপাতাল থেকে তিনটা লাল পাড়ের সাদা শাড়ি নিয়ে আসেন। কাফনে লাল রং চলে না।

ইমাম সাহেব বললেন, একটা ব্লেড পাওয়া যাবে? একজন মানিব্যাগের ভেতর থেকে বলাকা ব্লেড বের করে বললেন, আমার কাছে ব্লেড আছে। এই ব্লেড দিয়ে সাদা শাড়ি থেকে লাল পাড় কেটে বাদ দেয়া হলো। কাফনের কাপড় টুকরো করার পর তা আবার সেলাই করতে হয়। শাড়ি ছিঁড়ে টুকরো করা কাপড় সেলাই করা হলো না। তাই দিয়ে শরীর জড়িয়ে কফিনের কাঠের টুকরোর ওপর বঙ্গবন্ধুর লাশ রাখা হয়। কফিন খোলার সময় কাঠের টুকরো ভেঙে ছোট হয়ে গেছে। এতে বঙ্গবন্ধুর শরীর ধরল না। গোড়ালি পড়ল ধুলো মাটির ওপর।

জানাজায় তিন সারিতে লোকজন দাঁড়ালেন। প্রথম দুই সারিতে দশ জন করে, পেছনের সারিতে ছয় জন। ইমাম সাহেবসহ সাতাশ জন মানুষ চার তকবিরে জানাজা পড়লেন। জানাজা শেষে পিতার কবরের পাশে একটা নতুন কবরে জাতির জনকের মরদেহ শুইয়ে দেয়া হলো। বাধাহীন লাশ দাফন করে এখন নিশ্চিন্ত মেজর। সিগারেট জ্বালালেন।

সারাটা দিন টুঙ্গিপাড়ার গ্রামবাসীরা ঝিম মেরে বসে থাকল। এই ঝিমুনি গতকাল থেকে শুরু হয়েছে। তারা রান্না করতে ভুলে গেছে। কারো বাড়ির চুলায় আগুন জ্বলল না। মায়েরা তাদের বাচ্চাদের বাসি খাবার খেতে দিল। পুরুষরা তাদের গরু-মহিষকে খড় দেয়নি। সন্ধ্যা এগিয়ে এলেও গাভি দোহন করার কথা মনে পড়েনি। দিনের আলো ফুরিয়ে যাওয়ার আগে মেজর জোয়ানদের বললেন, তোমরা হেলিকপ্টারে উঠে পড়ো, এখনই রওনা হব।

হেলিকপ্টারের শব্দে কেঁপে উঠল টুঙ্গিপাড়া। দলবল নিয়ে মেজর ঢাকায় রওনা দেন। এলাকার মানুষজন রানিক্ষেত লাগা মুরগির মতো ঝিম ধরা চোখে আকাশের দিকে তাকাল। রোগা কুকুর দুইটা এখনো চেঁচাচ্ছে।

রোদ ভরা ১৭ আগস্টের সকাল।

নারায়ণগঞ্জে কর্নেল তাহেরের বাসায় আসেন নঈম জাহাঙ্গীর। নঈম একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের সময় ১১ নম্বর সেক্টরে তাহেরের সহযোদ্ধা ছিলেন। ঝিম ধরা দেশের

খবর জানতে তিনি উদ্বিগ্ন। সকালে নাশতার টেবিলে বসেছেন তাহের। এমন সময় হন্তদন্ত হয়ে আসেন নঈম।

খাবারের টেবিলে এসো, বললেন তাহের।

না, খাব না। ইচ্ছা করছে না।

এসো বলছি।

এবার আর 'না' বলতে পারলেন না নঈম। কাল থেকে কিছু খেতে পারছেন না। বারবার বঙ্গবন্ধুর কথা মনে পড়ছে। যার ডাকে জীবনবাজি রেখে মুক্তিযুদ্ধ করলেন, দেশ স্বাধীন করলেন, তাকে এভাবে খুন করা মানতে পারছেন না। সবকিছু অসহ্য লাগছে।

খাবারের টেবিলে পরোটা, ডিম, সবজি, সেমাই সাজানো।

একটা পরোটা আর সবজি তুলে নিলেন নঈম। এক টুকরো পরোটা ছিঁড়ে মুখে দেবেন, এমন সময় তাহের বললেন, মোশতাক সাহেব এটা কী করলেন?

কোনটা?

মুজিবের লাশ কবর দিল কেন?

এ কথা শুনে চমকে উঠলেন নঈম। তাহলে কী করার ছিল?

বঙ্গোপসাগরে ফেলে দেয়া দরকার ছিল।

কেন?

একদিন তো টুঙ্গিপাড়ায় মাজার হবে।

এ কথা শোনার পর নঈমের সারা শরীর আগুনে পুড়ে যাওয়ার মতো লাগছে। গায়ে অ্যাসিড পড়লে যে রকম হয়, সে রকম। খাবারের টেবিল থেকে উঠে দাঁড়ালেন।

কী হলো, খাও।

ইচ্ছা করছে না, কাজ আছে, পরে আসব।

১৫ আগস্টের পর বদলে যাওয়া মানুষের খবর জানতে ঘুরে বেড়ায় সুমন।

একই সঙ্গে দুই বছর আগে কলকাতা যাওয়ার পথে ট্রেনে দেখা খুনি লোকটার সন্ধান চলছে। এই সময়ের মধ্যে পাঁচ বার কলকাতায় এসেছে। প্রতিবারই মনে করে এবার নিশ্চয়ই দেখা পাব। ভাবে, লোকটার সঙ্গে দখা হলে কী চিৎকার করব? লোকটাকে পুলিশ দিয়ে ধরিয়ে দেব? নাকি তার কাছে বসে আরো কিছু ঘটনা জানব? সন্ধ্যা থেকে বসে এসবই ভাবছে।

এখন রাত পৌনে এগারোটা।

প্ল্যাটফর্মে এক জায়গায় বসে আছে। সিগারেট টানছে একটু পর পর। চারপাশে দু-চার জন শুয়ে ঘুমাচ্ছে। স্টেশন চত্বরে মদের ঠেক, জুয়ার আড্ডাখানা গমগম করছে। কেউ কেউ যৌন মিলনের কারবার করছে নির্বিঘ্নে।

দুরন্ত বাতাসে সুমনের এলোমেলো চুল, এলোমেলো চিন্তা। এমন সময় রোগা আকারের এক লোক এসে বলল, বাবু কিছু লাগবে?

না।

ভালো জিনিস আছে।

বললাম তো ওসব আমার লাগবে না।

বিরক্ত হয়ে চলে যায় দালাল।

কিছুক্ষণ পর স্টেশনের নিচে নেমে এসে সস্তা খাবারের দোকানের সামনে দাঁড়ায়। ঘড়িতে এখন ১২টা পাঁচ। সবজি-রুটি খেয়ে হাঁটতে থাকে। কিছুটা পথ এগিয়ে সাবওয়ের বন্ধ শাটারের সামনে দাঁড়ায় সুমন। এর উল্টো দিকে দেওয়ানি ও ফৌজদারি আদালতের রেলিংয়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে চার জন বৃহন্নলা। নারীদের মতো পোশাক। পরনের কাপড়ের তলায় কিছু একটা দিয়ে কৃত্রিম স্তন বানানো। এদের পাশে কয়েকজন পুরুষের জটলা।

রেলিংয়ের গা বরাবর শ্রীশ্রীশনির মন্দির। হরেকৃষ্ণ পানীয় জল। লোকনাথ বাবা আর সাঁইবাবার মূর্তি। হঠাৎ চিৎকার কানে এল। একজন বৃহন্নলার হাত ধরে টানাটানি করছে দুই জন। সঙ্গে নানা রকম অশ্লীল গালিগালাজ। দ্রুত পা ফেলে সরে আসে সুমন।

কলকাতায় এসে নিউ মার্কেটের সামনের একটা সাধারণ হোটেলে উঠেছে। হোটেলে ফিরে এসে বিছানায় গা মেলে দেয়। রাতে স্বপ্ন দেখে রাসেলের পরিবারের সবাই পাখি হয়ে ফুলভরা কৃষ্ণচূড়া গাছের ডালে বসে আছে। সুমনকে দেখে পাখিগুলো উড়ে যায়। সুমন দৌড়ায় পাখিদের আবার দেখার জন্য। আর দেখতে পায় না।

এদিকে দৌড় থামছে না। দৌড়াতে দৌড়াতে ঘুম ভেঙে যায়।

কলকাতায় এসে এবারও ওই লোকটার দেখা মিলল না।

ভারি মন নিয়ে তিন দিন পর ঢাকায় ফিরে আসে সুমন। পরদিন আসে ধানমন্ডি লেকের ধারে। দেড় মাস পর আমার সঙ্গে দেখা হয়। বেশ ক্লান্ত দেখাচ্ছিল। দেখা হলে প্রতিবার যা বলি, এবারও তাই বললাম, 'রাসেল ও নীল গাড়ির গল্প' নামের বইটা কী লিখবেই না?

সুমন বলে, চেষ্টা করি, হয় না। লেখার সময় সবকিছু কেমন যেন উল্টাপাল্টা হয়ে যায়। একটু থেমে আবার বলে, এবার লিখবই। এবার আমি কলমের নিব বেয়ে উঠে দাঁড়াবই।

সারা বিকেলে আকাশ কালো হয়ে থাকল। বৃষ্টি হলো না। সন্ধ্যার পর মেঘ কেটে তারা ফুটল। লেকের পাড়ে আড্ডা শেষ করে আমরা যে যার গন্তব্যে চলে যাই। বাসায় ফিরে বারান্দায় বসে অনেকটা সময় তারা দেখে সুমন। মধ্যরাতে বুকশেলফের কাছে এসে মেঝেতে বসে।

এখানের দেয়ালে হেলান দিয়ে বই পড়ে প্রতিরাতে। আজ সে পড়বে না, বই লিখবে। কাগজ কলম হাতে নেয়। বুকশেলফ থেকে টেনে বের করে নিজের নোটবই ও সাবেক 'র' কর্মকতার পাঁচখানা ডায়েরি।

১৫ আগস্টের কথা ভাবলে রাসেলদের বাড়িটা ধানমন্ডির মাটি ছেড়ে উঠে এসে বুকের ওপর বসে পড়ে। তখন মগজের ভেতর ভয়ার্ত তরঙ্গ বয়ে যায়। ভূত দেখার মতো চমকে ওঠে সুমন।

আসলে স্মৃতিরা বড়ই চঞ্চল, বুনো প্রাণীর মতো ছুটে আসে। সামনে দাঁড়ালে ভয় বাড়ে। খামচে ধরে রক্ত।

স্মৃতিগুলোকে আজ ছাড়বে না। সবকিছু সাদা কাগজের ওপর নামিয়ে আনবে। এদিকে মাটির অ্যাশট্রের ওপর সিগারেট পুড়ে ছাই হচ্ছে। টানতে ভুলে যায়। কিছুক্ষণ পর একটানে লিখে ফেলে, আমার বন্ধু রাসেল। এরপর আর কিছু লিখতে পারে না। ভুলে যায় অক্ষর।

একি!

কলমের নিব বেয়ে কালির বদলে রক্ত বেরোচ্ছে কেন?

বিস্ময়ের ঘোর কাটে না। বাড়তেই থাকে।

সুমন আজও লিখতে পারেনি রাসেল আর পাল্টে যাওয়া মানুষের গল্প।

আমার বিশ্বাস, একদিন সে নিশ্চয়ই পারবে। সেদিন রক্তের বদলে কালো কালি বের হবে কলম থেকে। লেখা হবে, রাসেল ও নীল গাড়ির গল্প আর ১৫ আগস্টের পর বদলে যাওয়া মানুষের মুখ।

তখন আমরা জানতে পারব বাঙালি আত্মঘাতী না বিশ্বাসঘাতক। এই রাতের কয়েক দিন পর এক বিকেলে সুমনের সঙ্গে দেখা হয়। বঙ্গবন্ধুর বাড়ির সামনে লেকের ধারে আমরা কিছুক্ষণ বসে ছিলাম।

কিছুদিন আগে বর্ষা শেষ হয়েছে। লেকের পাড়ের গাছ আর ৩২ নম্বর বাড়ির দেয়ালে এখনো বৃষ্টির ছিটে দাগ। পানিতে ভাসছে গাছের শুকনো পাতা, আর একটা সাপের খোলস। আমরা দুজন সিমেন্টে বানানো বেঞ্চের ওপর বসলাম। কথার শুরুতে সুমন বলে, লন্ডন যাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছি।

কেন? প্রশ্ন করার আগেই সে বলে 'দেশভাগ' আর '১৯৭১' নামের দুইটা উপন্যাস লিখব। সেখানকার মিউজিয়ামে অনেক নথি আছে। সেসব থেকে বের করা যাবে অজানা অনেক কিছু।

টাকা পাবে কোথায়?

সে কোনো উত্তর দেয় না।

দীর্ঘশ্বাস বেরোবার সময় ব্রেক কষে আটকে দেয়। যন্ত্রণা দমিয়ে রাখার এক অদ্ভুত কৌশল। সবাই পারে না। সুমন পারে। বলে, একটা সিগারেট হবে?

পকেট থেকে বের করে সিগারেট দিলাম, সাথে লাইটার। আগুন জ্বালিয়ে লম্বা টান দেয়। এক মুখ ধোঁয়া পাক খেতে খেতে মিশে যায় বাতাসে।

এমন সময় ৩২ নম্বর সড়কে একটা নীল রঙের গাড়ি আমাদের চোখে পড়ে। গাড়িটা পুব থেকে পশ্চিম দিকে যাচ্ছিল। সুমন দাঁড়িয়ে পড়ে। ওর সঙ্গে আমিও দাঁড়াই।

দুই ধাপ এগিয়ে যায় সুমন।

চিৎকার করে ডাকতে থাকে, 'রাসেল, এই রাসেল, আমি এখানে।'

আমি থ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকি। নীল গাড়িটা দাঁড়ায় না।

-- -- --

Northern University Library
Bangladesh